রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী

অনুবাদ : মলিনা রায়



বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪ : ১৮৮৯ শক

LETTERS TO A FRIEND
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

প্রকাশক বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস : ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

৯'১

সূচীপত্র

পরিচয় [৭]
প্রাসঙ্গিকী [১৩]

পত্রাবলী

এণ্ডরুজকে লিখিত ১
উইলিয়ম পিয়রসনকে লিখিত ১৩৫

পরিশিষ্ট

১ তথ্যপঞ্জী ১৪৭
২ গুরুদেবকে লেখা এণ্ডরুজের চিঠি ২১৩
৩ গুরুদেবের অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি ২৫৯
৪ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ২৭১

চিত্রাবলী

সি. এফ. এণ্ডরুজ। নন্দলাল বসু -অঙ্কিত ১
এণ্ডরুজের কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। পাণ্ডুলিপি-চিত্র ৩২
রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ ও মহাত্মা গান্ধী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত ৮০
এণ্ডরুজের পিতাকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র। পাণ্ডুলিপি-চিত্র ১১২

পরিচয়

ভারতভূমির উন্মুক্ত পথে বহু পথিক, বণিক, ধর্মযাজক, উগ্র সমর-সম্প্রদায়ের যাতায়াত ঘটল ইতিহাসের উদয়-পর্ব থেকে ; পূর্বপশ্চিম সভ্যতার ঐশ্বর্যধারার সঙ্গে সঙ্গে এল বর্বর আক্রমণ, প্রলয়-লাঞ্ছিত জাতীয়তার সংঘর্ষ। মিশ্রিত এই কাহিনী থেকে উদ্ধার করতে হবে মানবিক ইতিবৃত্ত, দিক-দেশাৎ সমাগত জনতরঙ্গে খুঁজে নিতে হবে সেই বরেণ্য অতিথিকে যাঁর অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, যাঁর প্রোজ্জ্বল শান্ত চিত্তাগ্নি আমাদেরই আত্মপরিচয় এবং বৈশ্বিক চেতনার যুগ্ম-সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-অধ্যায়ে একটি ইংরেজ বন্ধু এসে যোগ দিলেন যিনি দুই সভ্যতার এই সেতু বন্ধনের প্রতীক। তপঃচারী, কল্যাণকর্মী চার্ল্স্ ফ্রিয়র্ এণ্ড্রুজ। আনন্দিত মুখশ্রী, দুঃখের দুঃখী, দীনবন্ধু। শত শতাব্দীর ভারতীয় নাম-মালায় শ্রেষ্ঠতর পুরুষের সন্ধান মিলবে না যিনি একাধারে বিদেশী এবং সর্ব-দেশীয় ; মনস্বিতায়, নির্ভীত সেবায় যাঁর দান মহত্তর। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ তিনি জীবনের শেষ ছত্রিশ বৎসর উৎসর্গ করলেন ভারতের মুক্তি-সাধনায় ; অগণ্য গ্রামবাসী শহরবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সেই পুনরুজ্জীবনের দীক্ষা মেনে নিলেন যা রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক সহযোগ এবং সহবীর্যে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য তখন মানব-সাম্রাজ্যের দাবি লঙ্ঘন ক'রে শস্ত্রসৈনিকের উপর নির্ভরশীল ; বিভক্ত পরাহত ভারতবাসী ঐক্যমন্ত্রকে সবেমাত্র নতুন যুগে প্রয়োগ করতে উদ্যত। পরস্পর শত্রুতা উভয়পক্ষেরই আত্মঘাত। যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী আয়োজন এণ্ড্রুজের কাছে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতর হল ; যারা মানবধর্মকে মানে না তারাই আগুন জ্বালায়, প্রতিবেশীকে লুণ্ঠন ক'রে সাম্যের ঘণ্টা নাড়ে। পুণ্যচরিত্র ইংরেজকে নামতে হল স্বজাতির পাপের বিরুদ্ধে, অথচ শাসন কর্তাদের প্রবর্তিত অন্যায়ের প্রতিবিধানে তিনি আফ্রিকায়, ফিজিতে, ব্রিটিশ গিয়ানায় নির্যাতিতের আত্মীয় ধর্ম এবং আত্মশক্তিকে জাগাতে চাইলেন, প্রতিহিংসাবৃত্তিকে নয়। প্রতাপ বা কাপুরুষতা কোনোটাই মানুষের কাম্য নয়।

হার স্বীকার করায় মহিমা নেই, প্রভুত্বের গর্ব সেও দুর্বলতারই চিহ্ন : ধৈর্যশীল এণ্ডরুজ পূর্বপশ্চিমের কাছে এই বার্তা নিয়ে ঘুরলেন ভারতের স্বাধীন প্রতিনিধিরূপে। না ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ধন বা আপন গৃহসংসার, যাদের কিছু নেই তাদেরি তিনি অকিঞ্চন ঐশ্বর্যের সরিক। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর সহজ ব্যবহার-মাধুর্যে ঢাকা থাকত; কেম্ব্রিজে যিনি প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে বৃত্তি ও পদক পান (এবং আজীবন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার স্থান তাঁর জন্যে রক্ষিত ছিল।) তিনি পথে ঘাটে সকলের কাছে জীবনশিক্ষার দাবি নিয়ে উপস্থিত।

মধ্যে মধ্যে এণ্ডরুজ বই লিখেছেন— ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রসমস্যা সম্পর্কে, আড়কাঠি এবং আফিম ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে; রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রসঙ্গে; কিন্তু যথেষ্ট সময় পান নি। চা-বাগানের কুলির ধর্মঘটে যোগ দিয়ে চাঁদপুরে তাদের সঙ্গে মাটিতে শুয়েছেন, গুর্খা সৈন্যের আক্রমণের কালে; জালিয়ানওয়ালার তীব্র ব্যাপারে ছুটেছেন পঞ্জাবে (তাঁকে সামরিক পুলিস দিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করা হয়)। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে পড়ানো এবং তার জন্যে অর্থসংগ্রহ; গান্ধীজির অনশনব্রতে শঙ্কিত হয়ে সমুদ্রের দুই পারে রাষ্ট্রপতিদের দ্বারে ধন্না দেওয়া; অগণ্য বক্তৃতা, বারম্বার ভ্রমণ, অবিরাম চিঠি লেখা— এতেই তাঁর জীবনীশক্তি ব্যবহার হল। দুবার কলেরায় ভুগলেন ভারতবর্ষে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এড়াতে পারেননি জলাজঙ্গলে; স্বজাতির হাতে অপমান, ভারতবর্ষেও নানাপক্ষের সন্দেহ অবিশ্বাস ছিল তাঁর নিত্য সহচর। অথচ বন্ধু তাঁর জগৎজোড়া, বিশেষ করে ভারতবর্ষে; দুই মহাপুরুষের বন্ধুত্ব শুধু নয়, অনির্ণয় বহু জনের অকুণ্ঠিত প্রেম ও ভক্তির আধার ছিলেন তিনি। তাঁর চটি-পরা, খদ্দরের শার্ট ও ঢিলে পাজামা পরা মূর্তি— দীর্ঘদেহ, গভীর নীল চোখ, সন্ত শুভ্র চেহারা যারা দেখেছে তারা কখনো ভুলবে না। মনে পড়ছে একই কামরায় তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন (বোলপুর) থেকে কলকাতায় শেষ ট্রেন যাত্রা, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন কিন্তু কাউকে জানতে দেন নি। কয়েকদিন পরেই, শুক্রবার ৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ সালে কলকাতার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হল। জন্ম হয়েছিল ইংলণ্ডে, ১৮৭১ সালে।

পথিকবন্ধুকে চিনতে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র দেরি হয় নি। তাঁদের দেখা হয় লণ্ডনে; ১৯১২ সালে কবির ইংরেজি গীতাঞ্জলি থেকে প্রথম কবিতাপাঠের

শেষে এণ্ডরুজ তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় হ্যাম্প্‌স্টেড্‌ হীথে পায়চারি করেন। তর্জমার আবরণ ভেদ করে মূল প্রেরণার দ্যুতি এণ্ডরুজের কাছে পৌঁছেছিল। শুধু তাই নয়, যে ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি তাঁর পুণ্যচারিণী মাতার কাছে শুনেছিলেন, যে-দেশে মিশনরি হয়ে ১৯০৪ সালে তিনি সেবার কাজে যোগ দেন (কিন্তু ধর্মান্তর প্রবর্তনের কোনো সম্পর্ক রাখেন নি) সেই মহান্‌ দেশের রূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কাব্যে এবং তাঁর সান্নিধ্যে হঠাৎ পূর্ণভাবে দেখলেন। এণ্ডরুজ সেই বছরেই ভারতবর্ষে ফিরলেন, ইতিমধ্যে কবির সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ শুরু হয়েছিল যদিও প্রথম পত্রগুলির চিহ্ন আজও পাওয়া যায় নি। আজীবন অভগ্ন ছিল তাঁদের সম্বন্ধ, চিঠিপত্রে কথাবার্তায়, একত্র দেশভ্রমণে ক্রমে সেই আত্মীয়যোগ আরো গভীর হল।

আফ্রিকায় ডার্বান শহরে মহাত্মা গান্ধীর কাছে এণ্ডরুজ প্রথম গিয়েছিলেন পিয়র্সনের সঙ্গে, ১৯১৪ সালে; এই তাঁর দ্বিতীয় চিরবন্ধুত্বের যোগ। এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে পরের বছরেই মিশনরি-সম্প্রদায় ত্যাগ করলেন। প্রথমে এলেন শান্তিনিকেতনে; গান্ধীজি দেশে ফেরার পর সাবরমতি ও শেষদিকে সেবাগ্রামে এণ্ডরুজের যাযাবর জীবনের আরো দুটি বিশেষ কর্মকেন্দ্র তৈরি হল। এইখানে বলা দরকার যে গান্ধীজি-রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁর ধর্মগুরু খৃস্টের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি; তাঁদের সংসর্গে বৃহত্তর পরিধিতে অন্যান্য ধর্মের সত্যরূপ তিনি উপলব্ধি করলেন।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের এটুকু পরিচয় দরকার ছিল কেননা রবীন্দ্রনাথ যাঁকে এই সংগ্রহের চিঠিগুলি লেখেন তাঁর বিষয়ে বাংলাদেশের নতুন পাঠক-পাঠিকার ঔৎসুক্য ক্রমেই নানাভাবে জাগ্রত হবে সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য এই যে যদিও পত্রাবলীর প্রায় সব চিঠিই কবির রচিত (এণ্ডরুজের লেখা কয়েকটি সুন্দর চিঠির তর্জমা যোগ হয়েছে এই বাংলা গ্রন্থে) তবু রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থে জেগে ওঠে তাঁর বিদেশী বন্ধুর সান্নিধ্যছবি। কবি বলতেন যাকে মন খুলে চিঠি লেখা যায় তারই আকর্ষণী শক্তির দামে চিঠি মূল্যবান হয়ে ওঠে: সেই অর্থে দুটি শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয় পত্রাবলীতে রয়ে গেল। এণ্ডরুজ সম্পাদকরূপে যে-ভূমিকা ও মন্তব্য এই পত্রসংগ্রহের মূল ইংরেজি সংস্করণে ছাপিয়ে ছিলেন তাতেও দুই মনের যুক্ত কল্যাণ পাঠকের কাছে উপস্থিত।

পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ পথিক, এণ্ড্রুজ অপেক্ষাকৃত আবাসিক। শান্তিনিকেতনে এণ্ড্রুজের কাছে কবির অনেকগুলি চিঠি পৌঁছেছিল। ঘরের কথা, দূরের বার্তা, ঘটনা ও চিত্রময় ঘনিষ্ঠ মনোধারা এই চিঠিগুলিতে ঝলমল করছে। বৃহৎ জগতে ভ্রাম্যমান কবির চিত্ত আন্দোলিত হত মন-কেমনের পবনে, আশ্রমে ফেরার আশায়; বরফের দেশে তিনি কল্পনায় দেখতেন বাংলার পুষ্পিত ফাল্গুন, বনমঞ্জরী, শরতের আলোর অঞ্জলি। তুলনায় পশ্চিমের শহরঘাট, যাতায়াত যেন তাঁর কাছে অলীক হত, মনে পুরো তৃপ্তি পেতেন না। অথচ যেখানে চিন্তার প্রসঙ্গ, সৃষ্টিশীল সভ্যতার বিচিত্র দাবী নিয়ে য়ুরোপ আমেরিকা তাঁকে ডাক দিয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক, বিশেষ ভাবে আন্তর্জাতিক, বহু পত্রে তাঁর সেই সতর্ক, গভীর এবং বিবিধ সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতি ব্যস্ততার ভিড়ে তিনি ক্লান্ত হতেন অথচ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র নবযুগের মৈত্রীবাণী দেশে দেশে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় তিনি সেই ভিড়ে নামতেন। কবি-মানসের পক্ষে আশ্রমের একটি শ্রাবণ মেঘান্বিত দিনই যথেষ্ট কিন্তু যিনি মানব-সভ্যতার অগ্রদূত, সংসারের কঠিন সাধনায় যিনি আহূত সেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে জনতীর্থে বেরোতে হত— শিক্ষার কাজে, প্রচারের অভিযানে। কবি ও কর্মী, চিত্রী ও সমাজ-সংস্কারকের মধ্যে যথার্থ কোনো দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু একই মানুষ বহুধাশক্তিযোগাৎ আত্মদানে নিরত, নিজের অর্থ শান্তি ত্যাগ ক'রে আশ্রমের অন্ন-বিত্তের আয়োজনে দেশে বিদেশে ভিক্ষাচারী— একদিকে তাঁর উত্তরায়ণের কোণার ঘর, লেখবার টেবিল, গানের আকাশ; অন্যদিকে দুর্যোগের ছায়াচ্ছন্ন বৃহৎ লোকালয়— এমন অবস্থায় তাঁর চিঠিতে ক্ষোভ-দ্বিধান্বিত ভাব দেখা দিয়েছে এটা আশ্চর্য নয়। সমুদ্রের দুই পারেই যাঁর ঘর এমন বন্ধুকে তাই তিনি যাত্রীর দুঃখ জানিয়েছেন।

পত্রাবলীতে কবির অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যতের দৃষ্টি, ভবিষ্যদ্বাণী আসন্ন যুদ্ধের সংসর্গে বারম্বার দেখা দিয়েছে। ১৯১৩ এবং ১৯১৪ সালে লেখা বহু চিঠিতে য়ুরোপগ্রাসী, সর্বমানবব্যাপী ভয়ংকর একটি নরঘাত পর্বের দ্রুত সূচনা তাঁর অবচেতনাকে অধিকার করেছিল। তখন পশ্চিমদেশের মানুষও জানত না ঝড় কত কাছে। রবীন্দ্রনাথের পত্রে শঙ্খ বেজে উঠেছে, তারপর বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হল তাঁর "ঝড়ের খেয়া" কবিতা, তার তর্জমা হাতে লিখে তিনি

এণ্ডরুজকে পাঠালেন। ঠিক এই ভাবেই টমাস্ হার্ডির কবিতায়, ক্যান্ডেন্স্কি-র ছবিতে যুদ্ধের পূর্বেই তার হুবহু বর্ণনা দেখা যায়, যদিও প্রথমে কেউ লক্ষ্য করে নি। ব্যাপারটা অলৌকিক নয়, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনেরই পরিচয়। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর পশ্চিম রাষ্ট্রবিরোধী অভিযোগকে অতিক্রম ক'রে একান্ত আত্মীয়বোধই ফুটে উঠেছিল।

বিদেশ থেকে কবি ভারতীয় অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল একান্ত জাতীয়তার বশে ভারতবর্ষ পশ্চিম এবং বিশেষ ক'রে ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন করবে। গান্ধীজি-প্রবর্তিত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রভু-দাস সম্বন্ধকে অসহযোগের দ্বারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, অন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক বিধিকে বর্জন ক'রে কল্যাণের মুক্তযোগ গড়ে তোলা। প্রধানত এণ্ডরুজের মধ্যবর্তিতায় গান্ধীজির এই মুক্তি আন্দোলনকে কবি চিনতে পারলেন, ভারতযুগ-স্রষ্টা দুই মহাজীবনের সেতুরূপে এই সত্যভাষী বিনম্র ইংরেজ বন্ধুর দান মহনীয়। যে-বিজয়ী বিপ্লবশক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন আন্তর্জাতিক সমাজে উন্নীত করল তার প্রতিশোধহীন পন্থা এবং ধ্বংসদ্বেষহীন জন-আচরণ ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ঘটনা। এণ্ডরুজ কত অগণ্যভাবে এই শক্তির পরীক্ষায় গান্ধী-রবীন্দ্রনাথকে এবং ইংরেজ-ভারতীয় বহু সাধককে সাহচর্য দিয়েছেন তার ইতিবৃত্ত আজও লেখা হয় নি।

পত্রাবলীর সরস সহাস্য কথোপকথনের ভঙ্গী, গীতিমাধুর্য, তার প্রসন্ন একাগ্র মানস এই তর্জমায় পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। প্রাঞ্জল নিপুণ ভাষার সৌকর্যে শ্রীমতী মলিনা রায় বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সম্পদ যোগ করলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার এমন অনুবাদ পড়ি নি। হঠাৎ চমকে উঠে মনে হয় কবির গলার আওয়াজ শুনছি। সামনে বাতায়ন, কাঁকর-ঢালা রাস্তা, কোনার্কে হয়তো রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজের সঙ্গে গল্প করছেন। পাশের শ্যামলী বাড়িতে পরে একদিন গান্ধীজিও এলেন। প্রথম তিনজনে একত্র শান্তিনিকেতনে বসেছিলেন মন্দিরের কাছে আশ্রমের বড়োবাড়ির দোতলায় : অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে আঁকা সাক্ষ্য। যে-সব দিন অনবদ্য মাধুর্যে সহজ ছিল, সত্য ঘটেছিল তার কিছু চিহ্ন এই বইয়ের পাতায় রয়ে গেল।

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়
১ জানুয়ারি ১৯৬৬

অমিয় চক্রবর্তী

প্রাসঙ্গিকী

রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজের মানসবিনিময়ের বাণীরূপ পাই এঁদের পরস্পরের চিঠিপত্রে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবের গতি-অনুক্রমে ১৯১২ থেকে ১৯২১ সালের কিছু সংখ্যক পত্র বাছাই করে এণ্ডরুজ কয়েকটি পর্বে সেগুলি গ্রন্থন করেন। কবিমনের ক্রমশ-অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে প্রত্যেক পর্বে তিনি ভূমিকা সংযোজন করেন। বইটির নাম দেন LETTERS TO A FRIEND। তারই বাংলা অনুবাদ এই পত্রাবলী। এই সময়কার বেশির ভাগ চিঠিতে কবি এণ্ডরুজকে সম্ভাষণ করেছেন MY DEAREST FRIEND বলে। পরে কখনো বা 'প্রিয় বন্ধুবরেষু' 'Sir Charles' বা 'Dear Charlie' সম্বোধন করায় এণ্ডরুজ উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই পত্রগুলির যোগসূত্রে এণ্ডরুজের কয়েকটি পত্রের অনুবাদ পরিশিষ্টে সংযোজিত হল। এ ছাড়া এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু অপ্রকাশিত চিঠি এবং রচনা সংকলিত হয়েছে।

সৃষ্টিশীল দুটি বিশাল প্রাণের কর্মযোগ ও অধ্যাত্মযোগ -সাধনায় কত সমস্যা ও সংকট এসেছে এইসব পত্রে তার আভাস পাই। এইসব গভীর চিন্তাশীল লেখাও এঁদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধে যুক্ত প্রীতি ও সখ্যের মাধুর্যে কত সরস! ইংরেজি বইখানির পুনঃসংস্করণ না হওয়ায় পত্রগুলিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করে তার পরিচয় প্রসারিত করার ইচ্ছা স্বভাবতই মনে জাগে।

অনুবাদ যেন সপ্রাণ হয়, মূল রসের বিকৃতি বা লাঘব না হয়, সেই অভিপ্রায়ে আমার অবিরাম লক্ষ্য ছিল লেখক দুজনের মননজগৎ ও লেখনভঙ্গি অধিকারের— আর অনুসন্ধান করেছি এঁদের জীবনের বহির্ভূমিকায় কত পালাবদল, পরিবেষ্টনের ইতিহাস।

যে-সব বই ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সহায়তা পেয়েছি, তার উল্লেখ রইল সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টে।

এই পুণ্যকর্মের প্রেরণায় প্রথমেই স্মরণ করি আমার মাতৃভূমি চট্টগ্রামের আনন্দময় পরিবেশ— সেখানকার গৃহে ও বিদ্যায়তনে আমার জীবনের সর্ব

চিন্তা ও কর্মের উদ্‌বোধন। আমার দিদিমা ও মামার শুভকামনা সব চেষ্টায় আজও আমি অনুভব করি। মনে পড়ে আমার স্নেহশীল দাদা হিরণচন্দ্র, স্বর্গত ফুল্লেন্দুকিরণ ও আবাল্যসাথী প্রমোদরঞ্জন ও স্বর্ণেন্দুকিরণকে— আমার কৈশোরের সামান্য রচনায়ও যাঁদের অফুরন্ত আনন্দ ছিল। আর শান্তি-নিকেতনে এসে যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় কর্মের পথে পেয়েছি সাহস ও আনন্দ তাঁরা আমার পূজনীয়া ইন্দিরাদেবী, শিশুবিভাগের কণাদেবী ও মাসিমা পঙ্কজিনী-দেবী। বিবিদি ও কণামাসিমা এ কাজের আরম্ভ দেখে গেছেন, প্রকাশ-আকারে প্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না বলে দুঃখ রয়ে গেল।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের পরিনির্দেশে পত্রাবলীর কিয়দংশ প্রথম বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয় ও পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে পত্রগুলির প্রকাশ সম্ভব হল। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদেবীর আগ্রহ ও পরামর্শ এ প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে জড়িত। 'পরিচয়' অংশে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী গুরুদেব ও আশ্রমবন্ধু এণ্ড্রুজের স্মৃতিতর্পণ করেছেন। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর বইটি অনুবাদ করার কথা প্রথম আমাকে বলেন। অনুবাদের কাজে অগ্রসর হওয়ায় উৎসাহিত করেছেন শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী ও শ্রীঅশোকবিজয় রাহা রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজের মূল পত্রগুলি দেখার অনুমতি দেওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে কত সুবিধা হয়েছে। এণ্ড্রুজের ডায়ারি দুটির সন্ধান পাওয়া গেল শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে; পুস্তকের পরিশিষ্ট সম্পাদনায় তাঁরঅকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তথ্যপঞ্জী প্রণয়নে কিছু সহকারিতা করেছেন শ্রীমনীষা দাশগুপ্তা, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবীরচন্দ্র মজুমদার।

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাজ্ঞানের অবারিত সুযোগ ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের মূল্যবান উপদেশ পেয়ে পরিশিষ্ট রচনায় সবিশেষ উপকৃত হয়েছি।

লখনউ-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্রুজের পিতাকে লেখা রবীন্দ্র-নাথের মূল চিঠিখানি পাঠিয়েছেন। এণ্ড্রুজের লেখা কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের ফটোস্টাট কপি পাঠিয়েছেন ড. অমিয় চক্রবর্তী। পিতা নন্দলালের আঁকা এণ্ড্রুজের ছবিখানির সন্ধান এবং সেখানি ছাপাবার অনুমতি দিয়েছেন শ্রীবিশ্বরূপ বসু। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ও শিল্পগুরু নন্দলালের আঁকা ছবি

ছ'খানি ছাপবার অনুমতি পেয়েছি বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে। আনন্দ-অন্তরে আজ আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পুস্তকের আয় শান্তিনিকেতনে পিয়রসন হাসপাতালে দীনের সেবায় নিয়োজিত হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতি রক্ষা হবে।

ভূমিকা

আমি তখন সবেমাত্র শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। এই পত্রগুলি কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই আমাকে লেখেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি য়ুরোপ থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়াতে তখনই তাঁর কাজে যোগ দিতে পারি নি। তার পরেই আবার আমাকে বন্ধুবর পিয়রসনের সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতে হল। সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিপত্রে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলছিল তাতে আমরাও তখন যোগ দিয়েছিলাম। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে ফিরলাম। তার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফিজি যাবার আগে পর্যন্ত আমরা দুজনেই কবির সঙ্গে ছিলাম।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে নইনিতালের কাছে রামগড় থেকে কবি আমাকে প্রতিদিন যে চিঠিগুলো লিখতেন, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গ্রীষ্মের ছুটিটা পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে পৌঁছবার পর থেকেই যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যুযন্ত্রণারই সমতুল্য। তার হাত থেকে যে কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবেন তাও তখন আশা করতে পারেন নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানকার অত্যধিক গরম থেকে গিয়ে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করে। মে মাসে লেখা চিঠিগুলোতে যে মানসিক পীড়ার উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই কেটে গিয়েছিল। জুন মাসে তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা খুবই ভালো। ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে তিনি তাঁর কাজে আবার পূর্ণ উদ্যমে মেতে উঠলেন। সেই জুন মাসটিকে বিশেষ একটি আনন্দের সময় বলে আমারও মনে পড়ে।

কিন্তু জুলাইয়ের আরম্ভে আবার তাঁর জীবনে সেই পুরানো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আবার তিনি তার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অস্বাস্থ্য বা প্রতিকূল



সি. এফ. এণ্ডরুজ

নন্দলাল বসু - অঙ্কিত

আবহাওয়া এসব কিছুই নয়, এমন-কি স্কুলের কাজও তখন খুব চমৎকার ভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি কতবার আমাকে বলতেন যে, কিরকম একটা অনির্দেশ্য এবং অবর্ণনীয় ক্লেশ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। শান্তি-সাধনায় তিনি নির্জনে যেতে চান। স্কুল থেকে সরে কিছুদিন সুরুলে গিয়ে একা রইলেন। তাঁর এই অবসাদের ভাব কাটতে প্রায় তিনমাস লেগেছিল। এ সময়ে বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেখেনই নি। তবু অসহ ব্যথায় কি যে কাতর তাঁকে দেখেছি সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তখনো আমরা পাই নি। এমন-কি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা ছিলাম যে এ বিষয়ে সম্ভাব্য আলোচনা বা কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তাঁর মন সেই ঘনিয়ে-আসা দুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে। এই সময়েই তিনি 'বলাকা'র 'সর্বনেশে' কবিতাটি লেখেন এবং যুদ্ধারম্ভের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে যে অকস্মাৎ ধ্বংসের প্লাবন নেমে আসছে, তার পূর্বাভাস এতেই আমরা প্রথম পাই। এতে রয়েছে—

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্ট হেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো॥
জীবন এবার মাতল মরণবিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।

সেই সময়কার কথা যখন ভাবি—ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তখন আমার নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবির্ভাব বহুপূর্বেই ছায়াপাত করেছিল। অন্য কোনো ভাবেই তো আমি তাঁর এই তীব্র মনোবেদনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি না।

লণ্ডন। ১৬ আগস্ট ১৯১৩

আপনি এখন শান্তিনিকেতনে আছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। সেখানে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়া যে আমার কতখানি আন্তরিক ইচ্ছা, তা কি করে বোঝাই ?

অবশেষে ইংলণ্ড থেকে আমার ফেরবার সময় এসে গেল। বুঝতে পারছি, এখানে এই পশ্চিমে আমার কাজের বিস্তৃতি আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। এর পিছনে যতখানি মন দিতে হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা ততখানি নয়। যত শীঘ্র সম্ভব, এখন তাই আমায় নির্জনতার আশ্রয় নিতে হবে। কেন না ফলবান বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ক্ষেত্রের নিরালা অভ্যন্তরেই সম্ভব।

আজ সকালে আমি মোটরে রোটেনস্টাইনের পল্লীভবনে যাব। তাই এখন যদি আর একটুও দেরি করি, তবে এ ডাকে আর কাউকে চিঠি দিতে পারব না। সেই ভেবে এখানেই এ চিঠি শেষ করছি।

কলিকাতা। ১১ অক্টোবর ১৯১৩

দেশে ফেরার পর যেন অবসাদের অন্তহীন কাল পার হলেম। জীবনটা বড়ো শূন্য এবং আমার একার পক্ষে গুরুতর দায়ভারগ্রস্ত ঠেকছিল। বুঝি ইংলণ্ডের বন্ধুদের উপর বেশি নির্ভরশীল হওয়ায় আমার চিত্তস্রোত বাইরের দিকে বয়ে চলেছিল। আমার নিজের দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পশ্চিমের মতো অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এখানে ফিরে এসে হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করেছি। অবশ্য নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে প্রত্যেককে একাই লড়তে হয়। কিছুকাল এই নিঃসঙ্গতা আমার মনে অত্যন্ত গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল। অবশেষে আমি পূর্বের মানসিক সমতা ফিরে পেয়েছি। বাইরের জগৎ থেকে আমার চিত্তের প্রবাহ যে এতদিনে অন্তর্মুখ হয়েছে তাও টের পাচ্ছি। স্থিতচিত্ত হওয়ায় এখন আবার লোকের সাহচর্য আমাকে গভীর আনন্দ দেয়, প্রাণপ্রাচুর্যের বেগও অনুভব করি। মনের ভার দূর করে তা এখন আমাকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। সেইজন্যই আমাদের মন মাঝে মাঝে অনুদার প্রাদেশিকতায় ভরে ওঠে। শান্তিনিকেতনে আমাদের আশ্রমের ছেলেদের দৃষ্টির পরিধি কিন্তু যথাসম্ভব বিস্তৃত হওয়া চাই।

বিশ্বমানব সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্যও যেন ব্যাপকতর হয়। এ প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা চাই। তবে সে তো শুধু বই পড়ে হবার নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের ফলেই তা আসবে।

শান্তিনিকেতন। ১১ অক্টোবর ১৯১৩

শান্তিনিকেতনের কাজে নিয়মিত যোগ দেবার আগে আপনার শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার বীজ নির্মূল করা চাই।

অবিলম্বে আমাদের কাছে এসে কিছুকাল চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া কি আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? এখানকার কাজ নেবার আগে জগদানন্দও খুব বিশ্রী ধরণের ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন। বোলপুর আসাতেই তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। আমাদের আশ্রমকে আপনি একবার পরীক্ষার সুযোগ দিন। এখানে এলে নিশ্চয়ই আপনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। ঘরে আপনার জন্যে একটি ডেস্ক্, লেখার সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকবে। স্কুলের জমিতে আপনি ছোট্ট একটু বাগান করতে পারেন, আর যদি মন চায়, আমাদের শালবীথিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াবেন। আবার কখনো বা যদি আমাকে গ্রীক্ সাহিত্য পড়াতে চান, তবে আপনার পক্ষে সেটা খুব ক্লান্তিকর হবে না আশা করি।

কদিন ধরে গান রচনায় আমাকে পেয়েছে। রোজ নতুন নতুন গান রচনা করছি।

শান্তিনিকেতন। ফেব্রুয়ারি ১৯১৪

আপনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি প্রায় দুমাস আগে রচিত আমার একটি গানের অনুবাদ। মৃত্যুশোকের[১] উপলব্ধিতে ও তার শক্তিতে আপনার অন্তর পূর্ণ। এই সময়ে আমরা সবাই আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি। গান্ধীজী ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আপনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদেরই সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সকলের অনুরাগ ও

---

১ এণ্ডরুজের মায়ের মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে, এণ্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই তাঁর মা মারা যান।

শুভেচ্ছা আপনাকে ঘিরে ছিল।

আমি এখনো ভারি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করছি। আজ পর্যন্ত একটু বিশ্রাম পেলুম না, নিজের কাজকর্ম নিয়ে গুছিয়ে বসতেও পারলুম না। প্রত্যহই নানা আকারে বাধা এসে পড়ছে। এবার আমি মনস্থির করেছি। ঠিক করেছি একটু কঠিন হব, সব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করব, আর সব চিঠির উত্তর দেবার জন্যে ব্যস্ত হব না।

আশ্রমের গাছে আমের বোল দেখা দিয়েছে। বাতাস শ্রুত এবং অশ্রুত সংগীতে মুখর। আর আমরাই বা কেন ঋতুর ডাককে উপেক্ষা করব? শীত বা বসন্ত মানুষের পক্ষে যেন সমান। দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎই আমরা বোধ করি নে। এমন নির্বোধের মতো আচরণ কেন জানি নে। প্রতিদিন একই কাজের চাকায় আমাদের ঘুরে মরতে হবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলেও কি একটু বেপরোয়া খেয়ালখুশিতে চলতে পারি নে? নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে বসে থাকার আনন্দে অন্য সব দায়িত্ব ভুলে থাকার মতলবেই আছি এখন।

শান্তিনিকেতন। ৫ মার্চ ১৯১৪

সম্প্রতি কিছুদিন আমি শিলাইদহের নির্জনতায় একাকী বাস করে এসেছি। এটা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল। এতে আমার যথেষ্ট উপকারও হয়েছে। সব রকম বিক্ষিপ্ততার মধ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করা দরকার, তা বুঝতে পারছি। সে ভাবেই আমার অন্তরের সম্পদগুলো বাড়িয়ে তুলতে পারব। কর্তব্যজ্ঞানে অন্যের উপকার করছি ভেবে জোর করে কোনো কাজে লাগা আমার পক্ষে অনুচিত। তার চেয়ে বরং যে কাজটি করব তাকেই সত্য ও জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করব।

একদিকে পরহিতে শক্তি ব্যয় করা আর অন্য দিকে নিজের অন্তরে অপরকে দেবার মতো সম্বল কিছু সঞ্চয় না করা— এরকম অবস্থাটা নিতান্তই অসংগত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতন। ১০ মে ১৯১৪

আপনি আমার পাহাড়ে যাবার সঙ্গী হচ্ছেন কবে? খুব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আপনার দিন কাটছে মনে হয়, তাই বিশ্রাম এখন আপনার পক্ষে একান্ত

প্রয়োজন। এই ছুটিতে আপনাকে আমি কোনো কাজ করতে দেব না। ছুটির জন্যে আমরা আগে থেকে কোনো প্ল্যানই করব না। যতদিন পর্যন্ত কুঁড়েমি আমাদের পক্ষে ভার হয়ে না ওঠে, ততদিন চলুন আমরা ছুটির দিনগুলো সম্পূর্ণ বাজে-খরচ করি। মাত্র মাসখানেক যদি আমরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের না দেখি, তাতে আর কার কি ক্ষতি ?

আমরা সর্বদা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার একান্ত আগ্রহে ঘন ঘন বীজ বুনি বলেই কি ফল কম পাই নে ?

রামগড়। ১৪ মে ১৯১৪

এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক যে জায়গাটিতে আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এসে পড়েছি। বাংলাদেশের সমভূমির প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই নে। মাটি সেখানে নম্রভাবে আকাশকে তার আধিপত্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুখের বিষয় কবির চিত্ত সদাই পরিবর্তনশীল, তাই তো সৃষ্টির রূপবৈচিত্র্য তাকে অনায়াসে জয় করে নেয়। এতদিন যে অন্ধ অবিশ্বাসে দূরে সরে ছিলেম, তার জন্যে আজ আমি নগাধিরাজের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইছি।

আমায় ঘিরে এই যে শ্যামশৈলশ্রেণী— এ বুঝি বা পান্নায় গড়া। তারই ভরা পাত্রটি হতে চিরশান্তি ও দ্যুতি উপচে পড়ছে। এই সুগম্ভীর নির্জনতাটি যেন ফুলের মতো তার সৌন্দর্যের পাপড়ি দিকে দিকে মেলে দিয়ে জ্ঞানের মধু অন্তরে সঞ্চিত করে রেখেছে। আমার সমগ্র চৈতন্য এখন পূর্ণসত্তায় নিমজ্জিত। আর এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।

রামগড়। ১৫ মে ১৯১৪

এতদিনে আমি পরিপূর্ণতার সুখ-আস্বাদন পেয়েছি। জায়গাটির বিজনতা যে শুধু আমার কর্মক্লান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোরাকও জোগাচ্ছে। এরকম জায়গায় এলে বুঝতে পারি এতকাল কি অতৃপ্তক্ষুধায় কোনোমতে বেঁচেছিলেম।

এই পরিবেশে পেলুম আমার অজানা পরিচয়। একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমার সত্তায়ও সেই একই ধারা

এই বোধে আমি বিস্ময়ে অভিভূত। আমরা যখন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই তখন নিজেদের চতুর্দিকে ধুলো ওড়াই আর এই পরম সত্যটিকে ভুলে থাকি যে, আমরা আছি। অন্তর থেকে যে দৃষ্টি আসে, সেই আলোর সংকেতে এই বিশ্বচিত্র দেখার কোন্ সে অমিত আনন্দ আপনাকে তা কী জানাব !

রামগড়। ১৭ মে ১৯১৪

আজ আমার পিতৃদেবের বার্ষিক জন্মতিথি। আমাদের ভোরের উপাসনা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার অন্তর পূর্ণের চেতনায় ভরপুর। আজ সকালে ঝোড়ো হাওয়া বইছে— চারি দিকে ঘোর অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে একটি ম্লান আলোর রশ্মি হঠাৎ আকাশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হয়, এটি আমার আধ্যাত্মিক নবজন্মলাভের সূচনা বয়ে আনছে। আমি একটি মহান্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত অন্তরে অনুভব করছি, অবশ্য গভীর দুঃখের বীজও তার মধ্যে নিহিত আছে। চিরন্তন সত্যের অন্তরে পুনর্জন্মলাভ আর সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে শাশ্বত চিত্তের হৃৎস্পন্দন অনুভব আমার আত্মার ব্যাকুল কামনা। আপনাকে এসব জানাবার কারণ হল, আমার মন কী আলোড়নের মধ্য দিয়ে চলেছে তা আপনি বুঝবেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে একটু সেরে উঠুন, তবেই নবতর আশায় ও শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করবেন।

রামগড়। ২১ মে ১৯১৪

আমি অরণ্য পথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বতশিখর থেকে যে আলো আসছে তা স্পষ্ট, কিন্তু অন্ধকার ঢালু উপত্যকা-পথের বাঁকা ছায়া ভারি ঘন ও ঘোরালো। আমার পা দুটি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্ধশ্বাসে চলেছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুলোয় পড়ে কাঁদি, আর তাঁরই নাম স্মরণ করি।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার

সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পৌঁছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করে শুষে নিচ্ছে।

আমাদের মা কিন্তু স্নেহ-সুকোমল নন। তিনি নির্মমতায় মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেন। যা মরে গেছে তা নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অনুচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতে পৌঁছতে হয়। দুঃখের মাশুল পুরোই দিতে হবে।

যতক্ষণ জীবনের সব ঋণ শোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে না পারব, ততক্ষণ নির্মুক্ত জ্যোতির্লোক বা প্রেমের অমল অমৃত-লোকে প্রবেশ নিরুদ্ধ থাকবে। তবে আমি জানি, মা আমার সঙ্গেও রয়েছেন, আবার আমার সম্মুখ-পথেও তিনিই।

রামগড়। ২২ মে ১৯১৪

আত্মার অবগাহন জলে নয়, আগুনে। জলে বাইরের মালিন্য ধোওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্তু-স্তূপ জীবনকে আঁকড়ে ধরে থেকে তার আতিথ্যকে অবমাননা করে, তাকে তো সরানো যায় না। তাই মাঝে মাঝে আমাদের এই আত্মিক অগ্নিস্নান দরকার।

অথচ সেই অগ্নিদাহের চিন্তাতেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি, সংকুচিত হয়ে পড়ি। তবে মা আমাদের এই ভরসা দিচ্ছেন যে, যা সত্য যা জীবন্ত— অগ্নি তাকে স্পর্শও করবে না।

আগুন পাপকেই দগ্ধ করে, আত্মাকে নয়। আমাদের আত্মাকে আমরা সকল জানার শেষে পাই। কারণ মা যে নিভৃতে গোপনে তাকে পোষণ করেন, সে স্থানটি নিরালোক। দুঃখের আগুনে যে প্রখর আলো জ্বলে, তাতেই সে পুণ্যচ্ছবি আমাদের চোখে পড়ে। কখনো কখনো মৃত্যুই সেই আলো জ্বালাবার মশাল হাতে নিয়ে আসে। আবার, কখনো বা জাগরণের যে দূত নিঃশব্দে আসেন তাঁকে চোখে দেখা যায় না।

এই আগন্তুকটি এবার আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে আমি কত প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে আগুন জ্বলছে — আত্মার সমস্ত নিভৃত গোপন কন্দর উদ্ঘাটিত করে, মিথ্যা ও বঞ্চনার সঞ্চিত স্তূপ দগ্ধ করে সে জ্বলছে। জ্বলুক সেই আগুন, যতক্ষণ তার ক্ষুধার ইন্ধন পায়। যা ধ্বংসের যোগ্য, তার একটুও যেন অবশিষ্ট না থাকে।

রামগড়। ২৩ মে ১৯১৪

এই যে আবার আমি আলো হাওয়াতে বেরিয়ে এসে সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি। বাইরে, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসা, জীবনের সমতা ফিরে পাওয়া, জগতের বিচিত্র আনন্দমেলায় পুনরায় নিজের স্থানটি অধিকার করা— এসব যে কত আরামের সে কি বলে শেষ হয়?

সফলতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল প্রবল উদ্যমশীলতা। যে-শক্তি জয়লাভ করে, তা শান্ত। তার সম্বৃত তেজের অন্তরেই অক্ষয় সম্পদ্ বিরাজ করে। লোভ নিজেকেই নিজে ক্ষয় করে, সে যদি দেবত্বের প্রতি লোভ হয়, তাও।

গত কদিন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করেছি, যেখানে ছায়ারই আধিপত্য, তার অনধিকারের যেন মাত্রা নেই। যত শত্রুর সঙ্গে এতদিন যুদ্ধে রত ছিলুম তারা প্রায় সবই অবাস্তব। তবে এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহৎ শিক্ষা বহন করে এনেছে। অসত্য যখন জীবনের অনেকখানি স্থান হালকাভাবে জুড়ে বসে থাকে, তখন তাকে দেখাও যায় না, অনুভবও করা যায় না। আমরা যেন তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চলি। কিন্তু এখন, আমি যেমনি তার অনাবৃত বীভৎস রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার মেনেছি।

রামগড়। ২৪ মে ১৯১৪

এখানকার পার্বত্য ওক গাছের মতো আকাশ থেকে দিনে দিনে আলোর সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে আমি শক্তিমান করে তুলেছি। ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তিপরীক্ষায় আমি প্রস্তুত। আবার আমি শুনি জীবনের আকুতি— বলে, প্রাণের উৎসুক আগ্রহ হোক সক্রিয়, প্রসারিত কর আপনাকে; আত্মার সম্বন্ধ-যোগে জগতে প্রবেশ কর, দেহ ও মনকে নিত্য জাগ্রত রাখ।

বীণায় যখন তার থাকে অসংখ্য তখন তার প্রত্যেকটিতে সুর মেলানো যেমন কঠিন, তেমনি মানুষের প্রকৃতিই যেখানে জটিল সেখানে সুসংগতি কঠিনতর।

তবু আমি জানি জীবন সরল, তার যান্ত্রিক গঠন যতই জটিল হোক না কেন। জীবনের কেন্দ্রে যে সরল সত্য রয়েছে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

রামগড়। ২৫ মে ১৯১৪

রাতের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও দিন সহজস্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল এবং প্রত্যক্ষ। রাত্রি বাস্তবের সব সমস্যা ঢেকে রেখে স্বপ্নরাজ্যের একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সত্যের অন্তস্তল উন্মোচিত করে দেখায়। যা-কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামে রত, যা কিছু মুমূর্ষু অথবা মৃত, সবই প্রকাশিত করে দেয়; শ্রী ও শক্তি নিয়ে উদ্গত যে অঙ্কুর তার বিস্তারে শুধু সাহায্য করে তা নয়, তার মূলেও রয়েছে এই আলোক।

সব অসংগতি চোখে দেখেও সংগতির সুষমা আমরা অন্তরে অনুভব করি। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সর্বত্রই আছে, তবু সুন্দর চিরজয়ী। দিন যখন অনাড়ম্বর শুভ্র পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, রাত্রি তখন মিথ্যার রহস্যজাল নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে। দিনের পশ্চাতে বিজয়গৌরব বয়ে আনে আশা এবং আনন্দ। কেননা তখন আর একটি ঘাসের শীষ বা কণ্টক পর্যন্ত চক্ষুর অগোচরে থাকে না।

আমার জীবনেও অবশেষে প্রাতঃসূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে। ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষের কাল আমি অতিক্রম করে এসেছি। এখন পিছন ফিরে জীবনের বন্ধুর পথের দিকে তাকালে দেখি তা কোথাও পরিণত-শ্যামল, কোথাও বালুকাময় ঊষর। তবু মন বলে, এ সবই ভালো। প্রশস্ত এই পথ, দিগন্ত-বিস্তৃত এর গতি; তার চারি দিকে বিরাজ করছে রবির আলো।

দ্বিতীয় পর্ব

ভূমিকা

পর পর কয়েকটি মাস কবির মানসিক উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলে, অবশেষে অতি ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের আরম্ভ ভাগে এই বেদনা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তার একটি কারণ, যুদ্ধহেতু পৃথিবীর বিপর্যয়, অন্য কারণ বেলজিয়ামের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা। এই সময়ে একই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজিতে তাঁর তিনটি কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারি সেই সময়ে তাঁর মধ্যে কী দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। এর প্রথম কবিতাটির নাম The Boatman : পাড়ি (মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে)। এটি লেখার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন সেই নির্জন প্রাঙ্গণে যে মেয়েটি ধুলায় বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলজিয়ামেরই প্রতীক। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবিতাটি হল The Trumpet : শঙ্খ (তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে কেমন করে সইব !) তৃতীয় কবিতাটির নাম The Oarsmen : ঝড়ের খেয়া (দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন)। এর দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্তী কালের দিকে। কারণ, বিশ্বাসের যে প্রবল শক্তির প্রকাশ এ কবিতায়— তার প্রয়োজন তখনই যখন পুরাতন পৃথিবীর আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে নূতন সৃষ্টির উপকূলে, নব জীবনের অভিসারে প্রলয় পারাবার নির্ভয়ে পাড়ি দিতে হবে।

চতুর্থ কবিতাটি 'বিচার', তখনো প্রকাশিত হয় নি। পরে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কবি সেটি আমায় দেন। সেবার খ্রীস্ট-জন্মোৎসবে তিনি আশ্রমের শিক্ষক ছাত্র সকলের সামনে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। তাতে খ্রীস্টকে তিনি 'শান্তির রাজা' বলে অভিহিত করে দেখিয়েছেন য়ুরোপ কিভাবে তাঁর নামকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে।

শান্তিনিকেতন। ৪ অক্টোবর ১৯১৪

কুয়াশার মোহজাল কেটে বেরিয়ে এসেছি, আর যে দুঃসহ দ্বন্দ্বের বোঝা আবার আমাকে চেপে ধরেছিল তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছি। এখন আমার মন অনেকটা হালকা হয়েছে, তাতেই আশা হয়, এতদিনে বুঝি আমি সত্যিকারের মুক্তি পেয়ে গেলেম।

স্রুল থেকে সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরেছি। এই জায়গাবদলটুকুতে আমার উপকার হয়েছে। ডাক্তার মৈত্র আপনার সম্বন্ধে আমাকে একখানা খুব বড়ো চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলছেন, আবার যদি অসুখে পড়তে না চান তো ভবিষ্যতে আপনাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

শান্তিনিকেতন। ৭ অক্টোবর ১৯১৪

আমার জীবনের আর একটি অন্ধকারের যুগ কেটে গেল। সত্যিই সেটি আমার পক্ষে মস্ত পরীক্ষার কাল গেছে। মুক্তিলাভের জন্য তার প্রয়োজনও অবশ্য ছিল। এ যেন এক জন্মান্তর ঘটল। এই নতুন জগতের একাকিত্ব আর পুরোনো বন্ধন ছেদনের বেদনা— দুইই আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তবে, আনন্দের আভা দূরে দেখতে পেয়েছি, সেই আলোর প্রসাদ পাবার আর দেরি নেই।

উপদেশ দেওয়া আমাকে বন্ধ করতেই হবে। জগতের কল্যাণে দেবদূতের ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টাও কখনো করব না। আলো কেবল যেন আমি হাতে ধরেই না থাকি, বরং অন্তরের আলোতে আপন চিত্ত যেন সর্বদা উদ্ভাসিত থাকে— এই প্রার্থনাই নিয়ত করছি।

দার্জিলিঙ। ১১ নবেম্বর ১৯১৪

প্রেম এক পরমাশ্চর্য বস্তু। কখনো তাকে নিজের প্রাপ্য বলে আমরা ধরে নিতে পারি নে। আপনার ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য, ভেবে পাই নে কি করে আমি তা পেলুম। সম্ভবত সব মানুষেরই এমন কিছু মূল্য থাকে যা তার নিজের অজানা— তা দিয়েই সে অপরের ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সত্য তার চেয়ে ঢের বড়ো। তাই যে

ভালোবাসা আমরা যুক্তি দিয়ে দাবি করতে পারি নে, তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি। আমাদের মধ্যে অনন্তের যে অংশ রয়েছে, তারই প্রতি এই প্রেম। যে অংশ অতিপ্রত্যক্ষ, তার প্রতি নয়।

কেউ কেউ বলেন, যাকে ভালোবাসি তাকে কল্পনায় আমরা বড়ো করে দেখি। কিন্তু বস্তুত ভালোবাসি বলে তার মধ্যেকার বড়ো অংশটুকু আমরা ধরতে পারি। এই আদর্শসত্তাটিই আসলে তার বাস্তবসত্তা।

মানুষের মধ্যে এই অসংগতি চিরকাল রয়েছে— অযোগ্যতার মধ্য দিয়েই আমাদের যোগ্যতার প্রকাশ হয়, আর ভালোবাসা অপরিণত অবস্থায়ও আসল মানুষটিকে চিনে নেয়। ভালোবাসা না পেলে আমরা বুঝতেই পারতুম না যে, যেমন আমাদের বাইরের পরিচয়, তার চেয়ে আমাদের মূল্য ঢের বেশি।

শ্রীযুক্ত রুদ্রকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। তাঁকে বলবেন, আমি চিঠির অরণ্যে পথ হারিয়েছি। পৃথিবীর চতুর্দিকে ধন্যবাদ বিতরণ করে করে এমন অবস্থায় এসেছি যে, কৃতজ্ঞতার কণামাত্রও বুঝি আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট রইল না।

কলিকাতা। ১২ নবেম্বর ১৯১৪

বিদ্যালয়ের এই আর্থিক দুর্গতি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তা জানি, কিন্তু সেই কল্যাণটুকু আকর্ষণ করে নেবার মতো যথেষ্ট মনোবলও তো আমাদের থাকা চাই। সত্যে বিশ্বাস সক্রিয় রেখে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হলে চলবে না। সমস্ত আশ্রমকেই তার নির্জীব নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্য ছাড়তে হবে। বিপন্ন অবস্থায় বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা না রেখে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ অভিজ্ঞতা নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য কাজে লাগায়।

আমাদের বিদ্যালয়টি একটি প্রাণবান প্রতিষ্ঠান। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোটো, সেও যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, বিদ্যালয়ের যে-কোনো সমস্যা তার নিজেরই সমস্যা। কিছু যদি আমরা পেতে চাই তবে আমাদের দিতেও হবে। আশ্রমের ছোটো ছোটো শিশুরাও যেন এই অসুবিধার কথা কিছু কিছু জানতে পারে। এর দায়িত্বের কিছু অংশ নিজেরাও বহন করছে জেনে তারাও যেন গর্ববোধ করতে পারে।

কলিকাতা। ১৫ নবেম্বর ১৯১৪

সমালোচক আর ডিটেকটিভ— এই দুধরনের লোকই স্বভাবত সন্দিগ্ধ। যেখানে কোথাও কিছু নেই, সেখানেও তাঁরা কেউ গুপ্ত রহস্য আর কেউ-বা বোমার গন্ধ আবিষ্কার করেন। তাঁদের বিশ্বাস করানোই মুশকিল যে, আমাদের মনে কোনো অভিসন্ধি নেই।

আমার 'রাজা' নাটকের সমালোচনার বিষয়ে আপনি উল্লেখ করেছেন। মানুষের আত্মায় যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোনো ভেদ নেই। মানবপ্রকৃতির পাপলিপ্সার প্রতীক লেডি ম্যাকবেথ। সুদর্শনাও কিন্তু নিছক একটি কাল্পনিক চরিত্র নয়। যাই হোক, এর তাৎপর্য সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিমত কি— তাতে কিছু এসে যায় না। তারা যা আছে তাই— সেজন্য কোনো নিয়মের কোঠায় তাদের বন্দী করা কঠিন।

শীত কাটাবার পক্ষে রামগড় জায়গাটি বেশ ভালো বলে জানি। তাই সেখানে গিয়েই সামনের কটি মাস চুপচাপ কাটিয়ে দেব ভাবছি। তবে সেটি আমার একটি গোপন বার্তা, আপনি কিছুতেই সেটি বাইরে প্রকাশ করবেন না। যেখানে যাই ঘটুক, আমাকে চিঠিপত্রের নাগালের বাইরে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ একাকী থাকা এখন আমার প্রয়োজন। বাৎসরিক সভা বা ভাষণ বা সম্মেলন — তা ছাড়া আরও যত সব বিরক্তিকর ব্যাপার আছে, যাতে মানুষ নিজেকে না জড়ালেও পারে, অথচ যা মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকবে— সে সমস্ত আমি এড়াতে পারব যদি এভাবে মানুষের অগম্য স্থানে থাকতে পারি। আপনি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠে সবে যখন আশ্রমে ফিরছেন, তখনই চলে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় ঠিকই ; কিন্তু মনে হচ্ছে এতে আপনি ছাত্র ও শিক্ষকদের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারবেন এবং তাতেই আমার অনুপস্থিতির বেদনা আপনার পুষিয়ে যাবে।

আগ্রা। ৫ ডিসেম্বর ১৯১৪

আমাদের বোলপুরের ছেলেরা রিলিফ ফাণ্ড খোলবার জন্য চিনি আর ঘি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে— মডার্ন রিভিয়ুতে এই খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। আপনার কি মনে হয় এটা সংগত হয়েছে ? প্রথমত, কাজটি হল

আপনাদের বিলেতের স্কুলের ছাত্রদের অনুকরণ, তাদের নিজেদের চিন্তাপ্রসূত নয়। দ্বিতীয়ত, ছেলেরা যতদিন আমাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে ততদিন তারা তাদের খাদ্যের এমন কোনো অংশই বাদ দিতে পারে না যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ ছেলেরা মাংসের মধ্যেই অনেকখানি চর্বি জাতীয় খাদ্য পায় বলে চিনি ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু আমাদের শান্তিনিকেতনের ছেলেরা যারা খুব অল্প পরিমাণে দুধ খেতে পায় তাদের নিরামিষ খাদ্যে চর্বির অংশ এতই কম যে তাদের পক্ষে এ খুবই অনিষ্টকর।

পাঠ্যবই কেনা বন্ধ করে দেবার অধিকার যেমন তাদের নেই, তেমনি এ ধরনের আত্মত্যাগের পথ বেছে নেবারও তাদের কোনো অধিকার নেই। ওদের পক্ষে আত্মত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায় হবে কায়িক পরিশ্রম করে কিছু অর্থ উপার্জন করা। বিদ্যালয়ের কিছু সাধারণ সেবার কাজ ওরা করতে পারে— বাসনমাজা, জলতোলা, কুয়োখোঁড়া, কিংবা যে পুকুরটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা বুজিয়ে দেওয়া— এ ধরনের গড়ে তোলার কাজ কিছু তারা করুক। এটা সব রকমেই ভালো। তা ছাড়া এতে তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষাও হয়ে যাবে। অপরের অনুকরণ না করে ছেলেরা নিজেরা ভেবে দেখুক, কি ধরনের কাজ ওরা আরম্ভ করতে চায়।

এলাহাবাদ। ১৮ ডিসেম্বর ১৯১৪

আমাদের আশ্রমের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীলে ও উন্মুক্ত প্রান্তরের সবুজে আপনি মন হারিয়েছেন, ভাবতে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনার ওখানে যাবার আগেই যে আমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাতেও আনন্দ পেয়েছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, জগতের নিগূঢ় সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে মনের যে শান্তিময় বৈরাগ্যের প্রয়োজন— তা আপনি আমাদের আশ্রমেই পাবেন।

এতদিনে নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন যে, আমার মধ্যে এমন একটি পলাতক মনোভাব রয়েছে যা অন্যদের যেমন আমাকেও তেমনি এড়িয়ে চলে। আমার প্রকৃতিতে এই উপাদানটি রয়েছে বলে আমাকে নিজের পরিবেশটি সব সময় উদার এবং উন্মুক্ত রাখতে হয়। যে স্বপ্নাতীতকে মুহুর্মুহু আমার জীবনে

প্রত্যাশা করছি তার জন্যে স্থান রাখতে হবে তো। বিশ্বাস করুন, মানুষের প্রতি আকর্ষণ আমার খুব প্রবল ; তবু অন্যের সঙ্গে এমন সম্পর্ক আমি গড়তে পারি নে যাতে আমার জীবনের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই স্রোত যে অন্ধকারে নির্জনে বয়ে যায়, তা আমার অগোচর। আমি ভালোবাসতে পারি, কিন্তু মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ যাকে মাখামাখিভাব বলেন, সে গুণ আমার মধ্যে নেই। আরও যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার মধ্যে এমন-একটা শক্তি কাজ করছে যা অন্য-কিছুতে আমার কোনো রকম অনুরাগ সহ্য করতে পারে না, সব সময়ে কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্যে আমাকে তার নিজস্ব করে রাখতে চায়।

এই উদ্দেশ্যটি যদি নৈতিক হত তা হলেও সহজে বহন করা যেত— শুধু মানা নয়, সাদরে বরণ করে নেওয়াও চলত। কিন্তু এ যে আমার জীবনের নিগূঢ় অভিপ্রায়, তাই তার ক্রমবিকাশের বেগ রোধের উপায় নেই। অন্যান্য জীবনস্রোতের সংস্পর্শে এলেই তা খানিকটা বাধা পায়। কথাগুলি একটু অহংকারের মতো শোনায় হয়তো। কিন্তু আমি যে-ব্যক্তির জীবনপ্রেরণার কথা বলছি, সে তো আমার 'অহং'-এর বাইরে। স্বীকার করতেই হবে, আমার যিনি অন্তরতম, তিনি কোনো কাল্পনিক নৈতিক আদর্শমাত্র নন। তিনি একজন ব্যক্তি। তাঁর কাছে আমাকে খাঁটি থাকতেই হবে। তার জন্যে লোকে যাকে সুখ বলে, তাও আমাকে ছাড়তে হবে। হয়তো লোকে আমাকে ভুল বুঝবে, ত্যাগ করবে, ঘৃণা করবে। স্বভাবত আমি মানুষের সঙ্গ ভালোবাসি, আর বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গ তো আমাকে খুবই আনন্দ দেয়, অনুপ্রেরণাও আনে। কিন্তু অনেক সময় তার প্রয়োজন আছে বুঝেও আমি তাদের কাছে নিজেকে ছাড়তে পারি নে। সময় এবং স্থানের যে উদার প্রাচুর্য আমি সর্বদা আমার চতুর্দিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি, সে তো আমার নিজের নয় যে তাকে আমি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করব। এই একাকিত্ব মাঝে মাঝে আমার পক্ষে একান্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষতি আমার যথেষ্টই পুরিয়ে যায়। যাঁরা এর মর্ম বোঝেন তাঁদের প্রত্যাশা বিফল হবে না— এ বলা আমার স্পর্ধা নয়।

মানবাত্মা হচ্ছে স্বর্গোদ্যানের ফুল। উৎসুক হাতের চাপে যখন আবদ্ধ থাকে তখন নয়, প্রচুর মুক্ত আলোহাওয়াতে ছাড়া পেলে তবেই তার সৌন্দর্যের ও সুগন্ধের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই—

The world is too much with us : late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers ;
Little we see in Nature that is ours ;
We have given our hearts away, a sordid boon.[১]

আমার ভালোবাসা নিরাভরণ ও মূক। যৌবনে পুষ্পোদ্গমের ঋতুতে তার সাজ ছিল মহার্ঘ— ফলভারে অবনত বৃক্ষের বদান্যতা তাতে ছিল। কিন্তু এখন যে তার বীজ ছড়াবার সময় এসেছে— তাই তার খোসার বন্ধন ভেদ করে তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সাজসজ্জার আড়ম্বর ত্যাগ করে কেবল জীবনের গভীরতাটিকে বহন করছে। তাই সেই গাছের রিক্ত ডাল ধরে নাড়া দিলে কেউই কিছু পাবে না— কেননা সেখানে যে পাবার জিনিসটি নেই। কিন্তু নিস্তব্ধতায় যার বিশ্বাস আছে, আর নীরবে গ্রহণ করার ক্ষমতা যার আছে— সে কখনোই নিরাশ হবে না।

১৯১৪ সালের খ্রীস্টোৎসবের দিন নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি কবি উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন—

বিচার

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,

১ "এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ডস্‌ওর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কোনো কোনো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য-মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতি-পরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিশ্বভারতী'। অধ্যায় ৩

আমার অন্তর
করে হায় হায়!
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।

কলিকাতা। ২০ জানুয়ারি ১৯১৫

তাড়াতাড়ি লেখা আপনার শেষ চিঠিখানা পড়ে বুঝলুম, আপনি তখন খুব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলেন। আপনার মন এখনো সেই মায়ারাজ্যে বাস করে যেখানে ছায়াগুলিও যথেচ্ছ বড়ো হয়ে উঠে সামান্য ব্যাপারেই মানুষকে অসুখী করে তোলে। আমি দেখছি, সুখ জিনিসটাই আপনার পক্ষে ক্লান্তিকর, তার প্রতিক্রিয়া আপনার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যের চেয়েও আপনার এই অবস্থাটি আমার কাছে বেশি উদ্‌বেগজনক।

কলিকাতা। ২৯ জানুয়ারি ১৯১৫

আমার অসুস্থতার খবর দিয়ে আপনাকে ভাবনায় ফেলতে চাই নে, তবু আশ্রমে আমার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে খবরটা আপনাকে দিতেই হল। আমার শরীর প্রায় ভেঙে পড়ার মতো হয়েছে। তাই আমাকে আবার একবার পদ্মার নির্জনতায় পালাতেই হবে। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও বিশ্রামই এখন আমার একান্ত দরকার।

কখনো যদি আপনার রোগের পুনরাক্রমণের সূচনা দেখেন, তবে সাহস হারাবেন না। কোনো রকম অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না এবং মনের বিক্ষোভ যাতে না আসে সে চেষ্টা করবেন, আর বেশ ঘুমোবেন। খুব জোর করে নিজেকে কোনো বিষয়ে, এমন-কি ভগবানের প্রতিও একান্ত সজাগ করে রাখা, ভালো নয়। কারণ আমাদের প্রকৃতি তা সহ্য করতে পারে না। পরিপূর্ণ পাওয়ার ফলেই প্রায় মনে বিষাদ বা নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। আমাদের চেতন প্রকৃতির যা প্রয়োজন তার সঞ্চয়ের জন্য আমাদের মগ্নচৈতন্যকে অনেকখানি সময় দিতে হয়।

কলিকাতা। ৩১ জানুয়ারি ১৯১৫

শুনছি আপনি সত্যিই অসুস্থ হয়েছেন। তা চলবে না। কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখান। তিনি যদি পরামর্শ দেন তবে কাল সকালেই আমার সঙ্গে শিলাইদা চলুন। বোলপুর যেতে আর আমার সাহস নেই। আমি ক্লান্তির এমন চরম সীমায় পৌঁচেছি যে, এরকম স্বার্থপরভাবে সরে থাকার অধিকার আমার আছে। সব দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বলে আমি একটুও লজ্জিত নই। আমাকে সমস্ত মনে-প্রাণে একা থাকতে হবে। আপনি কিন্তু আর দেরি করবেন না। আপনার সম্বন্ধে আমরা বড়োই উদ্‌বেগে রয়েছি। আপনাকে কিছুতেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেওয়া হবে না।

শিলাইদা। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি তীব্র নৈরাশ্য ও অবসাদে কষ্ট পাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার সুস্থ হয়ে উঠেছি। আরো শতবর্ষ আমি বাঁচতে চাই— অবশ্য যদি আমার সমালোচকরা রেহাই দেন, তবেই। সে সময় আমার শরীর ক্লান্ত ছিল, তাই সামান্যতম আঘাতও যে মূর্তি ধারণ করেছিল তা হাস্যকর। সে যাই হোক, আমার মধ্যে এখনো যে সেই শিশুটি বেঁচে রয়েছে, যে মানুষের কাছে আদর পাবার লোভ এখনো ছাড়তে পারে নি তা দেখে আমি খুশি হয়েছি। আমার সমালোচকদের চেয়ে আমি নিজে অনেক উর্ধ্বে— এ-কথা যেন আমি কখনো না মনে করি। সভায় বক্তার আসনে না বসে শ্রোতাদের সঙ্গে সমান আসনে বসে আমি তাদের মতো করেই শুনতে চাই। আমার লেখা যখন তাদের অপছন্দ হয় তখন সেই নিরাশার অনুভূতিও আমার পক্ষে হিতকর। তখন যদি আমি বলি, গ্রাহ্য করি নে তবে যেন কেউ আমার কথায় বিশ্বাস না করেন।

মানবজাতির একটি বড়ো অংশই মূক। তার মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন আশা করি। আমার ধারণা, তাঁরা আমার লেখা পড়তে খুবই ভালো-বাসেন— যদিও ভালোমন্দ কিছুই বলেন না।

এখানে এখন আমি বোটে একটা খুব সুন্দর জায়গায় রয়েছি। মুকুল নন্দলাল ও অন্য একজন আর্টিস্ট আমার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁদের আনন্দের উৎসাহ আমাকেও প্রাণচঞ্চল করে। প্রতিটি ছোটো ব্যাপার তাঁদের ঔৎসুক্য

আয়ায়ু। এমনি করে তাঁদের তরুণ চিত্ত আমার প্রাচীনতারও সংস্কার করে। অভ্যাসের জড়তায় এতদিন যেসব জিনিস লক্ষ্য করি নি— তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিলাইদা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

এখানে পৌছেই আমি নিজেকে ফিরে পেলুম। তাই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পেরেছি। জীবনের সব রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নিজ জীবনের অভ্যন্তরেই সঞ্চিত থাকে। একাকী নির্জনতায় গেলে তবে সেটা খুঁজে পাই। এই নির্জনতাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। এর মধ্যে যে কত অচিন্ত্য রহস্য আছে তার অন্ত নেই। এ অচিন লোক আমাদের এতই কাছে, তবু যেন নাগালের বাইরে। না, আর কথা বাড়াতে চাই নে। আমার এই অনুপস্থিতি এবং নীরবতা— দুয়ের জন্যই আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আমার মনকে আর একটুও বিক্ষিপ্ত করতে পারি নে।

আপনার শরীর এখন আগের চেয়ে ভালো থাকে— এটি আমার একান্ত অন্তরের কামনা।

কলিকাতা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

রবিবার পর্যন্ত কলকাতায় আছি। যদিও আমি চেষ্টা করব, তবু এর আগে তার মুঠো থেকে ছাড়া পাব এমন আশা করি নে। যাই হোক, সোমবার নিশ্চয় গিয়ে বোলপুর পৌছব। তখনো খানিকটা দুর্বল ও অপটু থাকাই সম্ভব, কোনো কাজের ভার নেবার শক্তি হয়তো হবে না।

মহাত্মা এবং শ্রীমতী গান্ধী এতদিনে বোলপুর পৌছে গেছেন আশা করছি। শান্তিনিকেতনে তাঁরা যোগ্য অভ্যর্থনা নিশ্চয় পেয়েছেন। দেখা হলে আমি নিজে তাঁদের প্রীতিশ্রদ্ধা জানাব।

আমাদের আশ্রম সেই নিগৃহীত রাজপুত ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। দেশের লোকদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়াতেই যে সে নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছে, এটি যেন সে বোধ করতে পারে।

ভূমিকা

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি কাল। তার আগে পর পর কয়েকবার রোগে ভুগে আমি সবে সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ি। সেই সময়ে কবির সযত্ন সেবায় ও স্নেহময় সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়েছিলাম। সে বছর খুব গরম পড়া সত্ত্বেও তিনি ছুটিতে কোথাও যান নি। কলকাতায় আমি যখন নার্সিং হোমে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম তখন তিনি আমার কাছাকাছি ছিলেন। পরে যখন আমি সিমলা যাবার মতো সুস্থ হয়ে উঠলাম— তখন আমাদের মধ্যে আবার পত্রচলাচল শুরু হয়।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে আমরা যুদ্ধের সীমা ও পরিধি থেকে অনেকটা দূরে ছিলাম। তাই তার ভয়াবহতা আমাদের স্মৃতি থেকেও সরে যাচ্ছিল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এই যুদ্ধের জন্যই কতকগুলি বৃহৎ সমস্যা কঠোরভাবে আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে এই সময়ে সেই বিষয়গুলির আলোচনাই বেশি করে চলছিল। সে সমস্যাগুলি হল মানুষের বেদনা, মানব সমাজে সৌভ্রাত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা, আর পরস্পর সখ্যের ভিত্তিতে পূর্ব পশ্চিমের মিলন। আমি যখন কলকাতায় নার্সিং হোমে ছিলাম, তখন আমাদের বেশির ভাগ কথাবার্তা এ-সব বিষয়েই হত। কবির মগ্ন চেতনার মূলে এই বিষয়গুলি সারা বছর ধরেই সক্রিয় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু স্কুলের কাজের সমস্ত দায়িত্বভারও তাঁর উপরেই তখন। আর তিনিও তাঁর স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

১৯১৫র গ্রীষ্মকালে সুদূর প্রাচ্যে যাবার একটি দৃঢ়সংকল্প তাঁর মনে আসে। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্যে ভ্রমণ করেন। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অন্তর্লীন গভীর ভ্রাতৃভাবের অনুভূতি হতেই সেই সময়ে তিনি ভূমাকে দেখেছিলেন মানুষের মধ্যে। কবির চিন্তাধারা সর্বদা বিশ্বমানবের অভিমুখী ছিল, কোনো ক্ষুদ্র অংশে কখনো আবদ্ধ থাকে নি। পাশ্চাত্যের এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে তিনি দেখতে পেলেন মানবসমাজ কি

গভীর অসাম্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন! গত বছর যুদ্ধারম্ভের আগে এবং পরে তিনি যে মনোবেদনা পেয়েছেন তার পর থেকেই এই সংকল্প তাঁর মনে প্রবল হল যে তাঁর পিতা মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রম— যা তিনি কেবল ধর্মচর্চার স্থান হিসেবেই স্থাপিত করেছিলেন— তার সীমানা আরো প্রশস্ত করতে হবে। তাঁর আশ্রম তখন কেবল স্কুলের পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল, তাকে বিশ্বমৈত্রীর ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে তাঁর সমভাবাপন্ন শিক্ষক ও ছাত্রদের সমান শ্রদ্ধা ও সমাদরে এই বিদ্যাকেন্দ্রে আতিথ্য দেবার ইচ্ছা কবির কল্পনাকে উত্তরোত্তর উজ্জীবিত করেছিল।

১৯১৫ হতেই এইসব চিন্তা তাঁর মনে কাজ করছিল। তিনি বুঝলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মযজ্ঞ সমাপনের জন্য চীন-জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই কারণেই তাঁকে দূরপ্রাচ্যে যাত্রা করতে হবে। অগস্টেই যাত্রা শুরু করবেন, এ বিষয়ে প্রায় মনস্থির করেই একটি জাপানী স্টিমারে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলেন। এই সময়ে কয়েকটি কারণে যাওয়ার বাধা ঘটল।

দূরপ্রাচ্যে যাবার সংকল্প তিনি যখন সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষে একটি আকস্মিক দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের প্রচলন ছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। বন্ধুবর পিয়রসন এবং আমি নাতালে এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেছিলাম। তাই অন্য যে-কোনো লোকের চেয়ে আমরা দুজনেই এ বিষয়ে বেশি জানতাম। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি যে নীতিবিগর্হিত আচরণ করা হত তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই দূরপ্রাচ্যে যাত্রা স্থগিত হওয়ায়, আমরা যখন ফিজি গিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত করতে চাইলাম, তৎক্ষণাৎ তিনি এতে আন্তরিক স্বীকৃতি দিলেন। আমাদের এই যাত্রা আর তাঁর বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ— উভয়ের উদ্দেশ্য যে এক তা তিনি গভীরভাবেই বোধ করেছিলেন। যাবার আগে তাই তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি আমাকে উপনিষদের দুটি শ্লোক উপহার দেন। সে দুটি হল—

১. আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

২. ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উৎসাহ ও সহানুভূতি দিয়ে আমাদের যে ভাবে অনুপ্রাণিত করলেন তাতেই আমরা সেই যাত্রায় কঠিন ব্রত উদ্‌যাপিত করে আসতে পেরেছিলাম। আমাদের সেই তদন্তের ফল ভালোই হল। আমরা এই প্রতিশ্রুতি পেলাম যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে ভারতীয়দের যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি দেওয়া হবে।

শান্তিনিকেতন। ৩০ জুন ১৯১৫

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে এসেছি। এখানে এখনো ছুটির আবহাওয়া লেগে রয়েছে। কারণ খুব কম ছেলেই ছুটির পরে ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আর ফিরবেই না। তাই আমাদের অর্থসচিব খুব সংকটে পড়বেন মনে হচ্ছে। কেননা এখনো কতকগুলো বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে, আর কিছু বাকি বকেয়াও শুধতে হবে। শরীর যত শক্তই বোধ করুন, এখনই কিন্তু আপনি ফিরবেন না। কারণ আর্থিক উদ্‌বেগ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যাধিবীজের চেয়েও ক্ষতিকর। যাই হোক, স্থির জানবেন, এই কঠিন সময়টা নিরর্থক যাবে না। এই অবস্থাবিপাক যখন পার হয়ে যাব, তখন ছাত্রসংখ্যা কিছু কমলেও আমরা আরো স্বাধীনভাবে চলতে পারব।

নিজের কথা বলি, আমি মুক্তপথের আহ্বান পেয়ে গেছি, যদিও আমার সামনে সব পথই এখন রুদ্ধ। আমার মনোভাব এখন চঞ্চল ভবঘুরের মতো কিন্তু ছাড়া না পাওয়ায় সেটা আমার পক্ষে আরো বেদনাদায়ক হয়েছে। তাঁবুতে বাস না করে, সেই তাঁবু যেন আমি পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছি— এরকমই মনে হচ্ছে। আমার জীবনের বীজাধারটি ভেঙে নতুন বীজ ছড়াবার সময় আবার এসেছে। রক্তে তারই দোলা অনুভব করছি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য এখনো আমার কাছে অজ্ঞাত। তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই— কোনো বিশেষ কাজে নিজেকে আবদ্ধ করা কবির ধর্ম নয়। কেননা তারা হচ্ছে বিশ্বের বিচিত্র অনুভূতির বাহক। কয়েক বছর ধরে অনেক রকম জনহিতকর পরিকল্পনার পর এখন আমার জীবন আবার দায়দায়িত্বের বাধা-বন্ধহীন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চায়— সেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত আছে, সেখানে বনফুল আছে, কিন্তু সেখানে কোনো কমিটি মিটিং নেই।

কলিকাতা। ৭ জুলাই ১৯১৫

আমি কি কোনো এক জায়গায় বলি নি যে, বৈরাগ্য আমার জন্যে নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই আমি মুক্তির স্বাদ পাই? আমার মন যেন এ কথাটি আবার নতুন করে বোধ করে। একটা চিন্তার রূপ দেওয়া হয়ে গেলে তার থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিই। নতুন চিন্তার নতুন রূপ দেবার জন্যে তখনকার মতো আমার অখণ্ড স্বাধীনতা চাই। আমাদের মধ্যে যে সৃজনের প্রেরণা আছে তা নব নব রূপে নিজেকে সার্থক করতে চায়। শারীরিক মৃত্যুর অর্থও তাই। সমাধিমন্দির এক জায়গায় চিরস্থির হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু জীবনকে কে কবে বেঁধে রাখতে পেরেছে? তাকে যে নিত্য তার বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো একই রূপের কারাগারে সে বন্দী হয়ে থাকবে। মানুষ অমর, তাই তাকে বারে বারে মরতে হয়। কেননা জীবন ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে— প্রতি পদক্ষেপেই তার চাই নতুন নতুন রূপ।

পিয়রসনের কাছ থেকে আমার সব প্ল্যানের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। নতুন আবেষ্টনীতে সরে গিয়ে আমি আমার এখানকার আইডিয়াগুলির পাশমুক্ত হতে চাই। শান্তিনিকেতনে আমার কতকগুলি চিন্তাধারা জড়বস্তুস্তূপে পর্যবসিত হয়েছে। বক্তৃতায়ও আমার বিশ্বাস নেই, আর সহকর্মীদের কিছু করতে বাধ্য করাও আমার পছন্দ নয়। কারণ সত্যিকারের আদর্শ যা— তা তো স্বাধীনভাবেই কাজ করবে। জোর জবরদস্তি করে নিজের চিন্তাধারাকে স্থায়ী করার ভয়ংকর ক্ষমতা তার আছে, একথা চিন্তা করতে পারে কেবল দুর্দান্ত অত্যাচারীই। আপনার আইডিয়াগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপনি কতকগুলি ক্রীতদাস সৃষ্টি করবেন— এ ধারণাই হাস্যকর। আমি মনে করি, আমার আইডিয়াগুলি সেভাবে টিকে থাকার চেয়ে তাদের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়। এমন কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের ভাবগুলিকে মূর্ত করে রাখতে চান— আর সেই মূর্তির বেদীতলে মনুষ্যত্বকেই বলি দেন। কিন্তু আমি যে ভাবের আরাধনা করি, তাতে আমি কালীর উপাসক মোটেই নই।

আমার সহকর্মীরা যখন বাইরের রূপের মোহে এতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা তাঁদের লোপ পায়— তখন আমার পক্ষে একটি পথই কেবল খোলা থাকে। সে হল এখান থেকে সরে গিয়ে আমার

আইডিয়াটিকে নতুন আকার দেবার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। যদিও এটি বাস্তববুদ্ধির পথ নয়, তবু এই হল একমাত্র খাঁটি পথ।

কলিকাতা। ১১ জুলাই ১৯১৫

নিয়মনিষ্ঠ লোকেরাই সংসারে আরামে থাকে। তারা নিজ কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যেই বাস করে, তাই বিশ্রামের অংশটুকুও ভোগ করতে পায়। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা করে আমি এমন-সব কাজের সৃষ্টি করি, যা আমার সব সময়টুকু নিয়ে নেয়। তার পর হঠাৎ সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আলস্যের বিলাসে মগ্ন হই।

সামনের সপ্তাহে যখন পদ্মায় ভেসে বেড়াব, তখন এই চিন্তাটাই ভুলে যাব যে, মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্যে সৃষ্টির বিরাট সভাতলে আমার উপস্থিতি একান্তই দরকার।

আমি আর আপনি— দুজনই আমরা— জন্ম-ভবঘুরে। আমার যেটা সত্যিকারের কাজ, সেটা কোথাও দানা বাঁধবে না। সব কাজের প্রারম্ভেই কেবল এই দানা-না-বাঁধার ভাবটি বজায় থাকতে পারে। তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে, কেবল কাজগুলি শুরু করে দিয়েই সরে পড়া। আমি নিজে একটু দূরে সরে না দাঁড়ালে তাদের আদর্শ বজায় রাখতে পারব না। এইবারে অবশ্য আমার শারীরিক এবং মানসিক অবসাদই আমাকে নির্জনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যে ধরণের কাজ করতে পারি তাতে অধ্যবসায়ের চেয়ে মনের সজীবতাই বেশি দরকার। তাই আমার নিজ কর্তব্যে যোগ দেবার আগে কিছুদিনের বিরতি আবশ্যক।

একটি দুর্বল জাতি যখন সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আপনি পৃথিবীতে অন্যায়ের গ্লানি দেখে যে কিভাবে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, সে আমি অনায়াসেই বুঝতে পারছি। মনুষ্যত্বের ভ্রান্ত বিকৃতিগুলি করুণার বিষয় নয়, সেগুলি অতি ভয়ংকর। ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে প্রতি মুহূর্তেই সে ভুলে যায় যে, এই ক্ষমতা আছে বলে ন্যায়াচরণের দায়ও তার। মানুষের নারায়ণ যখন দুর্বল ও দীনরূপে তাঁর আবেদন জানান, তখন তা ক্ষমতাবানের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। হয়তো তখনো সে ভাবে কার্যক্ষেত্রে সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেও সহজেই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। ন্যায়ের বিধানের চেয়ে নিজের বিধিব্যবস্থা প্রভাব প্রতিপত্তির উপরই তার ভরসা বেশি।

ভারতবর্ষে উচ্চজাতি যখন নীচজাতির উপর প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসেছে, তখন সে নিজের শৃঙ্খলে নিজেকেই জড়িয়েছে। ইউরোপও এখন সেই ব্রাহ্মণ শাসিত ভারতকেই অনুসরণ করছে। এশিয়া আর আফ্রিকাকে সে তার শোষণের ন্যায্য ক্ষেত্র মনে করে। ইউরোপের সমস্যা আরো সহজ হয়ে যেত যদি অন্যান্য মহাদেশগুলিকে একেবারে জনহীন করে ফেলতে পারত। অথচ পরজাতি যখন রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তার নৈতিক দায়িত্ব রক্ষা করা ইউরোপের পক্ষে শক্ত। সেই সময়টাই বড়ো দুঃসময় যখন সে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে মনে করে যে, মনুষ্যজাতিরই কিছু উপকার করা হল বুঝি। আর মানুষের মধ্যে তফাৎ করে এই ভেবে যে, নিজের দেশের লোকের পক্ষে যা ভালো, অন্য দেশের লোকের পক্ষে তা ভালো নয়— কেননা ওরা তার চোখে হেয়। এভাবে সে ক্রমে ক্রমে নিজ আদর্শের প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। তাতে যে তার নৈতিক শক্তি খর্ব হচ্ছে, তা সে বুঝতেও পারছে না।

যাক গে, আমি আর নীতিবাক্যের জাল বুনব না। নিজেদের কথা বলতে গিয়ে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, দুর্বলতা জিনিসটা অত্যন্ত হেয়। যে দুর্বল সে নিজে তো ডোবেই, সবলের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিয়ে তারও পতনের কারণ হয়। প্রত্যেক জাতিরই শক্তির চর্চা করা উচিত। তবেই সে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে সহায়তা করতে পারে। ইংলণ্ডের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ এই, তারা আমাদের ঘৃণা করা সত্ত্বেও নিজেদের শাসনের অধিকার আমরা তাদের হাতে দিয়েছি। আমাদের প্রতি তাদের মনে কোনো দরদ নেই জেনেও নিজেদের বিচারের ভার তাদেরই উপর ছেড়ে দিয়েছি।

বর্তমান সংগ্রামের উদ্‌ভব কিসে থেকে, তা কি ইউরোপ কোনোদিন টের পাবে না? তার নিজ আদর্শই এতকাল পৃথিবীর মধ্যে তাকে একটি মহৎ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই আদর্শের প্রতিই তার মনে সংশয় জেগেছে। এই সন্দেহটাই যে সংগ্রামের মূল কারণ, তা কি সে বোঝে নি? যে তেল দিয়ে সে নিজের প্রদীপটি জেলেছিল, মনে হচ্ছে তা ফুরিয়ে গেছে। এখন সেই তেলের প্রতিও বোধ করি তার মনে একটা অবিশ্বাস জন্মেছে। ভাবছে, তার আলো জ্বালবার জন্যে কোনোদিনই এই তেলের প্রয়োজন ছিল না।

শিলাইদা। ১৩ জুলাই ১৯১৫

রেলের কামরায় বসে লেখা আগের চিঠিতে আপনাকে আমার জাপান যাবার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেম, সে চিঠি কি আপনি পেয়েছেন ?

ছোটো ছেলেরা যেমন করে তাদের কাগজের নৌকো ভাসায়, আমি ঠিক তেমনি করে আমার স্বপ্নগুলিকে ভাসিয়ে দিচ্ছি আমার চোখের সামনেকার এই সবুজে-সোনালিতে মেশানো নীলদিগন্তে। এই পৃথিবীটা আশ্চর্য রকমের সুন্দর, কিন্তু এর মধ্যে যে একটি বেদনা রয়েছে, সেটি না অনুভব করে কি পারি ? সে বেদনারও আবার একটি নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে— সে সৌন্দর্য মৃত্যুঞ্জয়ী। বিচিত্র বর্ণ ও গড়নের চমৎকার একটি শুক্তি যেন তার বুকের কাছে লুকিয়ে রেখেছে একটি ফোঁটা চোখের জল, আর তাই তাকে অমূল্য করে তুলেছে। দুঃখের মধ্য দিয়েই সব ঋণ শোধ করতে হবে, নইলে এই পৃথিবী আর এই জীবন যে ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

শিলাইদা। ২৩ জুলাই ১৯১৫

অনেক বছর পরে আমি আবার আমার প্রজাদের মধ্যে এসে পড়েছি। আমার আসাটা যে একান্ত দরকার ছিল, তা আমিও বুঝতে পারছি, ওরাও বুঝতে পেরেছে। এদের মধ্যে আমি যখন প্রথমজীবনে এসেছিলুম সে ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। সেই সময়ে প্রথম আমি জীবনের বাস্তব সংস্পর্শে এলুম। এ-সব সরল গ্রামবাসীদের মধ্যেই আমি মানুষের নিকট-স্পর্শ অনুভব করি। এদের কাছে এলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, তাই মানুষ যে মানুষের কত আপনার, তা বুঝতে পারি। যে মাটির উপর সর্বদা চলাফেরা করি, তার কথাও তো আমরা মনে রাখি নে, ঠিক সে-ভাবে এদের আমরা অনেক সময় ভুলেই থাকি।

কিন্তু এই মানুষগুলিই তো জগতের বড়ো অংশ জুড়ে আছে, এরাই তো সব সভ্যতাকে ধারণ করে রয়েছে। এরা নিজেরা কোনো মতে বেঁচে থেকেই খুশি। এরা এরকম স্বল্পে সন্তুষ্ট বলেই অন্যরা প্রমাণ করতে পারে যে, কোনো মতে বেঁচে থাকার চেয়ে মানুষের জীবন অনেকখানি বড়ো। নীচের স্তরের লোক এরা, এবং সংখ্যায় এরা অগণ্য। এরা জীবনের মান নিচু করে ধরে রেখেছে বলেই উপরতলার অল্পসংখ্যক লোকের জীবনের অগ্রগতি অবাধে চলেছে।

তারা হাজার বিঘা জমি চাষ করে দিচ্ছে বলেই এক বিঘার উপর একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় দাঁড়াতে পারছে। অথচ দীনতার এই অপমান বইছে এরা বাঁচার তাগিদেই। অসম্মানের তলে পড়ে থাকে নিতান্ত নিরুপায় বলেই।

আমাদের বড়ো আশা, এইখানটাতে বিজ্ঞান মানুষকে সাহায্য করবে। বিজ্ঞান নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবে। বাস্তব-জীবনের বঞ্চনার আঘাত তাকে আর পেতে হবে না। কঠোর জীবনসংগ্রামে রত বিশাল এই জনসমষ্টি যেমন অসীম শক্তির আধার, তেমনি সরলতার কি সকরুণ মহিমা এদের! যেখানে তারা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, সেখানে তারা সুন্দর। যেখানে তারা উদার, সংযত ও সহনশীল— সেখানে তারা মহৎ। আমাকে স্বীকার করতে হবে, এদের ফেলে শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমি এদের প্রতি অবহেলাই প্রকাশ করেছি। এখন এদের মধ্যে ফিরে এসেছি, এবার এদের জন্যে আরো সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার অবকাশ পাব— ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আশ্রমের জীবন আমাকে কেবল একটি শিক্ষকে পরিণত করে তুলছিল। তাতে আমি খুশি হই নি। কারণ সে জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে জনকল্যাণের সহায়ক হতে হবে। দূর হতে শুধু ভাবের আদানপ্রদান করলে চলবে না, জনগণের সঙ্গে বাস করতে হবে।

কলিকাতা। ২৯ জুলাই ১৯১৫

অসীম যখন আপনি একা— তখন তিনি অপূর্ণ। সীমার মধ্যেই পূর্ণের গৌরব— তাই তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন। আনন্দের পূর্ণতা রূপে রূপে প্রতিফলিত হতে চায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সফল হয় সৃষ্টি-তপস্যার বেদনায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, অসীম কেন সীমা মেনে আপনাকে প্রকাশ করেন ?— আনন্দ কেনই-বা এমন দুঃখের তাপে ভরা ? এ বিস্ময়ের কোনো উত্তর নেই। তবে মন যখন জাগে তখন খুশি হই— এই আগুন-ভরা আনন্দেই।

অসীমের এই রহস্যে যদি জীবন-মরণ তুফান তোলার খেলাই দেখি, তবে ভয়ে মরি। যখন নিখিলের অস্তিত্বে অপূর্ণতার আড়ালে পূর্ণতার পরিচয় পাই, তখন ধন্য হই। নইলে দুঃখীর প্রতি আমাদের প্রাণে করুণার ভাব জাগত কি ? অসম্পূর্ণতার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হত কি ?

আমি বলতে চাই ধরুন, টেলিগ্রাফের তারে জড়ানো মৃত বানরটি সেদিন যখন আপনি দেখলেন তখনো তার চারপাশের সৌন্দর্য অক্ষত মহিমায় বিরাজ করছে। সেই অসামঞ্জস্য আপনার চোখে ভারি নিষ্ঠুর ঠেকেছিল। এটাই হল বড়ো কথা। অসুন্দরই যদি চরম সত্য হত, তবে এই নিষ্করুণ দৃশ্য আপনাকে পীড়া দিত না। পূর্ণতার প্রতিসৃষ্টি আপনার ধ্যানে রয়েছে বলে আপনি বেদনা বোধ করলেন। চিরন্তনের পটে এই বিশ্বছবির আভাস আমাদের আশ্বাসে ভরে সব সন্দেহের নিরসন করে দেয়। সৃষ্টির পরিপূর্ণ আনন্দ যদি অপূর্ণের হাহাকার ছাপিয়ে না উঠত তবে এই দুঃখচেতনা হত নিতান্তই অসংগত।

তবে আর নৈরাশ্য কেন? অস্তিত্বের রহস্য এখনো আমরা উদ্‌ঘাটিত করতে পারি নি। কিন্তু জানি না কি প্রেম মৃত্যু হতে সত্য, দুঃখের অমৃতে পূর্ণ? এ জেনেই কি মেটে না আমাদের জিজ্ঞাসা?

শান্তিনিকেতন। ৭ অগস্ট ১৯১৫

আপনার চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ পেলুম। সব গভীর বিষয়েই আমার চিন্তাধারাগুলিকে চালিয়ে নেয় একটি মাত্র অনুভূতি। তা হল এই— সৃষ্টির মূলে যে সংখ্যাটি রয়েছে, তা এক নয়, দুই। দুটি বিপরীত শক্তির মিলনেই সম্ভূত হয় সকল নিগূঢ় জগৎ-ব্যাপার। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র যখন 'দুই'কে সংক্ষেপ করে 'এক'-এ নাবিয়ে আনে, তখন ভুল করে। কোনো কোনো দর্শন বলে— গতিটাই মায়া, সত্য যা তা স্থির। অন্যরা আবার বলে— আসলে সত্য গতিশীল ; সত্যকে স্থিররূপে প্রতিভাত করে মায়া।

সত্য কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অতীত। এ এক অনন্ত রহস্য। একাধারে স্থাবর এবং জঙ্গম, আদর্শ এবং বাস্তব, পূর্ণ ও অপূর্ণ উভয়ই।

যুদ্ধ ও শান্তি দুয়ের মিলনেই পূর্ণ সত্য। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ভাব আছে। উভয়ে উভয়কে আঘাত করে— যেমন পরস্পরকে আঘাত করে বীণার তার ও বীণকারের আঙুল। অথচ এই সংঘাত না হলে সংগীতের সৃষ্টি হয় না। এই সংঘাতটির অভাব ঘটলেই আসে শব্দহীন নিষ্ফলতা। আমরা শান্তি চাই, কি যুদ্ধ চাই— সেটা আসল কথা নয়। দুয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আনতে পারি কেমন করে— তাই ভাবনার বিষয়।

শক্তি বলে একটা জিনিস যতদিন রয়েছে ততদিন আমরা বলতে পারি নে

যে তার প্রয়োগ উচিত নয়। বরং বলতে পারি, এর অপপ্রয়োগ অনুচিত। প্রেমকে অস্বীকার করে শক্তিকেই যখন একমাত্র বলে জানি তখন এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাই থাকে বেশি। প্রেম ও শক্তি মিলিত না হলে উভয়েই ব্যর্থ হয়, তখন প্রেম হয় দুর্বলতারই নামান্তর, এবং শক্তি নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়। অবিচল শান্তি জড়ত্বের প্রতীক, আর শান্তিকে বিনষ্ট করে যে যুদ্ধ, তাকে আসুরিক বলা চলতে পারে।

পরস্পর হানাহানি করাই যে যুদ্ধের একমাত্র রূপ তা যেন আমরা একবারও মনে না করি। মানুষ মুখ্যতঃ নৈতিক জীব— তার অস্ত্রশস্ত্রও হবে নৈতিক।

শান্তিনিকেতন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৫

শরতের সূর্য নিঃশব্দে তার সোনার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে, পান্থপাখিদেরও আকাশভ্রমণের সময় হয়ে এল। সমুদ্রপারে যাবার জন্যে যে দুটি পাখি আমাদের নীড় ছেড়ে গেলেন— সে দুটি হলেন পিয়রসন ও আপনি। তা দেখে আমিও পাখা সংযত করতে পারছি নে। আমাদের চারপাশে সব কিছুরই ভার আছে। তা আমাদের আত্মায় প্রবেশ করে, আমরা জানতেও পারি নে। শেষে একদিন জানা-অজানা বোঝার ভারে চাপা পড়ি। জীবন যখন বস্তু স্তূপে ভারাক্রান্ত হয় তখন সচলতাই তার একমাত্র প্রতিষেধক।

আমার মন এখন একটি সছিদ্র নৌকোর মতো, তাতে জল ভরে রয়েছে। কোনোমতে চলছে মাত্র। এতটুকু দায়িত্বভার আর সে বইতে পারে না। আমি এবার বনে গিয়ে স্বাধীনতার কঠিন যোগ অভ্যেস করব। সব রকম লৌকিক ব্যাপারে, সব কিছু সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বে জোর দিয়ে 'না' বলতে চাই। দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাকে তপস্বীর জীবনই যাপন করতে হবে— তার বিরুদ্ধে এখন আমি যত আপত্তিই করি নে কেন। তবে কিন্তু আমি হব না তাপস— হব না, যদি না মেলে আমার মনের মতন মন।

রিহার্সেল চালিয়ে যাচ্ছি। ওটা আমার ভালো লাগে। কেননা ছোটো ছেলেদের সঙ্গ চিরকালই আমাকে আনন্দ দেয়।

ভূমিকা

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে যখন আমরা ফিজি থেকে ফিরলাম, কবির দূরপ্রাচ্যে যাবার বাসনা তখন আরো প্রবল হয়ে উঠল। সেই যাত্রায় তিনি পিয়রসন, শিল্পী মুকুল দে আর আমাকে তাঁর সঙ্গী করে নিলেন। তোসা-মারু জাহাজে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। বঙ্গোপসাগরে আমাদের জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছিল। সেবার অতি কষ্টে সেই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। চীনে আমরা খুব অল্পদিনই ছিলাম। কারণ জাপানের লোকেরা তাঁদের দেশে কবির আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠে-ছিলেন। তিনি এশিয়ার জন্য সম্মান নিয়ে এসেছেন বলে প্রথম দিকে তাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

জাপানে গিয়ে তিনি তার চার দিকে দেখলেন, কঠোর সাম্রাজ্যবাদ উদগ্র হয়ে উঠেছে। খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে তিনি পূর্বপশ্চিমের যথার্থ মিলনের তাঁর যে আদর্শ সেটি সবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ তখন কার্যকর হল না— কেননা যুদ্ধের সময়ে এরকম শান্তিকামী শিক্ষা খুব ক্ষতিকর হবে বলে জাপানীরা মনে করলেন। ভারতীয় কবিকে পরাজিত জাতির মুখপাত্র বলে তাঁদের ধারণা হল। সেজন্য যতখানি দ্রুত তাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল ততখানি তাড়াতাড়ি তা নিবে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রায় কোণ-ঠাসা করে রাখা হয়েছিল— যে উদ্দেশ্য নিয়ে দূরপ্রাচ্যে গেলেন, তা অপূর্ণই রয়ে গেল। এই সময়েই তিনি The Song of the Defeated কবিতাটি লেখেন, যার আরম্ভ—

> My Master bids me, while I stand
> at the wayside, to sing the song of defeat,
> For that is the bride whom He woos in secret.

আমার প্রভুর গোপন আহ্বানের সুরে সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি, কণ্ঠে নিয়েছি হারমানার গান। সেই বেদনার গানে তিনিও এই ধুলায় আপনি এসেছেন নেমে।

এবারকার গ্রীষ্মের সময়টা জাপানে বৃথাই নৈরাশ্যের মধ্যে কাটল। সেখানে সামরিকতার আদর্শ তখন সর্বোচ্চ চূড়ায় বিরাজ করছে। যুদ্ধের আগে কবির মন যেরূপ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল আবার সেই অবস্থা ফিরে এল। কবির সমস্ত অন্তরপ্রকৃতি সেই যুগের দুর্দম আক্রমণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল। Nationalism বইখানির প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এই বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার সময়ে জাপানেই লেখা হয়েছিল। ভাষণগুলি জাপানে দেওয়া হয় কিন্তু ইউরোপে সেগুলো আবার প্রকাশিত হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে রোমাঁ রোলাঁ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে সেগুলি আবার ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে পরে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি আবার একবার জাপানে যান তখন যুদ্ধের সময়কার এই বিরুদ্ধ মনোভাব অনেকটা দূর হয়ে গেছে। তখন তিনি চীনে এবং জাপানে এমন একদল লোক পেলেন যাঁরা তাঁর বিশ্বজনীন বাণী শোনার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন।

জাপান থেকে কবি আমেরিকায় গেলেন— সঙ্গে গেলেন পিয়রসন ও মুকুল দে। আমি আশ্রমে ফিরে এলাম। আমেরিকায় তাঁর দিনগুলি কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, সেখানে তাঁর অনেক নতুন বন্ধু হল। তাঁদের কাছে খুব সমাদরও তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর এই যাত্রাটি সবরকমেই সার্থক হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে চীনে জাপানে স্টীমারেই কয়েকদিন থেমে দেশে ফিরলেন।

তিনি আশ্রমে ফেরার অল্প পরেই আমাকে আবার ফিজি যেতে হল। সেবার যাবার কারণ ছিল, ভারতীয়দের চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে যে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হল, তা বিধিবদ্ধ করা। ১৯১৭ আর ১৯১৮ এই দুটি বছর কবি শান্তিনিকেতনেই স্থিরভাবে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ কিভাবে প্রশস্ত করবেন তারই পরিকল্পনা তখন তাঁর মনের মধ্যে চলছিল। এর পরের অধ্যায়গুলির মূল বিষয়ই হবে তাই। কারণ ক্রমশ এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

১৯১৮-র গোড়ার দিকে ফিজি থেকে ফিরে আমি আশ্রমে এলাম। তার পর থেকে আমি সর্বদা কবির সঙ্গেই থেকেছি— তাই আর চিঠিপত্র পাবার কারণ ঘটে নি। কিন্তু ইংলণ্ডে পিয়রসনের কাছে তিনি এই সময়ে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি দেখলে তাঁর এই সময়কার চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসম্পর্ক থাকে।

শ্রীনগর। কাশ্মীর
১২ অক্টোবর ১৯১৫

বলতে গেলে এখন আমি কাশ্মীরেই আছি। তবে এখনো তার তোরণ-পথে ভিতরে প্রবেশ করি নি। পৌর-সংবর্ধনা ও বন্ধুসুলভ অভিনন্দনের প্রেতলোকে অবস্থান করছি, স্বর্গ সম্মুখে দেখা যায়। নিরালায় এসে বসেছি আজ নিজের মুখোমুখি। আমার যে-আমি অনিমন্ত্রণেও তুচ্ছ মূল্যের অজস্র খেলনা জড়ো ক'রে আমার অন্তরমহল সাজাতে গোছাতে সর্বদা ব্যস্ত, তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি দ্বারের বাইরে— অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্যে। জানি জানি আমি ফুল হয়ে ফুটেছি, ঘাসে ঘাসে ছড়িয়েছি, জলের ধারায় বয়ে চলেছি, আকাশে তারার মালায় দুলেছি। কোন্ আদিকাল হতে মানুষের জীবনের স্রোতে আমিও ভেসেছি, এই বোধ ক্রমে আরো সহজ হয়ে আসছে।

সকালবেলা নৌকোর ছাদে বসে বসে যখন সম্মুখে দেখি দিগন্তপ্রসারিত গিরিশ্রেণীর নীলাভ রক্তবর্ণের মহিমা, প্রাতঃসূর্যের মুকুটে ঝলমল অপূর্ব শোভা, তখন মন বলে, অনন্ত আমার রূপ, আমিই আনন্দরূপম্। আমার এ দেহ তো নয় শুধু রক্তমাংসপুঞ্জ— অন্তহীন আনন্দে গড়া তার সকল অঙ্গ। যে অভ্যস্ত জীবনে আমরা আপনাকে করি একান্ত, বানাই আপন খণ্ডমাপের জগৎ, সেখানে আমাদের আত্মার উপবাসদশা ঘোচে না। সত্যকে যেদিন অন্তরে পাই, সত্য হওয়া ছাড়া তখন অন্য পথ নেই। আত্মরত অস্তিত্বের সীমানায় সত্যের অম্লানস্বরূপ ধরে না।

'এসো এসো, বাইরে বেরিয়ে এসো'— আত্মার এই ক্রন্দন অহরহ উঠছে। ডিমের কঠিন আবরণের মধ্যে পক্ষিশাবকের কাতরতাও এরই অনুরূপ। সত্য যেমন আমাদের স্বাধীনতা দেয়, স্বাধীনতাও আমাদের সত্যকেই দেয়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন, আমাদের জীবনকে 'অহং'-এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে, তবে সত্য আপনা থেকেই আবির্ভূত হবে।

পরিশেষে এতদিনে জানলেম, আমার মধ্যে এতকাল যে অধীরতা ছিল তা এরই জন্যে। অভ্যাসের জড়তা থেকে, 'অহং'-এর এই খণ্ডিত জগৎ থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার আগে প্রয়োজন নির্বিচল নির্জনতার।

কাশ্মীরে এসে প্রত্যক্ষ হল আপন আলোয়— কেন আমার এই ক্রন্দন, আমি কী চাই! দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলে তুচ্ছতার আবরণে আবার

হয়তো এই বোধটিকে হারিয়ে ফেলব। কিন্তু প্রতিদিনের চিন্তাধারা ও কাজ-কর্মের ফাঁকে এই যে মাঝে মাঝে সরে আসা, এতেই বন্ধনছিন্নতার শেষমুক্তিতে পৌছে দেয়— সেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমে। মুক্তির পথে প্রথম আসেন শান্তম্; যে শান্তপ্রসন্নতা আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে চিত্ত অধিকার করে তিনি সেই শান্তম্। তার পরের ধাপে শিবম্। তিনি হলেন পরম মঙ্গল, আত্মবিলোপের পরে প্রাণের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর জাগরণ। তার পরে অদ্বৈতম্; তিনিই অসীম প্রেম —সর্বজীবের ও সর্বব্যাপী পরমাত্মার একাত্ম অনুভূতি।

অবশ্য এই যে স্তরবিভাগ— এ শুধু মানবশাস্ত্রের বিচার। আলোর রশ্মির মতো অখণ্ডরূপেও এর আবির্ভাব হয়, আবার পাত্রভেদে ক্রমও বদল হয়। যেমন শিবম্ হয়তো শান্তমের আগে এলেন। কিন্তু এই কথাটি জানা যে চাই— শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমে পৌছবার জন্যই আমাদের প্রাণের সাধন আর তারই জন্য যত অশ্রান্ত সংগ্রাম।

শিলাইদা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

কলকাতা থেকে ফিরে আবার আমি নিজের মধ্যেই ফিরে এসেছি। প্রতিবারেই যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করি। শহরে ভিড়ের মধ্যে আমরা জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলি। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার সব কিছু আমাকে ক্লান্ত করে। তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্তরের যা সত্য তা সেখানে হারিয়ে যায়। আমাদের হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে প্রিয়তম আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তাঁর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অন্তর যেন জানে তার অতল অন্তঃস্তরেই লুকানো রয়েছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। হৃদয়ের কৃপণতা দূর করতে হলে এই অসংশয় বিশ্বাস চাই।

শিলাইদা। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

সত্যকে সহজে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমার যে কবিতাটি আছে, আপনি তার ইংরেজি অনুবাদটি জানেন। গত রাত্রে **Gardener** গ্রন্থটিতে অন্য কবিতার সঙ্গে এটি পড়তে গিয়ে এর অর্ধ-সমিল রূপ দেখে কেমন অদ্ভুত রকম সামঞ্জস্যহীন মনে হল। সব মেয়েরা যেখানে শাড়ি পরে এসেছে, সেখানে একটি মেয়ে যদি আঁটসাঁট পোশাকে যায়, তাকে যেমন বেখাপ্পা দেখায়, এও ঠিক তেমনি। তাই আমি এর ছন্দের ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলার কাজে লেগে গেছি, যদিও পুরোনো

ছন্দের বিরূপটি সম্পূর্ণ বর্জন করা খুবই কঠিন।

কবিতাটি হল—

মনেরে আজ কহ যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।…

শিলাইদা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

আপনি কোথায় আছেন? রিপোর্ট লেখার সাত-হাত জলের তলায় নাকি? সূর্যের আলোয় ভেসে উঠে আবার কোন্ দিন অস্তিত্বের খোলা হাওয়ায় পাল তুলে উড়ে বেড়াবেন?

এখানে আমার কাজ আছে বটে, কিন্তু সেটা একরকম খেলাই। তাতে অফিসের নামগন্ধও নেই। এতে আনন্দের সঙ্গে বিষাদও মেশানো আছে, অনেকটা ছবি-আঁকার মতো।

পিয়রসন অসুখ বাধিয়ে এসে এখন আবার আমার দলে ভিড়েছেন।

শান্তিনিকেতন। ৯ জুলাই ১৯১৭

ফিজি যাবার পরে এই প্রথমবার চিঠিতে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আপনার পিঠে ও পায়ে আঘাত পেয়েছেন জেনে আমরা খুবই উদ্‌বেগে আছি।

সন্তোষ মিত্রের অধিনায়কত্বে ছেলেরা কৃষিবিদ্যা খুব ভালো করে শিখছে। নেপালবাবুর রাস্তা তৈরির কাজ খুব আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হল, হঠাৎ একদিন সেটা থেমে গিয়ে চরম ব্যর্থতায় শেষ হল। আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে তেমন বিপর্যয় কিছু ঘটবে না। শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ আমাদের স্কুলের কাজে যোগ দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা সকলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমাদের পুরোনো ছাত্র গোরা কলকাতার ফুটবল মাঠের নামজাদা খেলোয়াড়। সে এখানে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে পেয়ে আমাদের স্কুল সমৃদ্ধ হবে।

এ বছরের বর্ষাকালটাও আমাদের অনেক ছাত্রের মতো ছুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করল না। তার আগেই নেমে পড়ল। আর সেই থেকেই তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে যাচ্ছে। আমি দোতলার জানালার ধারে

আমার কুঁড়েমির আসনটি দখল করে বসে আছি। তার এক দিকে আকাশে মেঘের শ্যামসমারোহ, অন্য দিকে ধরণীতে ঘন সবুজের দিগন্তজোড়া বিস্তার।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমার বেপরোয়া পৃথিবীতে জীবনের দিনগুলি দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছি। তখনো আমার যৌবনের স্বর্গোদ্যানে প্রয়োজনীয়তার পদক্ষেপ ঘটে নি। অস্তিত্বের নগ্ন আনন্দকে ভেঙেচুরে দিয়ে শৌখিন ভদ্র আবরণের আমদানি তখনো হয় নি। আমার মনের সেই হৃতস্বর্গে ফিরে যাবার প্রতীক্ষা করছি। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমাকে কারো প্রয়োজন আছে। আমি যে জানি আমার জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য একটিই— সেটি যুগে যুগে লোকে লোকে আমার সৃষ্টির একমাত্র অভিপ্রায়— তা হল আমি যা তার ধ্যানরূপ সম্পূর্ণ হতে দেওয়া।

আমি কি কবি নই? তা ছাড়া অন্য কিছু হবার আমার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি রাস্তার ধারের একটা সরাইখানার মতো— কবি-পথিককে তার অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে রাত কাটাতে দিচ্ছি। কিন্তু এই সরাইখানার মালিকের কাজ কিছুই লোভনীয় নয়। এখন সেই কাজে অবসর নেবার আমার সময় এসে গেছে। যাই বলুন আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। আমার মধ্যে অন্যান্য যে অসংখ্য বাসিন্দা আছে তাদের প্রতি এখন আমার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটতে বাধ্য।

শিলাইদা। ২০ জুলাই ১৯১৭

সঙ্গের চিঠিখানি পিয়রসনের। সে যে তার গোপন আবাস ছেড়ে বেরিয়েছে আর শরীরে মনে সুস্থ বোধ করছে, তাতেই আমি খুশি হয়েছি।

প্রায় বছর দেড়েক বিচ্ছেদের পর আমি আবার আমার পদ্মায় ফিরে এসে নতুন করে তাকে আমার প্রেম নিবেদন করছি। সে তার সদা-পরিবর্তনশীলতায় এখনো অপরিবর্তিত। যে-পাড়ে শিলাইদা রয়েছে, সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথে চলেছে। পাবনার প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, সে বেশিদিন একজায়গায় স্থির থাকতে পারে না।

আজকের দিনটি বড়ো সুন্দর। দু-এক পশলা বৃষ্টির পর রোদ উঠছে— যেন বালক একটি এইমাত্র সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠল— তার নগ্ন চিকন দেহে সোনার আলো ঝিলমিল করছে।

ভূমিকা

এ পর্ব থেকে শুরু করে পুস্তকের বাকি সব পত্রগুলির ক্রম অব্যাহতই ছিল। আমি তবু তাদের কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘ দিন ভ্রমণকালে তিনি এগুলি লিখেছিলেন। সেবার উইলিয়ম পিয়রসন তাঁর সহগামী হয়েছিলেন।

মহাযুদ্ধের ফলে দুঃখদুর্দশার অন্ধতমিস্রায় পৃথিবী ব্যাপ্ত হল। তা দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রমশ এই আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হল যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি শান্তির নীড় গড়তেই হবে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম-ভূখণ্ডের লোকেরা নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধ্যয়ন ও কর্মের ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে চলবে।

এশিয়ার ধর্মসংস্কৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে। এখানে তাদের মিলিত করে সংহতভাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করবেন— এই অভিলাষই সর্বপ্রথমে তাঁর মনে ছিল। কিন্তু তাঁর উদার দূরদৃষ্টি তো কোনো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমগ্র মানব সমাজই তাঁর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে এল। ১৯১৮ আর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অনেক জায়গায় তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে গিয়েছি। সে সময় ভারতবর্ষের চতুর্দিক তিনি পরিক্রমা করেছেন, খুঁজে বেরিয়েছেন কেবল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানুষের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার বীজ রোপণ করা ও তাতে ফল ফলানো চলে। এই ভ্রমণের সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর জীবনের প্রধান আদর্শটি কিভাবে ধীরে ধীরে মূর্ত হল। সমগ্র পৃথিবীর লোকের জন্য শান্তিনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে যাঁরাই শান্তি ও শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসবেন, তাঁরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানে সমান শ্রদ্ধার আসন পাবেন।

যে প্রতিষ্ঠান এভাবে সমগ্র বিশ্বকে আতিথ্য দেবে, তার নাম দিলেন তিনি বিশ্বভারতী। সংস্কৃতে বিশ্ব কথার মানে খুব উদার অর্থেই সমগ্র জগৎ। ভারতী কথার প্রতিশব্দ দেওয়া কঠিন, তবে তাতে বোঝায় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতি। সর্বজাতি ও সর্বধর্মের লোকের নিকট বিশ্বভারতী একটি জ্ঞানের আলয় হবে। এই

ভাবধারা কবি উপনিষদ থেকেই গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথাই তাঁর মনে ছিল। সে তপোবনের আতিথ্য প্রসারিত ছিল সর্বক্ষেত্রে, প্রেমে ও সৌভ্রাত্রে তা ছিল পরিপূর্ণ। 'The Religion of the Forest' তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ভাষণ। অন্য একটি ভাষণেরও উপসংহারে তিনি বলেন—"আমাদের পূর্বপুরুষগণ একটি শুচিশুভ্র আসন পেতে রেখেছিলেন। তাতে সখ্যে ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বভুবনের লোক সমবেত হোক— এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেখানে বিরোধের অবকাশ নেই। কেননা আমন্ত্রণটি শান্তম্ শিবম্ ও অদ্বৈতমেরই নামে। সব সংগ্রামের মর্মস্থলে বসে তিনি শান্ত, সব ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে প্রকাশিত তিনি শিব, সমস্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্যটি তাঁরই নামে প্রচারিত হয়েছিল—

আত্মবৎ সর্বভূতানি য পশ্যতি, স পশ্যতি।"

এই মহান্ আদর্শকে পূর্ণরূপ দেবার প্রয়োজনে ইউরোপ আর আমেরিকায় কবিকে আর একবার যেতে হল। তাঁর পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সমর্থন তিনি চেয়েছিলেন, আর আশ্রমে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোও দরকার ছিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তিনি যাত্রার উদ্‌যোগ করছেন, পাঞ্জাবে এমন সব ঘটনা ঘটল, যা কিছুকালের জন্য সব পিছিয়ে দিল। দাঙ্গা হল, তার প্রতিহিংসা নেওয়াও শেষ হল। অমৃতসরের খবর যখন এল, তখন আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতাতেই ছিলাম। সেই সময় তাঁর মনের যে গভীর বেদনা দেখেছি, তা কোনোদিনই ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, তাঁর চোখে ঘুম নেই। অবশেষে এই ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ নাইটহুড ত্যাগ করে তবে তিনি কিছুটা শান্ত হলেন। সে সময় মনে হচ্ছিল অমৃতসর তাঁর সব আশাভরসা নির্মূল করে দিয়েছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে মানবতার প্রতি অন্যায় আচরণে তাঁর কবিমন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটিকে চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব দেবার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে যখন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠল, তখন তিনিই তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই রকম কয়েক বছর আগে জাপানেও একবার তাঁকে পাহাড়ে খোদাই করার জন্য একটি ছোটো কবিতা লিখে দিতে বলা হয়েছিল। সেও ছিল একটি রক্তপাতের করুণ কাহিনী। তাকে স্মরণীয় করতে তিনি লিখলেন—

They hated and killed and men praised them. But God in shame hastened to hide its memory under the green grass

ওরা রোষে ভাইয়ের বুকে ছুরি হানল— তবু মানুষ সেই বীরত্বের জয়ধ্বনি করল। কিন্তু স্বজন বিধাতা সেই কলঙ্কস্মৃতি অন্তরাল করার জন্যে সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে ব্যগ্র হলেন।

এই বিষয়গুলির উল্লেখ করার কারণ, পরের চিঠিগুলো লেখার সময় তাঁর মনে এই চিন্তাধারাই কাজ করছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কবি যখন বহুদিন পরে আবার ইউরোপে যান, তখন তাঁর মনের স্থৈর্য ফিরে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের মনের স্বাভাবিক ঔদার্যে তাঁর যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল। তাঁর মগ্নচৈতন্যের অন্তঃস্তরে পাঞ্জাবের ঘটনার ক্ষতচিহ্ন তখনো লুপ্ত হয় নি। তাই বোম্বাই থেকে তাঁর স্টিমার যখন ছাড়ল, আমি গভীর উদ্‌বেগ নিয়ে আশ্রমে ফিরলাম।

লোহিত-সাগর। ২৪ মে ১৯২০

আজ সন্ধ্যায় সুয়েজে পৌছব। এখন থেকেই শীত করতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছি, আমরা সত্যিই পৃথিবীর একটি নূতন অংশে এসে পৌচেছি। এদেশ আমাদের দেশের দেবতার নয়, অন্য দেবতার শাসনের অধীনে। আমাদের হৃদয় এখানে আগন্তুকের সংকোচ বোধ করে। এমন-কি এখানকার আবহাওয়াও আমাদের খাপ খায় না। এখানকার লোকেরা চায়, আমরা তাদের হয়ে যুদ্ধ করব, আর তাদের কাঁচামাল সরবরাহ করব। এদের দ্বারপ্রান্তে আমাদের স্থান— উপরে লেখা থাকে— এশিয়ার অনধিকার প্রবেশ-কারীদের অভিযুক্ত করা হবে। এসব কথা মনে এলে আমার ভাবনাগুলিতে পর্যন্ত শীতের কাঁপন লাগে আর শান্তিনিকেতনের রৌদ্রস্নাত ঘরখানার জন্যে আমার মন কেমন করে।

আজ সোমবার। আগামী রবিবার সকালে আমাদের স্টিমার মার্সাই পৌছবে। কিন্তু এখন থেকেই আমি দেশে ফেরার দিন গুনছি। আমি জানি ফেরার পথে যখন দেখব এডেনের ন্যাড়া পাহাড়গুলি আঙুল তুলে ভারতের দিকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে, তখন আমার মনে আনন্দের শিহরণ লাগবে।

লণ্ডন। ১৭ জুন ১৯২০

সময়ের যেমন অভাব, তেমন অভাব চিনি আর মাখনের, আর এমন একটি নির্জন জায়গার যেখানে গুছিয়ে বসে একটু ভাবতে পারি, নিজেকে যাতে খুঁজে পাই।

আমার কাছ থেকে বড়ো চিঠি তো আশাই করবেন না— অন্য কোনো প্রত্যাশাও রাখবেন না। সামাজিক কর্তব্য ঝড়ের বেগে আমার উপর এসে পড়েছে। পশ্চিমপবনকে উপলক্ষ করে বন্দনাগান (Ode to West Wind) রচিত হয়েছিল, তেমনি এর উপরও একটা লেখা চলতে পারে। একটু সময় পেলে আমি চেষ্টা করতে রাজী আছি। প্রিয়ার গালের একটি তিলের বদলে কবি হাফেজ বোখারা সমরখন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য দিতে সম্মত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমার ওই কোণটুকুর বদলে আমি সমস্ত লণ্ডন শহরকে দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু লণ্ডনও যেমন আমার নয়, বোখারা সমরখন্দের সব ঐশ্বর্যও পারস্যের কবির নিজস্ব ছিল না। তাই আমাদের এই দানে খরচও

যেমন কিছু নেই, এতে ফলও কিছু লাভ হবে না।

কাল আমি অক্সফোর্ডে যাচ্ছি। তার পরে আরো নানান্ জায়গায় ঘুরব। বিশেষ করে আমারই সংবর্ধনায় একটি চায়ের নিমন্ত্রণ আছে, তাই এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। লণ্ডনের রাস্তায় গাড়িচাপা পড়া ভিন্ন আর কোনো অজুহাতেই সেখানে না গিয়ে পারি নে। সত্যি এটা ভেবে আমি অবাক হই, দিনে অন্ততঃপক্ষে চারবার গাড়িচাপা না পড়ে আমি ফিরি কি করে? কাগজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যদি এভাবে লিখেই চলি, তবে আমার সময়ের অভাব একথা কে বিশ্বাস করবে? তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে বিদায় জানাই।

লণ্ডন। ৮ জুলাই ১৯২০

রোজই ভাবি, আপনাকে একখানা চিঠি লিখব। কিন্তু কি করি, মজ্জাগত ঢিলেমি যে বাধা দেয়। দিনগুলি কাজের চাপে প্রায় কামানের গোলার মতো ভারী হয়েছে। বিশ্রাম যে মোটে পাই নে, তা বললে মিথ্যে বলা হয়। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, সম্পূর্ণ বাধাহীন এমন অবসর পাই নে, যেটা কাজে লাগাতে পারি। কাজেই সেই বিরতিগুলো বৃথাই নষ্ট হয়।

অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালো করে আপনি জানেন, কিছু না করার ভার কত দুর্বহ। অথচ বাইরে থেকে আমাকে দেখলে কোনো ক্ষতির চিহ্নমাত্রও চোখে পড়বে না, কেননা শরীর যে আমার অসম্ভব রকম ভালো।

পিয়রসন নিয়মিত ভাবে আপনাকে সব খবর সরবরাহ করে যাচ্ছে আশা করি। সে সঙ্গে থাকায় আমার যে কত সাহায্য হয়েছে বুঝতেই পারেন। আর দেখছি, কবির তত্ত্বাবধানের যে গুরুদায়িত্ব তা পালন করার ক্ষমতা ওর চমৎকার। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি। তা ছাড়া ওর স্বপ্নগুলোও অতি মনোহর। যেমন ধরুন, কাল রাতে ও স্বপ্ন দেখেছে, কুমড়োর মতো বড়ো বড়ো স্ট্রবেরী ফল কিনছে। ওর স্বপ্নের অদ্ভুত সজীবতাই এতে প্রমাণ হয়।

আমাদের স্কুলের ছুটি শেষ হয়েছে জানি। ছাত্ররা ফিরে এসেছে। ওদের গান ও হাসির শব্দে আশ্রম মুখর। বর্ষা নেমে সেই আনন্দ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আহা, দুখানা ডানা যদি আমি পেতুম! ছেলেদের সবাইকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবেন।

লণ্ডন। ১২ জুলাই ১৯২০

কাল আপনার এক বোন এসে যখন অন্য বোনটির ভালো থাকার খবর দিয়ে গেলেন, আমি কত যে আশ্বস্ত হলুম, আর তখন কী আনন্দ যে আমার হল, কি বলব! তাঁদের সম্বন্ধে উদ্‌বেগের কোনো কারণই নেই, একথা তিনি বারবার করে বলে গেলেন। আর জানালেন, তাঁরা তাঁদের নতুন বাড়িতে বেশ আরামেই আছেন। আমি তাঁকে আপনার সব খবরই দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা তাঁকে জোর দিয়ে বলতে পারলুম না যে শরীরের তেমন আপনি যত্ন করেন।

ইউরোপের নানা জায়গা থেকে ক্রমাগত আমার আমন্ত্রণ আসছে। জানি, সে সব জায়গায় গেলে তাঁরা আমায় বিপুল সংবর্ধনা জানাবেন। এখন আমি ক্লান্ত, দেশে ফেরার জন্যে মন আমার ব্যাকুল। আমার আকাশবিহারী ভাবনাগুলো সমুদ্রের এপারে যে তাদের নীড় খুঁজে পেয়েছে তা জানতে পেরে আমি মনে জোর পাচ্ছি। সুদূর পূর্বদেশের একটি কণ্ঠস্বর এদেশের অত্যধিক কর্মব্যস্ত মানুষদের কানে পৌঁছে তাদের মনে আন্তরিক ভালোবাসা ও আগ্রহ জাগিয়েছে এটা কি কম আনন্দের বিষয়?

ব্যাপারটি নিয়তই আমার মনে বিস্ময় জাগায়। সে যাই হোক, মানুষের চিন্তা ও কাজ যেখানে প্রাণের সাড়া পায়, সেখানে যে সে সত্যতর ও পূর্ণতর জীবন যাপন করে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। যখন আমি প্রতীচীতে থাকি, তখনই সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করি যে, সজীব মনের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। এখানে এসে আমার আকাশ আমার আলো আর বিশ্রাম আমি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এরা আমাকে চায়, আর প্রকাশও করে যে, আমাকে ওদের প্রয়োজন। তাই ওদের সংস্পর্শে এসে আমি নিজেকে মেলে ধরতে পারি।

কয়েক বছর পরে সম্ভবত আমার চিন্তাধারায় এদের আবেদন নাও থাকতে পারে। তখন আমার ব্যক্তিত্বের মূল্যও হয়তো এদের কাছে কমে যাবে। কিন্তু তাতে কিই বা আসে যায়? গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়। কিন্তু যতক্ষণ থাকে, তারাই সূর্যরশ্মিকে গাছের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় আর ততক্ষণ তাদের কণ্ঠে বনের বাণীই শোনা যায়।

তেমনি পাশ্চাত্যের মনুষ্যসমাজে আমার যে সংযোগ, তা প্রাণেরই যোগ।

সে যোগ ছিন্ন যখন হবে, তখনো এ সত্যটি টিকে থাকবে যে আমার জীবন কিছু আলোর রশ্মি সেখানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার চিৎসত্তায় পরিণত করে দিয়েছে। আমাদের জীবনের পরিধি ক্ষুদ্র, সুযোগও কম। তাই সেখানেই আমাদের চিন্তার বীজ বোনা চাই, যেখান থেকে তার দাবি আসে, আর যেখানে একদিন তার ফসল ফলবে।

লণ্ডন। ২২ জুলাই ১৯২০

পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষে যে ডায়ার বিতর্ক হল, তার ফলে ভারতের প্রতি এদেশের শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে। এতে বোঝা গেল, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রতি যতই অমানুষিক অত্যাচার করুন না কেন, এতে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মনে বিন্দু-মাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। আবার এসব সদস্যদের মধ্য থেকেই তো আমাদের শাসকরা নির্বাচিত হন।

সেই নৃশংস অত্যাচারের যে নির্লজ্জ সমর্থন তাদের সংবাদপত্রে ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে, তা বিসদৃশ ও বিগর্হিত। ইংরেজের অধীনে থাকার অবমাননাবোধ গত পঞ্চাশ বছর কি তারও আগের থেকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছে। কিন্তু তখনো একটা সান্ত্বনা এই ছিল যে, ইংরেজ জাতের ন্যায়পরতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। ধারণা ছিল তাদের চিত্ত ক্ষমতালোলুপতায় বিষাক্ত হয় নি কেন না সমগ্র জাতির মনুষ্যত্ব সেখানে পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষিত নয়।

অথচ সেই বিষ প্রকৃতই অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে, তা ব্রিটিশ জাতির মর্মস্থল আক্রমণ করেছে। তাদের মহত্তর প্রকৃতির কাছে আমাদের যে আবেদন— তার সাড়াও ক্রমশ কমতে থাকবে। আশা করি আমার দেশ-বাসীরা এতে নিরাশ না হয়ে, দৃঢ়তা ও অপরাজেয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের পূর্ণ শক্তি দেশের সেবায় লাগাবেন।

যা ঘটে গেছে তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের মুক্তি আমাদের নিজেদেরই হাতে। একটি জাতির মহত্ত্বের ভিত্তি কখনো দীনাত্মার অবজ্ঞার কৃপণ দানের উপর নির্ভর করে না। একের সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করাই যখন অপরের স্বার্থ, সেই স্বার্থসর্বস্ব লোকদের মুখাপেক্ষী হয়ে উন্নতির রাস্তা খোঁজে আপন

শক্তিতে আস্থাহীন ব্যক্তিরাই। দুঃখ ও আত্মত্যাগের কঠিন পথেই সার্থকতা আসে। যে-শক্তি দুঃখবিপদকে তুচ্ছ করে, সেই অমৃতময় শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। তারই জোরে আমরা সব শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো লাভ করি।

লণ্ডন। ১ অগস্ট ১৯২০

শহরের তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন থেকে অনেকটা দূরে এই বাড়িটির সবচেয়ে উপর-তলায় আমরা রয়েছি। জানালায় বসে কেনসিংটন্ গার্ডেনসের দিকে তাকিয়ে দূরে গাছের চূড়ায় যেমন কম্পমান পত্রপল্লব দেখতে পাই, সেই ভাবে লণ্ডনের রাস্তার কলরোলের স্পন্দনটি যেন দূর থেকে আমাকে ছুঁয়ে যায়। লণ্ডনের আবহাওয়ার দুর্যোগ দীর্ঘদিন ধরে যে কষ্ট দিয়েছে, এতদিনে যেন তার অবসান হল। ভোরের সূর্যের আলো যেন ঘুমভাঙা চোখের দুটি ভারী পাতা মেলে একটি ছোট্ট শিশুর মতো ছিন্ন মেঘের আড়াল থেকে মিষ্টি হেসে আমায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

সকাল প্রায় সাতটা বাজে। পিয়রসন আর আমাদের দলের অন্যান্য সকলে দরজা জানলার খড়খড়ি নামিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। লণ্ডনে আজই আমার শেষ দিন। তাতে আমার দুঃখ নেই। বরং আজই যদি বাড়ি ফিরতে পারতুম তো আরো ভালো হত। সেইদিন এখনো সুদূরে অস্পষ্ট, তাই বেদনাবোধ করছি।

লণ্ডন। ৪ অগস্ট ১৯২০

হঠাৎ কর্মসূচীর পরিবর্তনে আমরা এখনো লণ্ডনে আটকে রয়েছি। আগামী পরশুদিন আশা করছি, লণ্ডন ছাড়তে পারব। এ দিকে লোকে জানে যে, আমরা চলে গেছি। এখন আপনাদের লণ্ডনের আবহাওয়াও আর তেমন কষ্ট দিচ্ছে না, তাই এই শেষ দুটি দিন আমি খুব বিশ্রাম পেয়েছি। আপনি জানেন কিনা জানি নে, শেষ মুহূর্তে আমরা নরওয়ে যাবার সংকল্প ত্যাগ করেছি, যদিও টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনের অস্থিরতাই এর কারণ বলে আপনি ধরে নেবেন জানি।

পুনশ্চ— ডক্টর গেডেস সম্বন্ধে এইমাত্র এ কথা কটি লিখলুম— ভারতবর্ষে প্রথম যখন ডক্টর পেট্রিক গেডেসকে দেখি, তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়,

বরং বিজ্ঞানের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর যে পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। অধীত বিদ্যা তাঁর মানবত্বের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিকের যথার্থতার সঙ্গে আছে ঋষির দূরদৃষ্টি। সাংকেতিক ভাষায় তাঁর চিন্তাগুলিকে স্পষ্টরূপ দেবার কাজে তাঁর শিল্পীসুলভ দক্ষতা আছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে মানবসত্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করেছে, আর এমন কল্পনাশক্তি দিয়েছে যাতে পৃথিবীর যান্ত্রিক দিক নয় শুধু, প্রাণের অনন্তরহস্যও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্যারিস। ১৩ অগস্ট ১৯২০

আমি প্যারিসে এসেছি, এখানে থাকব বলে নয়, এর পরে কোথায় যাব তা স্থির করতে। আকাশে সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণ আর বাতাসে উল্লাসের দোলা লেগেছে। সুধীর রুদ্র স্টেশনে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন, আমাদের সব ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। আমাদের আমেরিকা যাবার আগে পিয়রসন কয়েক সপ্তাহের জন্যে ওর মায়ের কাছে গেছে। আমি তাই এখন সুধীরের হাতে, তিনি আমাকে যথেষ্ট যত্ন করছেন। প্যারিস এখন শূন্য। এখানে যাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই তাদের সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংলণ্ডে থাকার সময়টা বৃথাই নষ্ট হয়েছে। আপনাদের পার্লামেণ্টে পাঞ্জাবের ডায়ার-বিতর্ক, তা ছাড়াও ভারতের প্রতি এদের উদ্ধত ঘৃণা ও অবহেলার যত সব পরিচয় পেয়েছি, তাতে মনে অত্যন্ত বেদনা জেগেছে। ইংলণ্ড ছেড়ে আসতে পেরে যেন বেঁচেছি।

প্যারিসের কাছে। ২০ অগস্ট ১৯২০

ফ্রান্সের একটি অতি সুন্দর জায়গায় একটি চমৎকার গ্রামে এসেছি ও পেয়েছি সহজ মানুষের পরিচয়। এবার বুঝেছি, ভাবের জগতেই মানুষের প্রকৃত বাস— এই তার জীবনের চরম সত্য। সেখানে ধুলোর টানে তাকে নীচে নামতে হয় না। সে বুঝতে পারে যে, তার মধ্যে আছে আত্মিক শক্তি। ভারতবর্ষে আমরা সংকীর্ণ স্বার্থের খাঁচায় বাস করি। আমাদের যে ওড়বার ডানা আছে তা আমরা বিশ্বাসই করি নে, কেননা আমাদের ওড়ার আকাশ হারিয়ে গেছে। আমরা কিচিরমিচির করি, লাফাই আর ক্ষুদ্র জায়গায় বদ্ধ

থেকে একে অন্যকে ঠোকরাই। আমাদের দায়িত্ব যেখানে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র, আমাদের জীবনের ক্ষেত্র অতি সীমিত, সেখানে চরিত্রে ও চিত্তে মহত্ত্ব আনা সত্যিই কঠিন। আমাদের চারি দিকে যে সংকীর্ণতার প্রাচীর রয়েছে তার ভাঙা ফাটলের মধ্য দিয়ে জীবনবৃক্ষের শুষ্কপ্রায় ডালগুলো বাইরের আলোহাওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে সজীব হোক আর এই তরুর মূল মরুবালুকার স্তর ভেদ করে অফুরন্ত জলের ঝরনায় মিশে যাক। এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, চারি দিকের বেষ্টনী যত সংকীর্ণই হোক না কেন, আত্মার মুক্তি পেতে হবে। অদৃষ্টের নিরন্তর পরিহাসকে অবজ্ঞা করতে পারলে তবেই মনুষ্যত্বের ধর্ম রক্ষা পাবে।

ভারতের এই তপস্যার প্রতীক হল শান্তিনিকেতন। আমরা ওখানে থেকেও অনেক সময় আমাদের লক্ষ্য যে কত মহৎ তা ভুলে যাই। তার কারণ ভারতের জনগণ বিস্মৃতি ও তুচ্ছতার অন্ধকারে অবলুপ্ত। আমাদের চার দিকে এমন আলো, এমন পরিপ্রেক্ষণী নেই যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের আত্মা মহৎ। তাই আমরা এভাবে চলি, যেন চিরকাল ক্ষুদ্র হয়ে থাকাই আমাদের নিয়তি।

আর্দেনিস। ২১ অগস্ট ১৯২০

ফ্রান্সের একটি সুরম্য জায়গায় রয়েছি। কিন্তু কাপড়ভর্তি সব তোরঙ্গ হারিয়ে এসে কে কবে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছে বলুন। চারদিককার গাছগুলোর মতো দর্জির শরণ না নিয়েও যদি ভব্যতা রক্ষা হত, তবে তাদের সঙ্গে পুরোপুরি আত্মীয়তা বোধ করতে কিছুমাত্র বাধা ছিল না। পোল্যাণ্ডে কি আয়র্ল্যাণ্ডে কি মেসোপটেমিয়ায় কি ঘটছে, তার কোনো গুরুত্ব এখন আর আমাদের কাছে নেই। এখন সবচেয়ে দরকারী কথা হল, প্যারিস থেকে আসার পথে মালগাড়ি থেকে আমাদের দলের সব তোরঙ্গগুলি কোথায় খোয়া গেছে।

তাই নবোদিত ও অস্তগামী সূর্যের আর তারাভরা নিঝুম রাতের যতই মহিমাগান সমুদ্র করুক, প্রাচীন ড্রুইডদের মতো আমার চারপাশের বনস্পতিরা যতই পাহাড়ের উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আকাশে দু' বাহু মেলে আদিম প্রাণের জয়গান করুক, আমাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরে গিয়ে ভদ্রতা রক্ষার

জন্যে দর্জি ও ধোবার হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এইমাত্র আপনার চিঠি পেয়ে কিছুক্ষণ মনে হল আশ্রমমাতা আমাকে সস্নেহে বুকে চেপে ধরেছেন। তাঁর কাছ থেকে এই অনেকদিনের বিচ্ছেদে আমার মন যে কত ভারাক্রান্ত হয়, আপনাকে কি বলব! তবুও জানি, সমগ্র বিশ্ব-বাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি সত্যে ও প্রেমে বেড়ে না ওঠে, তবে আশ্রমের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করবে না।

প্যারিস। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০

আপনার চিঠি পেলে আমার মনের চারপাশে শান্তিনিকেতনের পরিবেশটি তার বর্ণে, শব্দে, গতিতে ভরপুর হয়ে জেগে ওঠে। সেখানকার ছেলেদের প্রতি আমার ভালোবাসা নীড়-সন্ধানী বিহঙ্গের মতো সমুদ্র অতিক্রম করে আশ্রমের দিকে পাড়ি দেয়। আপনার চিঠিগুলো আমার কাছে মহামূল্যবান সম্পদের মতো— এর প্রতিদানে যে কিছু দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নেই। কেননা আমার মন এখন পশ্চিমের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে, তাই তার যা কিছু দেবার, স্বভাবতই সে দিকে যাচ্ছে। আপাতত আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রে আমার যোগা-যোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে, গ্রীষ্মের ক্ষীণস্রোত কোপাই নদীটিরই মতো। তবে আমি জানি, শান্তিনিকেতনের মূল যদি আমি পশ্চিমের মাটিতেও প্রেরণ করতে না পারি, তবে সে তার পত্রপুষ্পের সম্ভার পূর্ণ করতে পারবে না। নিষ্ঠুর অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে যদি আমরা ইউরোপকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে চাই, তাতে আমরা নিজেদেরই অপমান করি। আমরা কলহও করব না, প্রতিশোধও নেব না— ক্ষুদ্রতার বদলে কিছুতেই ক্ষুদ্র আচরণ করব না। দেশের সেবায় আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের চিন্তার ও ভাবের সম্পদ উৎসর্গ করার এই তো সময়। ‘শিবম্ ও অদ্বৈতমের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি, সেই কারণে আমরা দুঃখভোগ করছি। শাস্তি যা পেলুম, তার প্রতিবাদ করতেই আমাদের সব শক্তি ব্যয় করে ফেলছি। নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্যে কিছুই তো বাকি রাখছি না। নিজের কর্তব্য সমাধা হলে তবেই অন্যের স্খলনের অপরাধে তিরস্কারের অধিকার জন্মে— তার আগে নয়।

পাঞ্জাবের ব্যাপার এবার আমাদের ভোলা চাই। কিন্তু একথা যেন না ভুলি যে নিজেদের ঘরের সংস্কার না করলে উপর্যুপরি এ ধরণের বিপর্যয়ে অপদস্থ

হবেই হবে। সমুদ্রতরঙ্গের প্রতি লক্ষ না করে নিজের নৌকো যথেষ্ট মজবুত কিনা, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের দেশের রাজনীতি বড়োই নিম্নস্তরের। তার দুটি পায়ের মধ্যে একটি শীর্ণ, নড়বড়ে ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। অন্যটি তাকে টেনে নিয়ে বেড়াবে, এই অপেক্ষায় আছে। এই পা দুটির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই আমাদের রাজনীতিও লাফিয়ে খুঁড়িয়ে এমন-ভাবে চলে যা হাস্যকর। এই অসম সহযোগীর কখনো অনুনয়, কখনো-বা ক্রোধের অভিব্যক্তি আমাদের চরম দুর্বলতারই পরিচয়। অসহযোগ যদি স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদ হিসেবে আসে, তবে তা হবে মহীয়ান, কিন্তু সেটা যদি ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র হয়, তবে তা পরিত্যাগ করাই আমাদের কর্তব্য।

ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ সহযোগ স্থাপিত হওয়া চাই। তবেই অসহযোগ স্বতঃস্ফূর্ত হবে। ফল যখন সম্পূর্ণ পেকে ওঠে, সেই সত্যের চরিতার্থতার মধ্য দিয়েই তার স্বাধীনতা আসে।

শত শতাব্দী ধরে সামাজিক জীবনের যেসব বাধা আমাদের আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার অপসারণে দেশমাতা ব্যাকুল হয়ে তাঁর সন্তানদের সহযোগ কামনা করছেন। দেশকে যে নিজের বলে দাবি করব, তার আগে চাই প্রেমে আত্মবিসর্জন, আর সেটা পেতে হলে পূর্ণ সহযোগ প্রয়োজন। তখনই অন্যদের এই কথাটি বলার অধিকার আমাদের জন্মাবে যে, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে তোমাদের মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই দুরূহ কাজে চাই ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে তার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি এবং সারা পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই কেবল জনসাধারণের মনে তা সঞ্চার করতে পারেন।

আমাদের দেশের রাজনীতির জীর্ণ তরণীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের অভিঘাত সহ্য করতে হয়। তারই উপর ভর করে এই অমূল্য শক্তির অপচয় হবে, এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কেননা আমাদের জীবনের আদর্শ হল আত্মিক শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করে মুমূর্ষুর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা। বাইরের প্রতিকুল অবস্থায় বাহ্যিক জিনিসের বিরাট অপচয় তো আছেই, কিন্তু এ ধরণের আত্মিক অপচয় বড়োই মর্মবিদারক। তা ছাড়া নৈতিক বিচারেও এ অভিযানটি অনুচিত। সাত্ত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিতে পরিণত করা খুবই গর্হিত।

হল্যাণ্ডে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। সেখান থেকে বক্তৃতা দেবার অনেক আহ্বান এসেছে। কিন্তু আমি এখনো তৈরি হতে পারি নি। এখন আমি লেখায় ব্যস্ত— বিষয়টি হচ্ছে পূর্বপশ্চিমের মিলন। প্যারিস ছাড়ার আগে সেটা শেষ হবে আশা করি।

প্যারিস। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০

জার্মানী থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাবার সংকল্প করেছিলেম। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া আজকাল এমন কঠিন হয়ে পড়েছে, সেই বাসনা তাই আমায় ত্যাগ করতেই হল। বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে জার্মানী যাবার পথে বিস্তর বাধা। হল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে অন্তত হামবুর্গ ঘুরে আসার চেষ্টা করব। জার্মানীকে সহানুভূতি জানানো দরকার— আমার সে সুযোগ হবে আশা করি।

কয়েকদিন আগে মোটরে Rheims ও ফ্রান্সের আরো কয়েকটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ আমাকে দেখানো হয়েছিল। সে অতি করুণ বেদনাদায়ক দৃশ্য। এ জায়গাগুলোকে নতুন করে গড়ে তুলতে অনেক সময় ও প্রভূত প্রয়াসের দরকার। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়, যখন মানুষের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক তার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে মিলনমূলক পূর্ণতা থেকে বিচ্যুত হয় এবং ধ্বংসের কাজে ভয়াবহ আনন্দ পায়।

এ-সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ বুঝতে পারে ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে কী ভাবে সমাজে বশে রাখা হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বায়িত করে নব নব সৌন্দর্য-প্রকাশের কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা হয়েছে। তখন আমরা জানতে পারি পাপগ্রহ উল্কার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, সেগুলি পূর্ণেরই ভগ্ন অংশ। মহৎ আদর্শের মতো একটি বিরাট গ্রহের আকর্ষণ পেলে তবে সৃষ্টির মধ্যে শান্তভাবে মিলতে পারে।

কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শেরই সেই আকর্ষণের ক্ষমতা আছে যার জোরে এই বিদ্রোহী খণ্ডগুলিকে পূর্ণতার রূপ দিতে পারে। এই অশুভ শক্তিগুলিকে দানবীয় বলা চলে। তাদের কল্যাণে পরিণত করতে পারে কেবল সৃজনের সংযত তানলয়। আমাদের শিব হলেন প্রলয়ংকর শক্তির দেবতা। তাঁর অনুচরগুলি মৃত্যুরই দূত— অথচ তিনিই আবার শিবম্, পরম মঙ্গল। পাপকে

অস্বীকার করা নয়, তার উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করাই হল পুণ্য। সৃষ্টির সকল বিরোধবৈষম্যের মধ্যে সুষম ছন্দ আসে শিবশংকরের পরম বিস্ময়কর নৃত্যের বশেই।

সত্যিকার শিক্ষা বলতে বুঝি এই জাদুশক্তির প্রেরণা— সৃষ্টিকারের মায়া-মন্ত্রের স্পর্শ। শান্তি বা শৃঙ্খলা বাইরে থেকে যা চাপানো হয়, তা নেতিবাচক। শিবই হলেন শিক্ষাগুরু, ধ্বংসাত্মকতাকে ধ্বংস করার, বিষ পান করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে। ফ্রান্সের অন্তরে যদি শিব বিরাজিত থাকেন, তবেই সে অশুভকে শুভ করে তুলতে পারবে তার ক্ষমা করার শক্তিতে। সেই ক্ষমাই তাকে অমর করবে, যে আঘাত তাকে হানা হয়েছে, তার থেকে রক্ষা করবে।

এ পথ কঠিন জানি। তবু এ মুক্তির একমাত্র পথ। সৃষ্টিমূলক আদর্শই কেবল ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এ আধ্যাত্মিক আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, ক্ষমার আদর্শ। ভগবৎ প্রেমের ধারা নিরন্তর ঝরছে বলেই তো সৃষ্টি এমন মধুর।

মৃত্যুর অন্তরে আছে জীবনের অবিরাম আনন্দলীলা। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা কি তা জানি নে? এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের বাঁচার কী অধিকার আছে? তাকে কি আমরা দগ্ধ করি নে, ধ্বংস করি নে? তবু বিশ্ব-রচয়িতার এই সৃজনীশক্তিই কি তাঁর সৃষ্টিতে আমাদের নিজস্ব স্থান দেয় নি? অন্য মানুষকে বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন সে কথা না ভুলি।

প্যারিস। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০

দেখছি অসহযোগ নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা উগ্রভাবে মেতে উঠেছে। এই আন্দোলনও বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের মতো একটা কিছু হয়ে দাঁড়াবে। এরকম ভাবের আবেগকে যদি ভারতব্যাপী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কাজেই বিশেষ করে লাগানো যেত তবে কত ভালো হত!

মহাত্মা গান্ধীই এ কাজের সত্যিকারের অধিনায়ক হোন। বিশেষভাবে দেশসেবার আহ্বান, আত্মত্যাগের আবেদন তিনি জানান। তারই প্লাবনে প্রেম ও সঙ্গে সৃজনভাব লোকের মনে উচ্ছ্বসিত হবে। প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগের আদেশ যদি তিনি দেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথামত কাজ করতে রাজী আছি। ক্রোধের আগুন জ্বেলে

দিয়ে তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমার পৌরুষের ক্ষয় কিছুতেই করব না।

মাতৃভূমির প্রতি এই অন্যায় আচরণ ও অপমানের বর্ষণে আমার মনে যে ক্ষোভ আসে না তা তো নয়। কিন্তু আমার সেই ক্রোধ যেন প্রেমের অগ্নি হয়ে জ্বলে। তার থেকে যে পূজার প্রদীপ জ্বলবে, তা আমি স্বদেশের দেবতার মধ্য দিয়ে আমার জীবনদেবতাকে উৎসর্গ করব।

নৈতিক ক্ষোভের পূতশক্তিকে দেশময় ক্রোধের আগুন জ্বালাবার কাজে যদি লাগাই, তবে তা হবে মনুষ্যত্বের অবমাননা। এ যেন যজ্ঞের বেদীর আগুন নিয়ে ঘর জ্বালাতে যাবার মতো কাজ।

এণ্টওয়ার্প। ৩ অক্টোবর ১৯২০

হল্যাণ্ডে প্রায় দু সপ্তাহ কাটালেম। আমার প্রতি এ দুটি সপ্তাহের বদান্যতা প্রচুর। একটি বিষয় নিশ্চিত জানুন যে, এই ছোটো দেশটির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের হৃদয়ের যোগাযোগের পথ খোলা হয়েছে। সেই পথটিকে প্রশস্ত করে উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পদের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। এবারকার এই যাত্রার ফলে ইউরোপ আমাদের নিকটতর হয়েছে। আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধুরা যদি বুঝতেন যে কথাটা কত সত্য, এর মূল্য কত! সংশয়লেশহীন দৃষ্টিতে আমি অনুভব করি আজ যে শান্তিনিকেতন এই বিরাট বিশ্বেরই অঙ্গ, আর সেই মহাসৌভাগ্য উপযুক্ত মর্যাদায় আমাদের স্বীকার করতে হবে।

ভারতবাসী আমরা প্রাত্যহিক ছোটোখাটো বিরুদ্ধতার মধ্যেই আমাদের সজ্ঞান মনকে আবদ্ধ রাখি, কেননা সেগুলি ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পথও শেষ লক্ষ্য এ সজ্ঞান মনের মুক্তির উপরেই নির্ভর করে। তাই রাজনীতির এই ধুলোর ঘূর্ণিহাওয়া থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করাই চাই।

আমি গতকাল সকালে এণ্টওয়ার্পে এসেছি। সেখান থেকেই লিখছি। এবার ব্রাসেলসের জন্যে তৈরি হব, সেখানেও আমন্ত্রণ আছে। তার পরে প্যারিসে ফিরব।

লণ্ডন। ১৮ অক্টোবর ১৯২০

পরিপ্রেক্ষণীর পরিবর্তনে আমাদের সত্য দৃষ্টিরও পার্থক্য হয়। রাজনৈতিক ঝড়ে যে মানসিক মূঢ়তা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করেছে, তার ফলেই ভারতের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কোনো কোনো রাজনীতিবিদ সমস্যার দ্রুত সমাধানের চিন্তা করেন, এবং কাজে নামতেও দেরি করেন না। তাঁদের কাজ হল দ্রুত সাফল্য লাভের জন্যে ভ্রান্ত পথেই এগিয়ে যাওয়া— সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-রূপ ভারী ভারী ট্যাঙ্ক। কিন্তু সর্বমানবের সর্বকালের প্রয়োজনও তো কিছু কিছু আছে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যেও সেই সিদ্ধির পথ খুঁজতে হয়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে অনেক তফাৎ। সাংবাদিকতারও প্রয়োজন আছে, আর অসংখ্য লোকে তার সেবাও করে। কিন্তু তা যদি সাহিত্যের আলোককে চেপে রাখতে চায় তবে তা নবেম্বর মাসের লণ্ডনের কুয়াসারই সৃষ্টি করবে যার ফলে সূর্যালোক গ্যাসের আলো হয়ে দাঁড়াবে।

চিরন্তন মানবের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করাই হল শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। 'অসতো মা সদ্গময়' এই প্রার্থনা যুগে যুগে ধ্বনিত হবে। এমন-কি যখন সব দেশের ভৌগোলিক সত্তা বা নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখনো এই প্রার্থনা টিকে থাকবে। এখন যদি আমি সাময়িক ক্ষোভের বশবর্তী হই বা জনতার দাবি মেনে নিই, তবে তাতে আমার নিয়ন্তা যিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়।

আমার প্রভু এই যে মূলধন আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, তা শোষণের জন্য আমার দেশবাসীরা উচ্চরবে আবেদন জানাবে জানি। কারণ তাদের কাছে বর্তমানের প্রয়োজনটিই সর্বাপেক্ষা প্রধান। যতই যা হোক, আপনি জানেন, আমার গুরুদায়িত্ব আমাকে বহন করতেই হবে। অনন্তের বুকের মধ্যে যে চিরশান্তি বিরাজ করছে, যে কোনো অবস্থায় শান্তিনিকেতন সেই ধনকেই লালন করবে। ভিক্ষায় বা কাড়াকাড়িতে আমরা সামান্যই লাভ করি। কিন্তু আপন সত্যে নিষ্ঠা থাকলে, যা চাই তার চেয়েও বেশি পাই। আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, তা পেয়েছি কেবল আমার যা সত্য তার স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিষ্কাম প্রকাশের মধ্য দিয়েই। ফলের কামনায় কখনো সে প্রয়াস করি নি— সে ফলের মহিমার যত ব্যঞ্জনাই থাক।

ষষ্ঠ পর্ব

ভূমিকা

এই অধ্যায়ের চিঠিতে কবির আমেরিকা ভ্রমণের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেবার তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি সকলের সহানুভূতি ও আনুকুল্য আকর্ষণ করা। ১৯১৩ ও ১৯১৬তে আমেরিকা গিয়ে তাঁর আশা হয়েছিল, জাতীয়তার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ইউরোপীয় জাতির চেয়ে নতুন পৃথিবীর তরুণ চিত্তের কাছে তিনি অধিক সাড়া পাবেন।

আমেরিকা থেকে যে চিঠিগুলো কবি আমাকে লিখেছেন, তার পটভূমি রচনা করেছে তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শ। তাই পশ্চিমদেশে যাবার আগে ভারত ভ্রমণের সময় এ বিষয়ে তিনি নিজে যা বলেছেন, তাকেই এ অধ্যায়ের ভূমিকা হিসেবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁর ভাষণের কিছু অংশ পড়লে মনে হয় কবিকে ঠিক ভাবে বোঝার সুবিধে হবে।

…সমস্ত কৃত্রিম বেড়া ভেঙে পড়ার যুগ এসেছে। যা বিশ্বজনীন, তাই কেবল বেঁচে থাকবে। বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয় যে খোঁজে, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শিশুর খেলাঘর নিভৃতে থাকা ভালো, তার দোলা নিরাপদ স্থানেই রাখা দরকার। কিন্তু সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও যদি সেই নিভৃত বেষ্টনে তাকে রাখা হয়, তবে সে অকর্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়ে ওঠে।

চীন, মিশর, গ্রীস ও রোম তাদের সভ্যতাকে একসময়ে সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে লালন করেছে। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে যে বিশ্বজনীনতা আছে, তা তখন স্বীয় বৈশিষ্ট্যের নিরাপদ আশ্রয়ে ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেছে। শুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হয়েছে, ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজ বর্ধিত হওয়া চাই। তার মূল্যের ঠিকমত যাচাই হবে, বিশ্বের হাটে দরনির্ধারণ হলে তবেই।

আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই— যেখানে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও তুলনা হবে, যেখানে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করা যাবে। তার জন্যে ভারতের আয়ত্ত বিদ্যাকে তার

সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করে জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যাবত্তার সম্যক ধারণা হলে তার সঙ্গে বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হতে পারে।

শুচিতার একটি কাল্পনিক অন্তরাল রেখে যতই আমরা দুর্গকোণে সরি না কেন, সেই কোণটুকুর চেয়ে বিপুল বিশ্বের শক্তি অনেক বেশি। তাই আমাদের সেই নিভৃত নিরাপদ ক্ষুদ্র প্রান্তের চারি দিকের প্রাচীর একদিন নিশ্চিতই লয় পেয়ে যাবে।

পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সমপর্যায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমরা যতদিন আয়ত্ত করতে না পারি বা তাদের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতায়ও সক্ষম না হই, ততদিন নিজ দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির সংযোগ সাধনেই ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। সেরূপ একটি কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে যখন পশ্চিমের দিকে তাকাব, তখন আমরা আর ভীত বা বিভ্রান্ত হব না, বরং জ্ঞানের স্বাধীন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্য সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মত উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারব। সমগ্র জগৎ সসম্মানে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করবে।

সব বড়ো বড়ো দেশেই জ্ঞানচর্চার সুসংহত কেন্দ্র থাকে। সেখানে বিদ্যার স্তরের একটি বিশিষ্ট মান রক্ষা করা হয়। স্বভাবত সেই অনুকূল পরিমণ্ডলটির জন্যই সেখানে লোক আকৃষ্ট হয়। এভাবে দেশের একটি বিশেষ স্থানে তারা জ্ঞানযজ্ঞের বেদী নির্মাণ করে, যেখান থেকে জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক চতুর্দিক উদ্ভাসিত করবে।

গ্রীসের এথেন্সে সেরূপ একটি কেন্দ্র ছিল, ইতালিতে ছিল রোমে, আর আজকাল ফ্রান্সে সেরূপ একটি কেন্দ্র হয়েছে প্যারিসে। বারাণসীতে চিরকালই সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্র ছিল, আজও তা আছে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির সকল উপাদান তো সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে নেই। জ্ঞানসম্প্রসারণের প্রয়োজনেই ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি এই যুগকে আহ্বান করছে। আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চার বড়ো বড়ো কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। সেখানে তার যুগ যুগ সঞ্চিত সম্বোধি কর্ম-উদ্ভাবনায় নিয়োজিত হবে, পূর্বপশ্চিমের চিন্তার ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার এক হয়ে মিলে যাবে। বিক্ষিপ্ত শক্তির বিশৃঙ্খলা দূর করে ও বিদেশী শিক্ষার জড়ভারমুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ তার চিত্তকে জানবার ও পৃথিবীকে তা জানাবার সুযোগ খুঁজছে।

এখানেই স্পষ্ট বলে রাখি কেবলমাত্র বিদেশী বলে কোনো সংস্কৃতিতে আমার অনাস্থা নেই। বরং আমি মনে করি, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রাখার জন্যে

ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘাত প্রয়োজন। সকলেই জানেন, খ্রীস্টধর্মের যা মূলভাব, তার অনেকখানিই ইউরোপের সুপ্রাচীন ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতির বিরোধী। এমন-কি বলতে গেলে তা ইউরোপীয় প্রকৃতিরই প্রতিকূল। তবু এই বিজাতীয় ভাবের আন্দোলন, সতত ইউরোপের মননধারার বিপরীত দিকে গতিশীল হয়ে শুধু এই প্রতিকূলতার বেগেই তার সভ্যতা, শক্তি ও সম্পদকে বাড়িয়ে তুলেছে। এমন-কি ইউরোপের বহু ভাষা বিদেশের চিন্তাধারার, বিশেষ করে প্রাচ্যের অনুভূতির সংস্পর্শে এসেই নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়েছিল। ভারতেও তাই ঘটছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি শুধু তার জ্ঞানের সম্ভার নিয়ে নয়, তার প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। এখনো আমাদের মধ্যে সে সবের স্বাঙ্গীকরণ সম্পূর্ণ হয় নি এবং তারই ফলে নানাবিধ বিকৃতি এসেছে সে ঠিক, তবু অভ্যাসের জড়তা ঘুচিয়ে দিয়ে সেই তো আমাদের সামনে বুদ্ধির জগৎকে ক্রমশ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। আমাদের মননধারার বিরোধী বলেই এত সহজে ধাক্কা দিয়ে আমাদের সচকিত জাগরণ এনেছে।

আমার কেবল এই কৃত্রিম ব্যবস্থাতেই আপত্তি যার ফলে বিদেশী শিক্ষা আমাদের জাতীয় চিত্তের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করে ফেলেছে। এতে নতুন সত্যের সংযোগে নবতর চিন্তাশক্তি উন্মেষের পথে অন্তরায় হয়। আমাদের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে শক্তিমান করার জন্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বাধা দেওয়া নয়, বরং অন্তরের সঙ্গে তাকে বরণ করে নিতে হবে এ কথা মানি। তবে তাকে বোঝা হিসেবে বয়ে বেড়ানো নয় আমাদের মনের খাদ্যরূপে যেন গ্রহণ করতে পারি। এই সংস্কৃতির উপর যেন আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার জন্মায়— মাত্র প্রত্যন্তসীমায় থেমে থেকে কেবল তার বাণীর ভারবাহী আর তার পুঁথির কীট হয়ে যেন না থাকি।...

আমেরিকায় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ রোগে ভুগে মানসিক অবসাদে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আন্তর্জাতিক সখ্যস্থাপনে সহযোগিতার প্রত্যাশায় যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন, প্রথম দিকে তাতে তেমন আন্তরিকতাপূর্ণ সাড়া তিনি পান নি। শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। এ সময়ে যে পত্রাবলী তিনি আমাকে লিখেছেন, সেগুলি প্রায়ই থাকত নৈরাশ্য-বিষাদে পূর্ণ। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে তাঁর মনে যে আদর্শ জেগেছিল, উদ্ধৃত চিঠিগুলির মধ্যে সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিউ ইয়র্ক। ২৮ অক্টোবর ১৯২০

আমাদের জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এত রাতে তীরে নামা যাবে না। সমুদ্রের ও কূল থেকে এ কূলে পৌঁছতে মাঝে মাঝেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গগর্জন ও প্রবলবাত্যার অভিঘাত এসেছে। তাও পার হয়ে অবশেষে নিরাপদ বন্দরে তরী ভিড়ল। যে দুস্তর পারাবারের বাধা পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার স্মৃতিও মন থেকে সরে গেল। কিন্তু যে অভিযাত্রীর দল একযুগ থেকে অন্যযুগের দিকে যাত্রা করেছে, তারা অবশ্য এখনো সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে নি। কত ঝড় বয়ে গেছে, লবণাক্ত সমুদ্রের ক্রন্দন তাদের দিনরাত্রিকে ভারাক্রান্ত করেছে। কিন্তু পোতাশ্রয় আর দূরে নেই। নূতন যুগসাম্রাজ্য অনাবিষ্কৃতের আহ্বান বহন করে নূতন প্রাণ ও আলোর সমারোহ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সেই দূরাগত ভবিষ্যতের পদধ্বনি আমি শুনেছি। তীর থেকে যে পাখিরা আশাগীতি বয়ে আনছে, তাদেরও দেখতে পেয়েছি।

মনে স্থির জানবেন, আমাদের শান্তিনিকেতন সেই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠাভূমি। সেই উদয়াচলের শিখরসীমায় লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে চলতে গেলে নিঃসংশয় বিশ্বাস ও অনাবিল দূরদৃষ্টি চাই।

আমাদের তরীটিকে অতীতের কূলে আবদ্ধ রেখেছে এখনো অনেক শৃঙ্খল। তবু সব বাঁধন ছিন্ন করে সে আশ্রয় পিছনে ফেলে আসতে হবে। ভূগোলে নির্দিষ্ট কোনো একটি বিশেষ ভূখণ্ডের প্রতি আমাদের আনুগত্য নয়, যে চেতনরাজ্যে বিশ্বমানব জন্ম নিচ্ছে, আমরা তারই স্বজাতীয়ত্ব অনুভব করব। সেই মহানুভবের অর্ঘ্য বয়ে বিশ্বযাত্রীদলের সঙ্গে আমরাও মনুষ্যত্বের বিরাট মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হব।

নিউ ইয়র্ক। ৪ নবেম্বর ১৯২০

একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে শান্তিনিকেতনকে দূরে সরিয়ে রাখুন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। জানি সে সবের প্রভাব দূরে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। তবু মনে রাখতে হবে, রাজনীতির পথ আমাদের নয়। আমি যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি তখন আমি শান্তিনিকেতনের নই।

রাজনীতি চর্চা করায় কিছু বিশেষ দোষ আছে বলি নে, তবে আমাদের

আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে তা খাপ খায় না।

এ কথাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আমাদের কাছে শান্তিনিকেতন নামের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা তার সেই নাম সার্থক করব। চতুর্দিকের শক্তি প্রবল হয়ে তাকে বর্তমানের সাময়িক মত্ততায় যোগ দিতে যদি বাধ্য করে, সেই ভয় হয়। এখন অশান্তির আবহাওয়ায় মানুষের চিত্ত বিক্ষিপ্ত বলেই বিশেষ করে আশ্রমের মধ্যে আমরা শুদ্ধ শান্ত স্বরূপে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রক্ষা করব।

নিউ ইয়র্ক। ২৫ নবেম্বর ১৯২০

বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি অনুরাগী আমার এক বন্ধু কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি প্রতি রবিবার আমাকে কোয়েকার সভায় নিয়ে যান। সেখানে ধ্যানের নিস্তব্ধতায় আমি সত্যের শাশ্বত মূর্তিটি দেখতে পাই। বাইরের সফলতা যে কত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ তখন বুঝতে পারি। আমাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে, এও নিঃসন্দেহে বুঝি। সফলতালাভের জন্যে আমাদের মূল্য দিতে হয়, কিন্তু সত্যের জন্যে আমরা নিজেদের দান করি। সেই উৎসর্জনের ভাবটি যদি পবিত্র হয়, তবে তার সার্থকতার পরিমাপ করা যাবে না। আমার দেশকে এবং আমার পৃথিবীকে আমি যেন আমার জীবনটি উৎসর্গ করে যেতে পারি।

আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ আপনি নিজেকে সীমিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন। 'নতুন পৃথিবী গড়তে হবে' এ যুগের সে নির্ঘোষ আপনি শুনেছেন। এই সুমহান্ কাজের ভার আমরা নেব। দেশে দেশে এই কর্মসহযোগীদের শান্তিনিকেতনে আহ্বান করতে হবে। অন্য সব কাজ এখন কিছুদিন বন্ধ থাকতে পারে।

এই যুগের অতিথি যিনি, সেই মহামানবের জন্যে স্থান করা চাই। কোনো দেশ বা কোনো জাতি যেন তাতে বাধা না দেয়। আমাদের দুঃখের বিলাপ ও দৈন্যের অভিযোগ পাছে তাঁর আগমন-ঘোষণাটিকে স্তব্ধ করে দেয়— এই আশঙ্কা মনে জাগে। নিজেদের দুঃখদুর্দশাকে দূরে ঠেলে রেখে যেন বলতে পারি, তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক। কেননা ভাবীকালের জয়ের আসন যে তাঁরই।

নিউ ইয়র্ক। ৩০ নবেম্বর ১৯২০

মাঝে মাঝে *Gitanjali*-র সেই কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ে, যেখানে মেয়েটি বলছে, দেবতার গলার ছিন্ন মালার খোঁজে গিয়ে কেমন করে সে তাঁর তরবারিখানি পেল। সারাজীবন ধরে আমিও সেই পাপড়িগুলিই খুঁজে ফিরেছি। কিন্তু তাঁর দান যখন সত্যিই সামনে এসে উপস্থিত, তখন আমারও চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। আমি তো নিজে বেছে নিই নি, আমার দেবতারই এই দান। তাই মনে ভাবি, এর সার্থকতা তখনই হবে যদি তাঁর দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারি।

অতীতকাল ছিল মানবসাধারণের, ভবিষ্যৎ হল মহামানবের। আজও তা না মেনে এই বিশ্বকে আপন ভোগের অধিকারে আনার লোভে মানুষের লড়াইয়ের বিরাম নেই। তার উচ্চ কলরবে চতুর্দিক বধির; সৈন্যদলের পদধূলিভরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন। তবু মহাকালের ইঙ্গিতে এই সমরবিদীর্ণ ধরিত্রীবক্ষেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের বেদী প্রস্তুত করতে হবে। হয়তো তাতে জনতার ব্যঙ্গবিদ্রূপই আমাদের সইতে হবে। তবু আমরা যে বিশ্বাস-ভরে এগিয়েছি, এই তথ্য টিকে থাকবে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই ক্রমশ তা সত্য হয়ে ফুটে উঠবে।

কবি হয়ে জন্মেছিলুম— স্বভাবত তাই, কোনো উচ্চচিন্তা করার অবকাশ পর্যন্ত যাদের নেই, সেই-সব ব্যস্ত লোকের রূঢ় চাপে পথে দ্রুত চলা আমার পক্ষে বড়ো কঠিন। আমি খেলোয়াড় নই, রঙ্গভূমিতে আমার স্থান নয়। দর্শকের ভিড়ের উৎসুক দৃষ্টিতে আমার নিভৃত সত্তা আহত হয়। তবু এত লোকের মধ্যে আমারই উপর এই কাজের ভার পড়ল। পাশ্চাত্য জনসাধারণের সভায় ঘুরে ঘুরে বিশ্বমৈত্রীচেতনার আবেদন জানাতে হবে। অথচ প্রচারের কোনো শিক্ষাই আমার কখনো হয় নি। তবে জানি, সত্যের যে সূক্ষ্ম তীর, সে তো পল্‌কা বাঁশের কঞ্চি দিয়েই তৈরি হয়।

নিউ ইয়র্ক। ১৩ ডিসেম্বর ১৯২০

আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসব প্রায় এসে গেল। সেই উৎসবে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আমার মন কত উন্মুখ হয়েছে, কী বলি? নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি, আমি যে কাজ করছি তাতে খুব মহৎ

একটা কিছু ফললাভ হবে। কিন্তু আমার অন্তরের গভীরে এই বোধ রয়েছে যে, পূর্ণের প্রসাদসুখ পেতে হলে জীবনধারা স্বচ্ছন্দ হওয়া চাই আর কর্মপ্রযত্নেও সরলতা থাকা প্রয়োজন। আমাদের কাজের মধ্যে যখন আদর্শের পূর্ণতার মূর্তি খানিকটা দেখতে পাই, তখন তার পরিমাণে কী আসে যায়? বিপুলতাকেই যদি মূল্য দিই, তবে সত্যে আমাদের অনাস্থা প্রকাশ পায়। ধরার রাজ্যে অধিকারের গৌরবই প্রবল, কিন্তু বিশ্বরাজের দরবারে উপলব্ধির গভীরতাই পরম মূল্যবান।

এমন কত কত প্রতিষ্ঠান আছে, বাইরের সৌষ্ঠবই যাদের বিশেষ কাম্য। কিন্তু সত্যে আমরা নিজেদের উপলব্ধি করব, তার সুযোগ দেবার জন্যে শান্তি-নিকেতন রয়েছে। এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা অর্থব্যয়ে হয় না, প্রেমে আত্মোৎসর্জনের দ্বারাই এ ব্রতসাধন সম্ভব।

এ দেশে এখন আমি বৃহদায়তনের দুর্গকারায় বাস করছি। আমার চিত্ত উপবাসী। দিনরাত কেবল সেই শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন দেখছি, যা প্রাণের সহজ বিকাশের অবাধ ক্ষেত্রে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। এই দেশ থেকে যখন তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই বুঝি শান্তিনিকেতন মহতো মহীয়ান্। এখানে প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছি, সংখ্যাদৈত্যের এই বোঝা বয়ে বেড়ানো মানবাত্মার পক্ষে কী ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো। এই দৈত্যটা অনবরতই মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে না। নিরন্তর সংগ্রামের ঝড় ঘনিয়ে তুলে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ চারি দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় সরীসৃপরা নিজেদের পুচ্ছের বিপুলত্বে যতই গৌরববোধ করুক, তা নিয়ে বিনাশের হাত থেকে তো তারা রেহাই পায় নি। আমার ভারি ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে এ অনিত্যের বোঝা নামিয়ে দিয়ে পরের জাহাজেই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে মনেপ্রাণে তার সেবা করি।

যে জীবন আমি তাকে উৎসর্গ করব, তা যদি সত্য হয়, তার জোরেই সে বেঁচে থাকবে। প্রকৃত জ্ঞান যেখানে আছে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সত্যকেই সে মূল্য দেয়। ভারতবর্ষেই এই পরম প্রজ্ঞার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু সমৃদ্ধ পশ্চিমদেশে সাফল্যের পূজারিদের সজোর চীৎকারে সেই মহতী বাণী

ডুবে যাবার সম্ভাবনা আসন্ন। তাই অনৃতের এই নিরালোক দুর্গ ছেড়ে যাবার জন্যে, ফুলের মতো এই সুকুমার জীবনগুলিকে যে মৃত্যুর তাণ্ডব দলে দিয়ে যাচ্ছে সেই দৃশ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, আমার প্রার্থনাও প্রতিনিয়ত গভীরতর হয়ে উঠছে।

নিউ ইয়র্ক। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২০

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের তাড়নায় আমার চিন্তা-গুলি যখন ঘূর্ণির মুখে শুকনো পাতার মতো দিগ্বিদিকে ঘুরছিল, ঠিক সেই সময়ে একটি ছবি হঠাৎ আমার হাতের কাছে এল। সুজাতা বুদ্ধকে পরমান্নের পাত্র নিবেদন করছেন— এ সেই ছবি। তৎক্ষণাৎ তার বাণী আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করল। সে বললে, যখন তুমি তোমার তপস্যায় নিরত ছিলে, তখন সেই অমৃতপাত্র অযাচিতভাবে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছে। প্রেমপূর্ণ অন্তরই তোমাকে তা নিবেদন করেছে, কারণ সত্যের কাছে তার পূজা-উপহার নিয়ে যেতে পারে কেবল প্রেমই।

সেই মুহূর্তে আপনার মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আপনিই তো সেই অন্নসুধা আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। ধনীব্যক্তির চেকবই যা দিতে পারে, এ তার চেয়ে ঢের বেশি। আমি সহানুভূতির অভাবে, বন্ধুত্বের অভাবে নিঃসঙ্গতার অরণ্যে কী বিষাদ-ক্লিষ্ট জীবন কাটিয়েছি! এমন দিনে প্রেমের পাত্র পূর্ণ করে আপনি আমার সামনে ধরলেন। তাই হল আমার সত্যিকারের অন্ন, তাতেই আমি তখন প্রাণ পেয়ে ধন্য হলুম। কবি মরিসও বলেছেন — ভালোবাসাই জীবনের পরম পাওয়া। সেই প্রেমের বাণী আমাকে ডলারের প্রলোভন থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেই বাণী কত সমুদ্র পার হয়ে, হাসি গানে আনন্দে মুখর শালবীথির ছায়া পেরিয়ে আমার বুকে এসে বাজে।

মুশকিল এই, উচ্চাশা তো প্রেমে বিশ্বাস করে না। সে ক্ষমতাকেই বিশ্বাস করে। সেই চিরপ্রাণের উৎস কলস্বনা স্বচ্ছ নির্ঝরিণী ছেড়ে সে সফলতার মদিরায় পিপাসা মিটাতে চায়। এই সফলতার প্রতিমূর্তি দেখেই আমি ক্রমশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি। উপনিষদ বলেছেন, 'ভূমৈব সুখং'। উচ্চাশা বৃহৎকে দেখিয়ে বলে, এই ভূমা। আর তা শুনে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। বুদ্ধদেবের ছবি দেখলেই, অন্তরের পূর্ণতার যে সুগভীর শান্তি, তা পাবার জন্যে আমি

ব্যাকুল হই। আমার চতুর্দিকে যে দানবীয় বিপুলতা রয়েছে তার নিরর্থকতার কথা চিন্তা করলে আমার চিত্ত এত বিক্ষিপ্ত হয় যে, অমনি শান্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় বিচলিত করে। রোজ সকালে জানালার ধারে বসে নিজেকে বলি— প্রতিদিন অজস্র মানুষের প্রাণবলি দিয়ে পাশ্চাত্যের এই যে মূর্তিপূজা— এর কাছে আমি কখনো মাথা নোয়াব না। বোষ্টমী সেই একদিন সকালে শিলাইদায় আমাকে যে কথাটি বলেছিল, তা মনে পড়ে গেল। বলেছিল— কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়?

এই মুহূর্তে গগনচুম্বী প্রাসাদের সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছি। কোনো বৃক্ষ-চূড়া তার মৃদুস্বর সেখানে পৌছতে সাহস করে না। কিন্তু প্রেম নিঃশব্দচরণে এসে বললে, সেই সবুজ ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে কবে আমাদের মিলন হবে?— যেখানে আকাশ আলো আর সরল জীবনের মৃদুস্পর্শ-সুরভিত স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাব? তখন আমার প্রকল্পে পশ্চিমের আনুকূল্য প্রতীক্ষায় কালহরণ এমন করুণ ও উপহাসযোগ্য মনে হয়, আমি লজ্জায় থেমে যাই।

নিউ ইয়র্ক। ১৯ ডিসেম্বর ১৯২০

প্রাণলক্ষ্মী পৃথিবীতে তাঁর প্রথম জীবলীলা শুরু করলেন বিরাটকায় বিকট-মূর্তি জন্তু নিয়ে। বিপুল তাদের দেহ, তাদের অস্থিমাংস, তাদের বর্ম, তাদের লাঙুল।

কিছুদিন সৃষ্টির এই একই ধারা ছিল। উপাদানের ভাণ্ডার এবং জীবনী-শক্তি যে-পর্যন্ত এই ভারবহনে সক্ষম রইল, ততদিন এর ব্যতিক্রম হয় নি। এভাবে আয়তন বাড়িয়ে যাওয়াটা বেহিসেবী, তাই শুধু ক্ষতিকর নয় কুশ্রীও। প্রত্যক্ষগণিতে পরিমিতিই হল সৌন্দর্যের মূলতত্ত্ব। অন্তহীন এই ভীমাবয়ব সৃষ্টির উন্মাদনায় বিহ্বল হয়ে চলতে চলতে জীবজগৎ একবার যেন বিরতির অবকাশ খুঁজতে লাগল।

উচ্চাশাপরায়ণ শক্তিমাত্রই এই বাহুল্য সৃষ্টির ঝোঁকে অন্ধ হয়ে চলে। পূর্ণতার দিকে নয়, বৃদ্ধির দিকেই তার পদক্ষেপ। কিন্তু যে সব উন্নতি-অভিলাষীর নির্ভর কেবল লাঙুল আর বর্মের উপরই, তারা এই বাড়তি ভার বয়েই মরে যতদিন না তা বর্জনে বাধ্য হয়।

জীববিবর্তনের শুরুতেই তাই সৃষ্টিকে তার বিরাট বিপুল দেহের

বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবতে হয়েছে। বৃহৎ কিছু গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করার ফলেই মানুষের সৃষ্টি হল। সে জন্মাল নেহাৎ ক্ষুদ্র দুর্বল ও নিঃসহায় হয়ে। পূর্বতন জীবদেহের অস্থিমাংসের প্রকাণ্ড স্তূপ গেল সরে। এই আপাতবিষম ক্ষতির পরিবর্তে মানুষ লাভ করল স্বাবলম্বীর গৌরব।

এর পরের স্তরে এল মনের পরিচালনার কাল। বিরাটকায়কেও ক্রমে সে নিজের অধীনে নিয়ে এল। কিন্তু সচরাচর যেমন ঘটে, প্রভু ভৃত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, মনও তেমনি উপকরণ-বাহুল্যের সাহায্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাইল। দেহের সাম্রাজ্য অতীত হলে মনের সাম্রাজ্য যদিও প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু মনও দেহকেই তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত করল।

আমাদের ইতিহাস-বিধাতা চিৎসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পশুর পরে মানুষ এল। এখন মহামানবের আসার পালা। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে অনেক জায়গায় শুনেছি কোনো কোনো মানুষ অসুরদের হাত থেকে সুরলোক রক্ষা করার অভিপ্রায়ে দেবতাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে প্রায়ই দেখি, মানুষ দানবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দেবতাদের হারাতে চায়। দুর্জয়-শক্তিসম্পন্ন তার মারণাস্ত্র আর সমুদ্রবাহী বিপুলায়তন রণতরী সে পেয়েছে দানবের অস্ত্রভাণ্ডার থেকেই। বৃহতের সঙ্গে মহতের যে সংগ্রাম, তাতে মানুষ বৃহতের পক্ষেই যোগদান করেছে। সে তার পুরস্কারের মূল্য সংখ্যা দিয়েই নিরূপণ করে, গুণ দিয়ে নয়। সোনা ফেলে তামা আঁচলে বাঁধে।

প্রচুর পার্থিব উপকরণ হাতে পেলে মানুষ তারই দাস হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের ভাগ্য ভালো, উপকরণ আমাদের প্রত্যক্ষ আয়ত্তের বাইরে। আমাদের হাতে অস্ত্রও নেই। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের অন্য উচ্চতর শক্তির খোঁজ করতে হয়। পশুশক্তিতে যে-সব লোকের বিশ্বাস প্রবল, সেই শক্তি রক্ষা করার জন্যে কতই না তারা বলি দেয়! কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা যেন মানুষের নৈতিক শক্তিতে বিশ্বাস রেখে সর্বস্ব সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকি। নিঃসন্দেহে যেন প্রমাণ করতে পারি, মানুষসৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার চূড়ান্ত ভুলের পরিচয় নয়। এ কথা যেন কেউ না বলতে পায়, পৃথিবীতে সুখশান্তি বজায় রাখারই প্রয়োজনসাপেক্ষে যে-সব বুদ্ধিমান নরপশু কারখানার

তৈরি বিষাক্ত নখদন্তের বড়াই করে, তাদের চেয়ে আদিম হিংস্র পশুরাই ছিল বরং ভালো।

নিউ ইয়র্ক। ২০ ডিসেম্বর ১৯২০

যুগে যুগে দেশে দেশে নানা তথ্য মানুষের হাতে এসেছে যাতে তার সাহায্যে সত্যকে সে বিশিষ্টরূপে ব্যক্ত করতে পারে। তথ্যগুলি যেন গ্যাসের অন্তর্নিহিত পরমাণু। কখনো এরা একে অন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, কখনো বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই এর কিছু পরিমাণ একটি শিশির-বিন্দুতে সম্বদ্ধ হয়, তখন তাদের সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। মানুষের প্রয়াস যেন হয় তার নিজের যুগের তথ্যাবিষ্কার সৃষ্টিশক্তিতে সংহত করার দিকে। ধর্মাচরণেও মানুষের ইতিহাসে ক্রমে বিভেদবিদ্বেষ প্রবল হয়ে দাঁড়াল। তারই প্রতিরোধে সংহতির বৈপ্লবিক যুগপ্রেরণায় বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীস্টের কালে মানবসমাজ সংঘবদ্ধ হবার কাজে বহুদূর অগ্রসর হয়।

ধর্মে আচারপরায়ণতা আর রাজনীতিতে জাতীয়তা একই ব্যাপার। এরই থেকে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য, ভ্রান্ত ধারণায় মনোমালিন্যের সৃষ্টি আর ধর্মের নামে নিগ্রহ। ভারতের মধ্যযুগীয় সন্তরা তাঁদের প্রেমের আলোকে ও অন্তরের সত্যানুভূতিতে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের চোখে লোকাচারের অজস্র বেড়ার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পরস্পর-বিরোধীভাবাপন্ন দুই ধর্মমত— হিন্দু ও মুসলমান— তাঁদের মিলনচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে নি। সত্যে যে আমাদের বিশ্বাস আছে, তার পরীক্ষা তখনই হয় যখন সেই উপলব্ধির পথে আপাতসংকট আসে।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বাস্তব সত্য হল, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন। যতদিন এ ঘটনা একটি তথ্যমাত্র হয়ে থাকবে, ততদিন সংগ্রামের অন্ত থাকবে না। মানুষের আত্মায় পর্যন্ত তা আঘাত হানবে। তাই এই তথ্যকে সত্যে পরিণত করার ব্রত সব মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। চতুর বিষয়ী লোকে বলবে, এ সম্ভবই নয়। পূর্ব ও পশ্চিমে মৌলিক তফাৎ, এদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে কেবল কায়িক শক্তি।

অথচ কায়িক শক্তি তো সৃজনক্ষম নয়। তা আইন গড়তে পারে, সংগঠন কায়েমী করতে পারে, কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক তৃপ্তি আনতে পারে কি?

আমাদের যুগে রামমোহন রায় হলেন সেই সত্যদ্রষ্টা পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম পূর্ব-পশ্চিমের আত্মিক মিলন অসীম শ্রদ্ধা ও ঔদার্যের সঙ্গে নিজের অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁর দেশবাসী তাঁকে ত্যাগ করলেও আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলেছি।

ইউরোপে যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতেন, কত ভালো হত। বর্তমান যুগের অভিপ্রায় কি, তা আপনি এক মুহূর্তে ধরতে পারতেন। কিসের জন্যে যে মানুষের এই ক্রন্দন, যা রাজনীতিবিদ্‌দের কানে যায় না— তা আপনি বুঝতে পারতেন। মোগলসম্রাটদের দরবারে রাজনীতিজ্ঞের অভাব ছিল না। তাঁরা তো ধ্বংসস্তূপ ছাড়া পশ্চাতে কিছুই রেখে যান নি। কিন্তু কবীর আর নানক আমাদের দিয়ে গেছেন— ভগবৎপ্রেমে মানুষের যে ঐক্য, তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস।

নিউ ইয়র্ক। ২১ ডিসেম্বর ১৯২০

আমার চতুর্দিকে জনতার মরুভূমি— অসংখ্য মানুষের ভিড়। সেখানে উদ্দাম হট্টগোলের মধ্যে মানুষ নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। আমার নিজের মধ্যে এমনিতেই অসহায়-বোধের প্রকাণ্ড বোঝা রয়েছে— তা নিয়ে এ পথ অতিক্রম করতে নিজের সঙ্গে আমাকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। প্রতি মুহূর্তে আমি সে বিষয়ে সচেতন থাকি— ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মানবচিত্তের ঔদাসীন্য এসে যখন পথরোধ করে, তখন কোনো আদর্শের ধ্বজা বয়ে চলতে হলে নিজের ভার যথাসম্ভব হালকা রাখা চাই। এ দিকে অযোগ্যতার বোঝায় আমি যে নিতান্তই দুর্বহ।

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় দেখেছি, একটি ছোটো ছেলের হাত ধরে এক বৃদ্ধ অন্ধ ভিক্ষুক আমাদের বাড়িতে আসত। দৃশ্যটি বড়োই করুণ। বৃদ্ধের অন্ধত্ব ছেলেটিরও স্বাধীনতা হরণ করেছিল। সে ছাড়া-পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। আমাদের অক্ষমতা এমনই এক শৃঙ্খল— যা দিয়ে নিজের অযোগ্যতার সঙ্গে আমরা অন্যদেরও জড়িয়ে ফেলি। এতে আমার ক্লান্তির বোঝা প্রতিদিন বেড়ে যায়। তবে এই অবসাদেরও একটি মূল্য আছে। এর ফলেই আমি আবিষ্কার করেছি, মানুষের এই যে জড়ত্ববোধ, তার অনেকখানিই মায়া।

কয়েকদিন ধরে নিজেকে খুব কষে নাড়া দিচ্ছি। আত্মপ্রবঞ্চনার এই বিহ্বলতা থেকে আমি মুক্ত হতে চাই। জীবনের বেশির ভাগ সময় আমার মন স্বপ্নরাজ্যের অন্তঃপুরের পথ-ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে, তাই আজ বাইরের জগতের বাঁকাচোরা পথে চলার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। সমাজের উপরের স্তরের হট্টগোলে-ভরা, নানাবিধ দায়িত্বে পূর্ণ জীবনে সে কোনোকালেই চলতে শেখে নি। এই পশ্চিম ভূভাগ তাই আমার পৃথিবীর আওতার বাইরে।

অথচ প্রেমের অর্ঘ্য এই পশ্চিম থেকেই তো পেলুম। আমার সেবা সে দাবী করতে পারে— তার সেই অধিকারে আমার চিত্তের স্বীকৃতি রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার হাতেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে যাব। বর্তমান যুগের সঙ্গে আমার যোগ নেই। এ যুগ উগ্র রাজনীতির যুগ। তবু এই যে-যুগ আমায় জন্ম দিয়েছে, তাকে তো একেবারে বর্জন করতে পারি নে। আমি আঘাতও পাই, সংগ্রামও করি— তবে মনে মনে এর থেকে মুক্তিই চাই। কিন্তু কে আমাকে পিছনে টেনে রাখে। আধুনিক পৃথিবীর এই জীবনই আমাকে মেনে নিতে হবে। তবে এর উচ্চ কলরবে আমার বিশ্বাস নেই। এ যুগের পানোৎসবে বসে যখন দেখি, এখানকার লোকে তাদের অসংযত অস্বাভাবিক তৃষ্ণা কড়া মদ দিয়ে মিটাতে চায়, সেই প্রমত্ত কোলাহলের মধ্যেও আমি শুনতে চেষ্টা করি স্রোতস্বিনীর মৃদু কলতান, যা সমুদ্রে গিয়ে তার স্বচ্ছ জলের ধারা মিশিয়ে দেবে।

নিউ ইয়র্ক। ২২ ডিসেম্বর ১৯২০

আজ ৭ই পৌষ। কেবলই মনে হচ্ছে, যদি আজকের দিনে ওঁ পিতা নোঽসি মন্ত্রের আরাধনায় আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতুম! এতবড়ো সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া আমার চিত্তের পক্ষে উপবাসেরই সমতুল্য। আজ সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করছি— ডিসেম্বরের এই রৌদ্রস্নাত সকালে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমপিতার চরণে প্রণত হওয়া ও তাঁর সেবায় জীবন-সমর্পণের চেয়ে সত্যতর আর কিছুই হতে পারে না। বাইরের উপকরণ বাড়ানোতে নয়, বরং সেই আত্মনিবেদনের ফলেই আমাদের কাজের গৌরব বেড়ে যায়।

সত্য কতই সহজ, আর আলোতে আনন্দে ভরপুর। জনতার ঔৎসুক্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া নয়, যিনি আমাদের অন্তর্যামী তাঁর সম্মতির পুরস্কার গ্রহণ করে

আমাদের প্রয়াসকে সার্থক করাই কেবল চাই। শান্তম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি এই হোটেলে যে ৭ই পৌষের নিঃসঙ্গ নীরব অনুষ্ঠান করছি, তা আপনাদের উৎসবের সুরের মধ্যে সংগতি পাবে। অসতো মা সদ্‌গময়— সত্যে আমাদের বিশ্বাস যেন অসত্যের মোহে আচ্ছন্ন না হয়। যিনি শঙ্কর যিনি ময়স্কর তিনি আমাদের অন্তরে আসুন। যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আসুব— যা কল্যাণ তাই আমাদের জীবনে বর্ষিত হোক। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ— যিনি শিব যিনি শিবতর— তাঁকে আমরা প্রণাম করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, এই অভিযানে আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকতেন, কত ভালো হত। এখন কিন্তু আমি যখন আশ্রমে নেই, সে সময় আপনি ওখানে রয়েছেন বলে ভারি কৃতজ্ঞবোধ করছি। আজকের দিনে আমি আপনার মধ্য দিয়েই শান্তিনিকেতনে বাস করছি, কেননা আপনি যে ভালোবেসে আমাকে বোঝেন। আমি জানি, আজ আমি আপনার অন্তরেই রয়েছি। আর আপনিও জানেন, আমার হৃদয় আজ আপনার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয় যে, পৃথিবীতে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে আমাদের উভয়ের মধ্যে যা মহত্তম তা সত্যে ও প্রেমে মিলতে পারে? এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আছে কি?

আশ্রমের ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্বাদ ও বন্ধুদের প্রীতি-নমস্কার জানাবেন।

নিউ ইয়র্কের কাছে। ২৫ ডিসেম্বর

আজ খ্রীস্ট জন্মোৎসব। ইউনাইটেড স্টেটসের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন অতিথি এসে এই বিশ্রামশালায় মিলেছি। বাড়িখানি সুন্দর, ঘনবনে-ঘেরা পাহাড়ের মাঝখানটিতে রয়েছে। একটি ছোটো নদীর ধারা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে হ্রদের রূপে উপত্যকায় নেমেছে। এর সৌন্দর্য মানুষের মন আকর্ষণ করে। চমৎকার এই সকালটি— সূর্যকিরণে স্নাত হয়ে পূর্ণ শান্তিতে বিরাজ করছে। নিষ্পত্র অরণ্যে পাখির গান বা ভ্রমরের গুঞ্জরণ— কিছুই নেই, সেও আজ নিস্তব্ধ।

অথচ মানুষের মনে সেই খ্রীস্টোৎসবের ভাবটি আজ কোথায়? পুরুষে নারীতে মিলে কেবল পান-ভোজন হাসি-উচ্ছ্বাসে আরো মেতেছে। তাদের

এই স্ফূর্তির মধ্যে চিরপ্রাণের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই, আনন্দের মধ্যে গাম্ভীর্যের দীপ্তি নেই, তাদের ভক্তিতেও কোনো গভীরতা নেই। আমাদের দেশের ধর্মোৎসবগুলির সঙ্গে তুলনায় এর কত তফাৎ। এই পশ্চিমের লোকেরা টাকা করেছে বটে ; কিন্তু তাদের জীবনের কাব্যকে ধ্বংস করে ফেলেছে। বহু প্রাচীন তুষারময় পর্বতের উচ্চচূড়া থেকে যে নদী সতত গতিশীলা, কাঁকর বালিতে তার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই নদীটির সঙ্গে এদেশের লোকের জীবনধারার তুলনা করা যায়। এখানে এসেই বিশেষ করে আমি অনাড়ম্বর জীবন ও সহজ বিশ্বাসের গভীর মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়েছি। পশ্চিমের লোকের অপরিসীম আস্থা রয়েছে ঐশ্বর্যের উপর। সে ঐশ্বর্য নিজেকে ক্রমশ বাড়িয়ে চলে, অথচ তাতে পরাসম্পদ কিছু লাভ হয় কি ?

যার পিছনে এরা ঘুরছে, সে যে একেবারেই নিরর্থক, তা এদের কে বোঝাবে ? ওরা যে সুখী নয়, তা বোঝবার অবকাশও নেই। সুখের আস্বাদনে সকলের চেয়ে যে বঞ্চিত, পাছে সেই বোধ জাগে— তাই ব্যর্থ মত্ততায় বিরামের ক্ষণগুলিরও শ্বাসরোধ করতে চায়। কৃত্রিমতার জালে আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রাখে— তার পরে নিজের কাছেও তা ঢাকবার জন্যে সেই ঐশ্বর্যের বুদ্‌বুদ্‌ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনবরত আত্মপ্রতারণা করে যায়।

আমার চিত্ত এখন মানসযাত্রী হংসের মতো। সে যেন সাহারার মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে। সেখানকার বালিগুলো চিকচিক করছে কিন্তু আত্মা সেখানে চিরপিপাসিত।

নিউ ইয়র্ক। ৮ জানুয়ারি ১৯২১

এমন কতকগুলি অনুভূতি রয়েছে, যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমরা কিন্তু তা বুঝতে পারি নে, কেননা তাদের নাম আমাদের অতিপরিচিত। ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও সেইরকম। তাঁর অস্তিত্বে সচেতন হবার জন্যে যেন উপলব্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। অনুভূতিহীন বাক্যের আবরণ সরিয়ে ভগবৎ-সত্তার স্পর্শ পেতে হলে বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রবণতার দরকার। যে বস্তু স্বভাবতই ক্ষুদ্র ক্রমপরিচয়ে তার ধারণা আমরা করতে পারি। কিন্তু যে সত্য মহৎ— আবির্ভাবমাত্রই তার অসীমত্ব প্রকাশ পায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে বাণী সত্যকে প্রকাশ করে, সত্যের মতো প্রবল প্রাণ তার নেই। তাই

বারম্বার প্রয়োগে সে মন্ত্রোচ্চারণ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আমরা হয়তো বুঝতে পারি নে, ক্রমে সেই সত্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস শিথিল হয়, উৎসাহ ও ঔৎসুক্য নিস্তেজ হয়ে যায়।

সে কারণেই যারা প্রকাশ্যে ধর্মকে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে ঢের বেশি অধার্মিক হয় সেই-সব লোক, যাদের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ধার্মিক। ঈশ্বরকে নিয়ে ধর্মপ্রচারকদের নিয়ত কারবার। তাঁর সত্যিকার সংস্পর্শের অপেক্ষায় এরা থাকতে পারে না। অবশ্য সে স্বীকার করার সৎসাহস এদের নেই। তাই সদাসর্বদা অতি আয়াসে এমন ভাব বজায় রাখতে হয়, যেন তারা সত্যই ঈশ্বরকে জানে। কর্তব্যবোধে অথবা অপরের প্রত্যাশা পূর্ণ করার অভিপ্রায়ে এভাবে নিজেদেরও ভোলায়।

অথচ ভগবদ্-অনুভূতি অন্য সব অনুভূতিরই মতো এক দিব্য উদ্দীপনার মুহূর্তেই মানুষের জীবনে আসে। তারই জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য যদি আমাদের না থাকে, তবে সতত অনুশীলনের দ্বারা আমরা প্রেরণার পথই রুদ্ধ করে দিই। যাঁরা ভগবানকে প্রচার করতে চান, তাঁরা ধর্মমতেরই প্রচার করেন। এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎ সেটি ধরার ক্ষমতা পর্যন্ত এঁরা হারিয়ে ফেলেন। তাই এঁদের ধর্ম পৃথিবীতে শান্তি না এনে দ্বন্দ্বই নিয়ে আসে। জাতীয় স্বার্থে ও দম্ভপ্রচারে ধর্মের অপব্যবহারেও এঁদের দ্বিধা নেই।

আপনার মনে হতে পারে, এ চিঠিতে এ বিষয়ে আমি কেন আলোচনা করছি। আমার নিজের মধ্যে কবি ও প্রচারকের যে চিরকালের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই সূত্রেই কথাগুলো বলছি। এদের মধ্যে একটির নির্ভর প্রেরণায়, অন্যটির নির্ভর সচেতনপ্রয়াসে। সেই সচেতনতার উপর বেশি চাপ দিলে চিত্তের অসাড়তা আসে। তাকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়। প্রচারক যে, সে কয়েকটি চিন্তার ধারা নিয়ে ব্যাবসাদারী করে। ক্রেতারা যে-কোনো সময়ে এসে তাকে প্রশ্ন করে। যে উত্তর দিতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায় তা কালক্রমে সজীবতা হারিয়ে ফেলে। তার বাঁধাবুলির আড়ালে সেই সত্যে নিজের অন্তরের আস্থাও হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমার বিশ্বাস, এ ধরনের ট্র্যাজেডি অহরহ ঘটছে। বিশেষ করে যারা নেহাৎ ভালোমানুষ তারা ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা জমল কি না না দেখে যেমন দানের আগ্রহে চেক সই করে দেয়— এসব প্রচারকের অবস্থাও তাই।

এই কারণে আমার মনে হচ্ছে, সামান্য কবি ছাড়া আর কিছু না হওয়া ভারি নির্ঝঞ্ঝাটের। তবে আর অন্য লোকের মরজি-মতো তাকে চলতে হয় না, নিজের জীবনের বিশেষ মুহূর্তের প্রতি অন্তরে খাঁটি থাকলেই চলে।

নিউ ইয়র্ক। ১৪ জানুয়ারি ১৯২১

আমি যখন নিতান্ত শিশু, তখন থেকে আমার মন চাইত পূর্ণতার পরিবেশে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তার মানে তথ্যের মধ্যে আমি সত্যের প্রকাশ দেখতে পেতুম। অবশ্য তখনো তা ভালো বুঝতে পারি নি। অতিসাধারণ বস্তুও সর্বদা আমার মনে গভীর রেখাপাত করত। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতরকার ছাদের উপর থেকে চেয়ে দেখতুম নারকেল গাছ আর গয়লাদের ছোট্টো কুঁড়ে-ঘেরা পুকুর। ওরা বস্তুত যা— তার চেয়েও অনেক বেশি পূর্ণ-সৌন্দর্যের ছবি হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠত। তাই সে দেখা আমার ফুরোত না। সেই দেখার শক্তি সুদীর্ঘকালের আত্মসমীক্ষা ও যুক্তি সত্ত্বেও আজও আমার মধ্যে টিকে রয়েছে। পূর্ণতার বোধ এবং তা লাভের আকাঙ্ক্ষাই এর মূলে আছে। মানুষের অন্তরঙ্গতা থেকে আমার দূরে সরে থাকা এবং আমাকে সকলের ভুল বোঝার কারণও এই।

স্বদেশী, স্বরাজ্য— এ শব্দগুলি সাধারণভাবে আমাদের দেশের লোকের মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করে। কেননা এ-সবের মধ্যে উদ্দামতার আগুন রয়েছে। এর উত্তাপ এবং গতি আমাকে স্পর্শ করে না বললে ভুল বলা হয়। তবে কবির বিশিষ্ট প্রকৃতি-অনুযায়ী আমি এগুলিকে জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে পারি নে। ওরা আমাদের কাছে পাওনার অতিরিক্ত দাবি করে। কিছুদিন পরেই তাই আমি দল ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হই। আমার আত্মা এই বলে কেঁদে ওঠে, স্বদেশপ্রেমিক বা নীতিবিদের কাছে সম্পূর্ণ মানুষটিকে বলি দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

আমার চোখে মনুষ্যজাতি বিরাট বিপুল ও বহুমুখী। তাই যখন দেখি জাগতিক লাভের আশায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে দলিত করে পশ্চিম দেশ তাকে যন্ত্রে পরিণত করে তুলেছে তখন মনে গভীর বেদনাবোধ করি। আমাদের দেশেও একই ভাবে স্বদেশপ্রেমের নামে ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়। নিজের প্রকৃতিকে স্বেচ্ছায় এ ভাবে জীর্ণ করে তোলাকে আমি পাপ মনে করি।

এ ধরনের উদাসীন অবহেলা মানবজন্মের প্রতি অবমাননা। কারণ বিধাতার অভিপ্রায় মানবসত্তার পূর্ণপরিণতি সাধন— তাই আপন বিচিত্রমুখী প্রতিভার সুষম বিকাশের দায় প্রতি মানুষের। অথচ যখন দেখি কোনো লোক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে উন্মুখ হয়ে সমাজের উপর মানসিক বিকৃতি, সাংস্কৃতিক দৈন্য ও গোঁড়ামির ভার চাপিয়েছে— তখন আমার ভারি কষ্ট হয়। কেননা আসলে এ-সব তো আধ্যাত্মিক নিঃস্বতাই।

একজন ফরাসী ভদ্রলোক জাপান সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। সেখানি পড়ছিলুম। সৌন্দর্যানুভূতির যে দেশব্যাপী প্রয়াস জাপানে দেখা যায়, সে শুধু তার শক্তির উৎস নয়, তাকে ত্যাগব্রতেও দীক্ষা দিয়েছে। কারণ প্রকৃত বৈরাগ্যের ফুল সৌন্দর্য ও আনন্দের রসসিঞ্চিত মাটিতেই ফোটে— সেই মাটি আমাদের আত্মার অমৃত-অন্ন দান করে।

কিন্তু সেই মাটিকে অনুর্বর করে তোলার চেষ্টা যদি করি, তবে যে বিবর্ণ বৈরাগ্যের রূপ ফুটে ওঠে— তা ধ্বংসেরই নামান্তর। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রবৃত্তির আকর্ষণ-বর্জনের সাধনা চলছে। এর উপরে আমরা যেন আবার আত্ম-সংকোচনের পাগলামিটাকেও না চাপাই। আমাদের শীর্ণ বিশীর্ণ জীবনে এখন প্রয়োজন আরো রঙের, আরো প্রসারের, আরো পুষ্টির। অন্যান্য দেশের যাতেই প্রয়োজন থাক, কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের নয়, পূর্ণতর জীবনই আমরা চাই।

জীবনের জড়তা থেকে অপবিত্রতা জন্মায়। কেননা তাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি খর্ব হয়, দৃষ্টিভঙ্গী অনুদার হয়ে পড়ে, অন্ধ ভাবোন্মাদনায় চিত্ত আবিল হয়। শোধনের কাজ জীবনের অগ্রগতির মধ্য দিয়েই চলে, যদি না তাতে বাইরের বাধা এসে পড়ে।

নিউ ইয়র্ক। ২৩ জানুয়ারি ১৯২১

এইমাত্র নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে গ্রীনীচ থেকে ফিরছি। গতরাতে সেখানে আমার অভ্যর্থনা ভাষণ ভোজ আলোচনা— সবই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা হয়েছিল চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো।

কিন্তু এ ধরনের প্রাণান্তকর প্রচারপর্বের শেষপ্রান্তে আমি কী দেখতে পাই? যাক গে, তাতে কি বা আসে যায়। অভীষ্ট সংকল্পের পরিণতি সম্ভাবনা আমাদের ভারি বঞ্চনা করে। সফলতার প্রত্যাশায় আমরা যত ছুটে যাই, তত দেখি

সেখানেই শেষ নয়। রাস্তার ধারের সরাইখানার মতো ওইখানে কেবল ঘোড়া বদল করে আমরা আবার চলি। আদর্শ বস্তুটি তা নয়। সাফল্য সে নিজের মধ্যেই বহন করে। প্রত্যেক স্তরে সে যে শুধু শেষ লক্ষ্যের দিকে পৌছয় তাই নয়, তার অভিপ্রায়ও সেই চলার পথেই অনুভব করে।

এঞ্জিনীয়ারের তৈরি রেলের রাস্তার মতো গাছ কখনো সোজা উপরের দিকে বাড়ে না। আমার মতো কল্পনাবিলাসীরা যেন সমাজসেবার রেললাইন পাতার জন্যে কুলি নিযুক্ত না করে। সজীব আদর্শ নিয়ে আমাদের কারবার— আমরা যেন জীবনে বিশ্বাস রাখি। নইলে আমাদের পরাভব অনিবার্য। সে পরাভব নিরর্থকতা নয়, সফলতার রূপ নিয়েই আসবে। বাস্তবতার মেফিস্‌টোফিলিস তার পিছনে বসে আছে। ধনীর রথের চাকার পিছনে ধুলোর উপর দিয়ে আদর্শবাদীকে টেনে নেওয়া হচ্ছে দেখে সে তো হেসেই খুন।

আমরা যে শান্তিনিকেতনকে এত গভীর ভালোবাসি, তার কারণ এর ক্রমপরিণতির মধ্যে আমরা সর্বদা একটি পূর্ণতার রূপ দেখে এসেছি। সহায়-সম্বলের জোরে নয়, আমাদের ভালোবাসা দিয়ে, আমাদের জীবন দিয়ে একে গড়েছি। সেখানে সফলতায় বিলম্বের জন্যে আমরা ব্যাকুল নই। কেননা তার চারি দিকে যে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, তার যে সেবা আমরা প্রতিনিয়ত করছি— এসবেই তার সার্থকতার মূর্তি বিভাসিত। আগের চেয়ে অনেক বেশি করে এখন উপলব্ধি করি, আমাদের আশ্রমের সরল জীবন কী যে সুন্দর, আর কত মহামূল্য এর! পশ্চাতের পটভূমিতে আর্থিক অনটন ও অভাব আছে বলেই সে যেন আরো মহিমোজ্জ্বল।

নিউ ইয়র্ক। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

তিন সপ্তাহের ক্লান্ত প্রতীক্ষার গুমোট কাটিয়ে আপনার চিঠির বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেগুলো আমার তাপিত চিত্তে কী সুধা ঢেলে দিয়েছে, তা কি আপনাকে বোঝাতে পারব? আমি যেন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াই, আর মেঘলোক থেকে বায়ুযানে সাপ্তাহিক রসদ হিসেবে চিঠিগুলো আমার হাতে এসে পড়ে। তাদের পাবার প্রত্যাশা মনে থাকে, তবু যেন কতকটা অপ্রত্যাশিতের আনন্দও পাই। আমি ক্ষুধার্তের মতো তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি আর অন্যদের কাছে আপনি যা লেখেন তার ভাগ নিতেও ছাড়ি নে।

আপনার চিঠিগুলো আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়। যেসব খুঁটিনাটি লোকের চোখে সাধারণত ঠেকে না, তাদের দিকে আপনার নজর পড়ে। এ জগৎ যে এমন অপরূপ সুন্দর, সে তো অপ্রয়োজনীয় জিনিসেরই যাদুস্পর্শে। এই বিরাট বিশ্বচিত্রের রঙরেখা উঁচুনিচুর বৈচিত্র্য তো এরাই আনে। সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির দীপ্তসূর্যের মতো অনাবৃত প্রকাশ। সেই বস্তুপুঞ্জ আসে বিশ্বকর্মার বিরাট ভাণ্ডার থেকে। কিন্তু বিনাপ্রয়োজনের তুচ্ছ উপকরণেই আমাদের জীবনাকাশের পরিমণ্ডলটি গড়া। প্রখর সূর্যের আলোককে বিচ্ছুরিত করে চারি দিক রঙিন স্নিগ্ধ সুকোমল করে তোলে তারাই।

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস তুলে দেবার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছেন। বেশ তো, সেটা যাওয়াই তো ভালো। তার প্রতি আমার কোনো দরদ নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, নাটকের শেষ পরিণতি যেন সুখের হয়। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসটা সর্বদা আমাদের আশ্রম-নাটকের পঞ্চম অঙ্ক হিসেবেই ছিল— তার পরিণতি হয়েছে ট্র্যাজেডিতে। এর ভয়াবহতা আরো বেড়ে যাবার আগেই চলুন এতে আমরা যবনিকা টেনে দিই।

নীচের কবিতাটির অনুবাদ সঙ্গে পাঠাচ্ছি—

নারী

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব হেমঝারি,
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর করো সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।
এসো সুন্দরী নারী,
শিরে লয়ে হেমঝারি।

নিউ ইয়র্ক। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিবর্ধক-কাচের মতো অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও মস্ত বড়ো করে দেখায়। এর ঘরবাড়ি ব্যাবসা-বাণিজ্য আমোদ-প্রমোদ— সবেতেই আতিশয্য। পশ্চিমের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি তাঁর নিজের চেয়েও উঁচু গোড়ালির বুটজুতো পরে খুব খুশি।

এ মহাদেশে আসার পর চক্রবৃদ্ধিহারে সংখ্যা বাড়ার তত্ত্বজ্ঞান আমার অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাকে আর আমি সাধারণ শোভনসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারছি নে। বিশ্বাস করুন, কল্পনায়ও এ বোঝা বয়ে বেড়ানো বড়োই ক্লান্তিকর।

গতকাল হঠাৎ শান্তিনিকেতনের কয়েকখানি ছবি আমার হাতে এল। মনে হল এই ব্রবডিঙন্যাগ রাজ্যে দীর্ঘকালের দুঃস্বপ্ন থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠলুম। মনে মনে বললুম— এই আমাদের শান্তিনিকেতন, এ আমাদেরই। কোনো যন্ত্র দিয়ে এ তো গড়া নয়। সত্য যা তা স্বভাবতই সুন্দর— আমাদের দেশের মেয়ের মতো। পায়ে উঁচু গোড়ালির জুতো পরে সে নিজেকে লম্বা দেখাবার চেষ্টা করে না। কৃতকার্যতায় বা বিপুলতায় সুখ নেই, সুখ আছে সত্যে।

এ দেশে আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় এই দেখে যে, এখানকার লোকেরা জানেও না যে, তারা সুখ পায় নি। বালুকাময় মরুভূমির যে চাকচিক্যের গর্ব, এদেরও তাই। মস্তবড়ো এই সাহারা, তবু এ থেকে আমার মন সরে আসে, গান গায়—

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made ;
Nine bean rows will I have there, a hive
for the honey bee
And live alone in the bee-loud glade.

বর্তমান যুগে যানবাহনের এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কবির সেই ইনিসফ্রীতে যাওয়া সহজ হয় নি। অনুসন্ধিৎসু মানুষ মধ্য আফ্রিকা কি সুমেরু বা কুমেরু সর্বত্র পথ খুঁজে বের করছে। কিন্তু ইনিসফ্রীর রাস্তা আজও চিররহস্যে ঘেরা।

আমি কিন্তু সে ইনিসফ্রী দ্বীপেরই অধিবাসী। তার যথার্থ নাম হল শান্তিনিকেতন। তাই তাকে ছেড়ে যখন পশ্চিমে চলে আসি, তখন আমার

মাঝে মাঝে মনে ভয় হয়। ভাবি, সেখানে ফিরে যাবার পথ যদি না খুঁজে পাই!

কিন্তু আমাদের শালবীথি, শিউলিবিতানে শরতের স্পর্শ, বর্ষা-সন্ধ্যায় গানের-সুরে-ভরা দিনুর ছোট্ট ঘরখানি— এসব কত সুন্দর, কত মনোহর!

And I shall have some peace there,
for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning
to where the cricket sings;
There midnight's all a glimmer
and noon a purple glow,
And evening full of linnet's wings.

সপ্তম পর্ব

ভূমিকা

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন দুর্বার গতিতে ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিকে বর্জন করার আবেদন কলকাতার ছাত্রসমাজকে এমন ভাবে অভিভূত করে যে হাজারে হাজারে ছাত্র বেরিয়ে এল। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বৈদ্যুৎ-শক্তিতে ভরে গিয়ে আকাশে বাতাসে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল।

কবিকে যে চিঠিগুলি আমি তখন লিখেছি, তাতে এ-সব কথাই লেখা থাকত। তা ছাড়া সাময়িক উত্তেজনায় আমি নিজেও আর আত্মস্থ থাকতে পারি নি। সপ্তাহে সপ্তাহে আমি তাঁকে যে খবর পাঠিয়েছি তারই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাঁর চিঠিগুলিতে।

ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভালো হলে পর আমেরিকার দিনগুলো কবির কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর লেখায়ও লাগে আনন্দের সুর। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিনি বেশি আনন্দ পেলেন। সেখানে সকল শ্রেণীর লোকের চিত্তের ঔদার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সংক্ষেপে এটুকু বলে নিয়ে এখন আমি যে চিঠিগুলি উদ্ধৃত করব, সেগুলি বেশ সহজবোধ্য হবে, আর তাঁর যা বক্তব্য, ওর মধ্যেই আমরা পাব।

ইউরোপে যাবার পথে প্রতিদিন তিনি আমার কাছে একখানা করে চিঠি লিখতেন। আবার ভারতে ফেরার পথেও ঠিক তাই করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে তাঁর চিঠির বাক্স থেকে সব বের করে কৌতুকের হাসি হেসে আমার হাতে তুলে দিলেন। জাহাজে বসে লেখা চিঠিগুলোর ইতিহাস হল এই।

নিউ ইয়র্ক। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

এইমাত্র প্রবাসীতে ছাপানো আমাদের এক আশ্রমবাসীর লেখা পত্রখানি পড়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। দেশাত্মবোধের অত্যন্ত ইতর দিক এটি। স্বাদেশি-কতার আবেগ ক্ষুদ্রচেতা মানুষকে মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ থেকে চ্যুত করে। নিজের স্বার্থবোধকে সে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে যে, তার সঙ্গে ইতরতা নিষ্ঠুরতা লোভ— সবই উগ্র হয়ে ওঠে। দেবতার আসনে নিজের দম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করতেও তার বাধে না।

বর্তমানকালে সমস্ত পৃথিবী এভাবে অপদেবতার পূজা করে যাচ্ছে। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, পাশ্চাত্যদেশে এই বীভৎস পূজার অজস্র উপচার দেখে আমি কত যে বেদনাবোধ করছি। এশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব প্রচার ও তার অপবাদ চতুর্দিকে ছড়াবার উদ্দেশে রীতিমত একটা অভিযানের সৃষ্টি হয়েছে। আইনসংগতভাবে তাদের ভোটের অধিকার দাবী করছে বলে নিগ্রোদের নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। জার্মানরা নিন্দিত হচ্ছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচার চলছে। জনমনের চোরাবালির উপর এরা মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে রাজনৈতিক সভ্যতার বিরাট সৌধ গড়ে তুলতে চায়। সর্বক্ষণ ঘৃণা বিদ্বেষ ঈর্ষা ও মিথ্যার কারবার নিয়েই এদের জীবন কাটে।

ভয় হচ্ছে, ভারতে ফিরলে পরে সবাই আমাকে ত্যাগ করবে। মাতৃভূমিতে ফিরে একাকী নির্বাসন আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। এখন আমার দেশের লোকের মনের যে অবস্থা— আমাকে তারা সহ্য করতে পারবে না। কারণ, আমি যে আমার দেশের চেয়ে বিশ্বদেবতাকে বড়ো বলে মানি।

আমি জানি, এরকম অধ্যাত্মবোধ রাজনৈতিক সার্থকতা হয়তো আনে না। কিন্তু তখনই আবার নিজেকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিই— যা ভারতবর্ষ এতকাল বলে এসেছে— ততঃ কিম্?

এ দেশে যত বেশিদিন কাটছে ততই মুক্তির অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট হচ্ছে। আর ভরসা রাখি মুক্তিকামী এই নবাগত যুগকে সযত্নে পোষণ এবং তার মহান ভবিষ্যৎকে ফলবান করার উদ্দেশে ভারতমাতা জ্ঞানের অমৃতে তাঁর স্তন পূর্ণ রাখবেন।

রাজনীতিবিদ্‌রা এখনো যে-সব ধারণা আঁকড়ে আছেন, সে-সবের দিন গেছে। সেগুলি এখন গতযুগের ভগ্নাবশেষ— বিলুপ্তির পথে তার গতি।

পশ্চিমের মনেও তার নিরাপদ আশ্রয় সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে যে নূতন বন্দরের পথে পাড়ি দেবে সেরকম মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। অথচ আমরা দুর্ভাগারা সাঁতরে নদী পার হয়ে সেই অর্ধনিমগ্ন জাহাজের এক কোনায় নিজেদের জায়গা করে নেব বলে যুঝতে প্রস্তুত হচ্ছি। কিন্তু আমি জানি, আমাদের কুঁড়েঘরগুলো সেই তীরে তীরে ভেসে-চলা হতভাগ্য দানবপোতের চেয়ে অধিক সুরক্ষিত।

অশান্তির অন্তরে যে সুমহান শান্তি— তার কামনা আমার আজও মেটে নি। এতদিনে বুঝি আমার কাজ সাঙ্গ হল। মন বলে, আমার যিনি প্রভু, এবার তিনি আমাকে একান্তে বসতে দেবেন— তাঁর বাণী নয়, এই অবসরে তাঁর অসীম নীরবতা কান পেতে শুনব বলে।

হাউসটন। টেক্সাস। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

কর্মের রথচক্রে বাঁধা থেকে আমরা জন্মজন্মান্তরে ঘুরে বেড়াই। সেই ঘুরে বেড়ানো একটি মানুষের আত্মার পক্ষে যে কত মর্মান্তিক, তা আমি গত কয়েক-দিন ধরে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার কর্মপরিচালনকর্তা কী উৎপীড়ন করেই যে আমাকে এখন এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই স্থানান্তরের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে পুলম্যান-কারে আমার ঘুমের ব্যবস্থা। সেই গাড়ির নাম শুনলেই মৃত্যুদূতের কথা মনে আসে। হোটেল-বাসের চক্রাবর্তন সমাপ্ত করে আবার কতদিনে যে আমার উত্তরায়ণের চিরশান্তির মধ্যে নির্বাণলাভ করব, তারই স্বপ্ন দেখি।

অনেকদিন আপনাকে লিখতে পারি নি— মনে হয় যেন এখন আমি ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছেছি। তবু টেক্সাসে এসেই বোধ করছি শীতের বরফ-দুর্গের ফাটল দিয়ে যেন আমার জীবনে হঠাৎ বসন্তের আবির্ভাব হল। উপলব্ধি করলুম, মহাকাশ হতে আলোর কলস ভরে ভরে যে প্রসাদ নিত্য ঝরে পড়ে, আমার আত্মায় তার তৃষ্ণা কত প্রবল হয়েছিল। এখন আকাশ আমাকে চতুর্দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে, তার আতপ্ত আলিঙ্গনে আমি আনন্দে আত্মহারা।

শিকাগো। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

একটি ডাচ স্টিমারে জায়গা ঠিক করেছি। সেটি ১৯ মার্চ নিউ ইয়র্ক থেকে ছাড়বে। এ দেশে আমার দিনগুলি বিশেষ আনন্দে কাটে নি। তাই সোজা দেশে চলে যাওয়াই আমার পক্ষে ঠিক কাজ হত।

তবে কেন আমি তা করি নি? যে নির্বোধ সে কি বলতে পারে কেন সে নির্বুদ্ধিতা করে? প্রায়ই মনে মনে সেই সময়কার স্বপ্ন দেখি, যখন আমার স্বেচ্ছাচারী যৌবন পদ্মার চরের নির্জনতায় আমাকে নিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াত। সেখানে বুনো হাঁসের রাজ্যে যখন ঘুরেছি, সন্ধ্যাতারা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। অবশ্যই সে জীবন প্রকৃতিস্থ লোকের জীবন নয়, তবু সেই স্বপ্নভরা জীবনই নাটকের বিদূষকের পোশাকের মতো আমার সর্বাঙ্গে খাপ খেয়ে যেত। যে অবোধ বিনা-কাজে পরম সন্তোষে দিন কাটায়, সে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পায়। কিন্তু নিছক পৃথিবীর উপকার করবে বলে কোমর বেঁধে বসে যে বাতুল, তার মনে শান্তি কোথায়? আমি সেই বুনো হাঁসের রাজ্যেই ফিরে যেতে চাই। অথচ পাগলা দখিন হাওয়ার মতো এই-সব শিল্পনগরীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর এটর্নি-আপিসের দলিলের পাতাতেই কেবল নাড়া দিচ্ছি। যে ফুলটি ফোটার জন্যে প্রেমের গুঞ্জনের অপেক্ষা রাখে, এ-সব পাতার আড়ালে যে সেটি নেই তা কি এই নির্বোধ বোঝে না? কবি ছাড়া অন্য কিছু হবার আমার প্রয়োজনই বা কি? আমি কি বাঁশি-বাজিয়ে হয়ে জন্মাই নি?

শিকাগো। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

অনেক সময় মনে ভেবেছি, এ পৃথিবীতে আমার পথ কি সৎকর্মের পথ? যেদিন এলেম এই মর্তলোকে, হাতে ছিল কেবলমাত্র একটি বাঁশের বাঁশি, সংগীত সৃষ্টিতেই যার একমাত্র মূল্য। স্কুল ছেড়েছি, অন্যসব কাজে অবহেলা করেছি। কিন্তু বাঁশিটি আমার হাতেই ছিল, সেটি খেলার ছলে নিত্যই বাজিয়ে গেছি। সঙ্গে আমার একমাত্র খেলার সাথী যিনি ছিলেন তিনিও গাছের পাতায়, ঘাসে, জলের ঢেউয়ে, তারাভরা আকাশের নিস্তব্ধতায়, মানবজীবনের হাসিকান্নার আলোছায়াতে কেবলই সংগীত সৃষ্টি করে চলেছেন। এই সুরকার যতদিন আমার সঙ্গী ছিলেন ততদিন আমি ধরিত্রীর একেবারে বুকের কাছে ছিলুম। আমি তার ভাষা বুঝতুম। আর আমার প্রাণ যা গাইত— তার তালে বাতাসে

জলে আকাশে আলোয় নটরাজের নাচেও দোলা লাগত।

আমার সেই স্বপ্নরাজ্যে এখন ইস্কুল-মাস্টারের আবির্ভাব হয়েছে। আমিও মূঢ়ের মতো তার নির্দেশ মেনে বসে আছি। বাঁশিটিকে একপাশে সরিয়ে রেখেছি, আর সেই চিরশিশুটি— বিশ্বসাগরের কূলে কূলে যাঁর অনন্তকালের খেলা — তাঁর সেই খেলার জগৎ আমি ছেড়ে এসেছি। তাই এমন প্রবীণ হয়ে পড়েছি যে, এখন কেবল জ্ঞানের বোঝা পিঠে করে দ্বারে দ্বারে সত্যের ফেরি করে ফিরি।

নিজেকে প্রশ্ন করি, কেন এই বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে? এই হট্টগোলের মধ্যে যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পদের উৎকর্ষ সজোরে ঘোষণা করছে, আমিও কেন তাদের সঙ্গে তারস্বরে চীৎকার করতে যাব? এই যে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রচারের গাড়ি ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এই কি কবির জীবনের শেষ পরিণাম? মনে হয়, এ একটি দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ মধ্যরাতে জেগে উঠে অন্ধকারে বিছানা হাতড়ে বলে উঠি, কোথায় গেল আমার গান?

সে তো হারিয়ে গেছে। অথচ তাকে হারানোর অধিকার আমার ছিল না, কারণ তাকে তো নিজের শ্রমে আমি অর্জন করি নি। সেই আমার স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনা— সে যে পরম দান। প্রেমের মর্যাদা দিলে তবেই তাকে ধরে রাখতে পারতেম। আপনি জানেন এক জায়গায় আমি বলেছি—

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান॥

প্রভুর মান— সে তো পুরস্কার। যে কাজ করি তা দিয়ে তাকে মাপা যায়। কিন্তু ভালোবাসা, সে যে অধরা, সে যে অপরিমেয়।

যে কবি নিজের আদর্শের কাছে খাঁটি থাকে, সে পায় প্রেমের বরণ-মালা। কিন্তু যে কবি সৎকর্মের পথে চলে যায়, তার ভাগ্যে ক্ষণিকের প্রশংসা ছাড়া কিছুই জোটে না।

আমি যে আবার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি— সে এক বিরাট কাজ। কিন্তু এ দিকে হারিয়ে বসেছি আমার জীবনের সূক্ষ্ম রাগিণীটি—

সে ক্ষতির পূরণ তো আর কোনো কালেই হবে না। মনে হয়, আবার যদি আমার বাঁশিটিকে ফিরে পাই, আর কর্মব্যস্ত বিজ্ঞ লোকের দল ঘৃণায় অবহেলায় অপদার্থ বলে আমাকে ত্যাগ করে যায়, তবেই আরাম পাই।

আমার বিগত জীবনের সে মধুর প্রচ্ছন্নতা, যেখানে ফুল ফুটত আর গান বলে উঠত, সেখানে আর ফিরে যেতে পারব না ভাবতেই আমার মন কেমন করে। সেই সুধালোক আমাদের কত কাছে, অথচ কোন্ সুদূরে। তার অন্তরমহলে প্রবেশ এক দিকে যেমন সুগম, অন্য দিকে তেমনই তার বাধা। সহজসুখ পেয়েও আমরা আনমনে হারাই— কারণ ও যে দুর্লভ তা কি জানি?

শিকাগো। ২ মার্চ ১৯২১

আপনার গত পত্রে কলকাতার ছাত্রদের সম্বন্ধে অতি সুসংবাদ পাওয়া গেল। আশা করি এমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মোৎসর্জন ও দুঃখভোগের ইচ্ছা ক্রমশ বাড়বে। এতেই চরম সার্থকতা। স্বাধীনতা বলতে এই বুঝি। জাতির সমৃদ্ধিই বলুন আর মুক্তিই বলুন— এই যে মহৎ আদর্শ এবং মনুষ্যত্বের প্রতি নিষ্কাম আকর্ষণ, এর চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই।

পার্থিব শক্তি ও সম্পদে পশ্চিমের পরম আস্থা। তাই শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য যত উচ্চ চীৎকারই সে করুক না কেন, তার হিংস্র হুঙ্কার আর নখদন্তপুচ্ছের আস্ফালন উচ্চতরই হয়ে উঠবে। বন্যাতাড়িত মাছের মতো সে আকাশে উড়তে চায়। আইডিয়াটি চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু মাছের পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়। আমরা ভারতীয়রাই জগৎকে দেখাব কোন্ সত্যবলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হয়, এবং শুধু তাই নয়, তাকে শক্তিতে পরিণত করা যায়।

পশুশক্তির চেয়ে যে আত্মিক শক্তি প্রবল তা প্রমাণ করবে নিরস্ত্র লোকেরাই। বিবর্তনের ধারায় মানুষ তার দেহের প্রকাণ্ডতা, তার চর্মাবরণের স্থূল কাঠিন্য, তার দন্তনখরের ভীষণ অস্ত্রসজ্জা— সব ত্যাগ করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মানুষই পশুরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। শীঘ্রই সেদিন আসবে, যখন আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান অথচ কোমল-দেহ নিঃসহায় মানুষ দুর্ভেদ্য রণতরী ও বিমানবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই প্রমাণ করবে — যারা নম্রনত— এ পৃথিবী অধিকার করে তারাই।

মহাত্মা গান্ধী, যাঁর দেহ ক্ষীণ এবং পার্থিব সম্পদে যিনি একেবারেই রিক্ত,

তিনিই যে ভারতের লাঞ্ছিত অপমানিত জনসাধারণের মধ্যে অবরুদ্ধ দুর্নিবার শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? ভারতের ভাগ্যবিধাতা আত্মার শক্তিকেই সহায় বলে বরণ করেছেন, শারীরশক্তিকে নয়। সেই ভারতই আবার মানুষের ইতিহাসকে পার্থিব সংঘাতের কর্দমাক্ত পথ থেকে আত্মিক শক্তির সুমহান স্তরে উন্নীত করবে।

স্বরাজ বলতে কি বুঝি? সে তো মায়া। কুহেলির মতো মিলিয়ে যায়, অমৃতের অমলজ্যোতিতে একটি রেখাপাতও করতে পারে না। পশ্চিমের কাছ থেকে কয়েকটি বুলি শিখে যতই নিজেদের ভোলাই না কেন, স্বরাজ আমাদের শেষলক্ষ্য নয়। আমাদের এই সংগ্রাম আধ্যাত্মিক— এ সংগ্রাম মনুষ্যত্বলাভের। জাতীয় আত্মম্ভরিতার নিদর্শন হয়ে যত সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার জালে মানুষ নিজেকে জড়িয়েছে। সে সবের হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। প্রজাপতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, গুটির আশ্রয়ের চেয়ে আকাশে স্বাধীনভাবে সঞ্চরণের মূল্য অনেক বেশি। আমরা যদি সবলকে সশস্ত্রকে সম্পদ্‌বানকে অগ্রাহ্য করতে পারি তবেই আত্মার শক্তি যে অজেয় অমর— বিশ্বজগৎ তার প্রমাণ পাবে। তারই বলে দৈহিক শক্তির দানবীয় প্রাসাদ ধূলিসাৎ হবে। তাতেই মানুষ যথার্থ স্বরাজ লাভ করবে।

আমরা প্রাচ্যের লোকেরা— অন্নাভাবে ক্লিষ্ট জীর্ণ চীর পরা সাধারণ মানুষ —আমরাই সমগ্র মানবজাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব। আমাদের ভাষায় 'নেশন' কথাটির কোনো প্রতিশব্দ নেই। যখন এই শব্দটি অন্যদের কাছ থেকে ধার করে আমরা ব্যবহার করি, সেটা আমাদের পক্ষে ঠিক খাটে না। কারণ আমরা সন্ধি করব নারায়ণের সঙ্গে, নারায়ণী সেনার সঙ্গে নয়। তাই আমাদের যে জয়, সে ভগবৎ-রাজ্যেরই জয়। পশ্চিমকে আমি দেখেছি। যে অপবিত্র ভোজে সে সর্বদা মত্ত, যার ফলে ক্রমশ স্ফীত ও আরক্তিম হয়ে উঠছে, অর্থহীন প্রলাপে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে— তাতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। জ্বলন্ত মশালের আলোয় মধ্যরাত্রের এই যে মত্ততা, তা আমাদের জন্যে নয়। আমাদের রয়েছে শান্ত উষার অরুণ রাগে নবজাগরণ।

শিকাগো। ৫ মার্চ ১৯২১

আজকাল ভারতবর্ষ থেকে আমি অনেকগুলো খবরের কাগজ আর কিছু কাটিং পাচ্ছি। সেসব থেকে ওখানকার আলোড়নের রূপ অনুমান করে আমার মনে একটা দুঃসহ সংঘাত উপস্থিত হচ্ছে। দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে বহু দুঃখ ভোগ করতে হবে, এমন একটা পূর্বাভাসও পাই। যে উচ্চ কলরোলে আজ সারাদেশ আন্দোলিত, তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও যোগ দেবার একান্ত চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সত্তার গভীরে যেন সেই ইচ্ছাকে প্রতিহত করার একটি শক্তি স্থান করে নিয়েছে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তাকে নড়াতে পারি নি। এর সুস্পষ্ট কোনো জবাব তো খুঁজে পাই নে। সেই হতাশার অন্ধকারের মধ্যে একটি মধুর হাসি আর একটি স্বর ভেসে ওঠে— শুনি, তোমার স্থান জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুদের মধ্যে। সেখানেই তোমার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। সেখানে আমি আছি তোমার সখা।

তাই আজকাল নতুন ছন্দ তৈরির খেলায় মেতেছি। এগুলো কিছুই না। সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে সূর্যালোকে নেচে উঠে হাসতে হাসতে মিলিয়ে যাওয়াতেই এদের সন্তোষ। কিন্তু যখন আমি এই খেলা করি, সমগ্র সৃষ্টি তাতে আনন্দিত হয়। কারণ ফুল আর পাতার মধ্যে কি অন্তহীন ছন্দরচনা চলে না? আমার সৃজনকর্তা কি চিরকাল কেবলই সময় নষ্ট করছেন না? অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রতারাকে তিনি কালের ঘূর্ণির মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন। তাঁর খেয়াল-খুশিতে ভরা যুগযুগান্তরের কাগজের নৌকো তিনি প্রকাশের স্রোতে ভাসিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি যখন আবদার করে বলি, আমিও তাঁর ক্ষুদ্র সহচর হব, তাঁর বিচিত্র খেলার নৌকোয় নানা ছন্দে গড়া আমারও দু-একটা খেলনা যেন তিনি তুলে নেন— তখন তাঁর মুখে স্মিতহাস্যের আভাস দেখতে পাই। খুশি মনে আমি তাঁর বসনপ্রান্ত ছুঁয়ে পিছু পিছু চলি।

কিন্তু জনতার ভিড়ের মধ্যে কোথায় আমি? পিছনের ঠেলায় চারি দিকের চাপে যেন পিষে যাই। আমার চারপাশে এই কোলাহল কিসের? এ যদি গান হয় তবে সেতারে তার সুর ধরে নিয়ে আমিও তাতে যোগ দিতে পারি। কারণ আমি তো গায়ক। আর তা যদি চীৎকার হয়, আমার গলা ভেঙে যায়, আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। এই কদিনের মধ্যে একটি সুর ধরারই কেবল চেষ্টা করছি। তারই আশায় কান পেতে রয়েছি। / কিন্তু অসহযোগের ভাবটি তার শব্দের

শুরু আওয়াজে বেসুরে বাজে, গান তো আনে না। বরং সব নিষেধের বাধা একত্র হয়ে সে যেন তর্জনধ্বনি। সসংকোচে আমি নিজেকে বলি, স্বদেশের ইতিহাসের এই সংকটমুহূর্তে তুমি যদি দেশবাসীর সঙ্গে পা মিলিয়ে না চলতে পার, তবে মনে কোরো না যে আর সবাই ভুল করছে, তুমিই কেবল ঠিক পথে চলেছ। বরং সৈনিকের পদ থেকে অবসর নাও, কবি হিসেবে নিজের ঘরের কোনায় গিয়ে বোসো। জনসমাজে শ্লেষ বিদ্রূপ পাবে— সেজন্যেও প্রস্তুত থাকো।

রথী বর্তমান আন্দোলনের সপক্ষে বলতে গিয়ে প্রায়ই বলেন, কোনো কিছুর প্রবর্তনকালে, সেই আদর্শ গ্রহণের চেয়ে বর্জনের স্পৃহাই প্রবল থাকে। কর্মের গতি সেই পথেই চলে জানি, তবু একেই আমি সত্য বলে মানতে পারি নে। একবার যদি নেশার সাহায্যে শক্তি বাড়াতে চাই, তবে দেহের স্বাভাবিক শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে বারবার সেই দৈত্যের কাছে গিয়েই ভিক্ষা করতে হয়। সে শক্তির জোগান দেয় বটে, সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের তলাও ধ্বসিয়ে দেয়।

ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ অর্থাৎ বিলুপ্তি। বলা যেতে পারে, এ দুটো নামে ভিন্ন, তবে একই জিনিস। কিন্তু নামের মধ্য দিয়েই আমরা মনের বিভিন্ন ভঙ্গী ও সত্যের বিশেষ বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। মুক্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সত্যের অস্তিত্বের দিকে আর নির্বাণ করে তার বিপরীত দিকে।

ওঁ— অর্থাৎ শাশ্বত হাঁ— বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, নাস্তিবাদের পথে, অস্তিত্বকে ধ্বংস করেই আমরা স্বাভাবিকভাবে সেই সত্যে পৌঁছব। সেইজন্য তাঁর দুঃখবাদ দুঃখনিবৃত্তির উপরই জোর দেয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আনন্দকেই লাভ করতে চায়। অবশ্য তার পরিপূরক হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের তপশ্চর্যারও প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মসাধনায় ব্রহ্মের উপলব্ধি সতত অন্তরে জাগ্রত রাখতে হয়, কেবলমাত্র চরমপ্রাপ্তিতে নয়।

অতএব দেখতে পাই, বৌদ্ধযুগের জীবনচর্যার শিক্ষার পদ্ধতি ছিল বৈদিক-যুগ থেকে স্বতন্ত্র। বৈদিকযুগের শিক্ষা ছিল জীবনের আনন্দকে পূতপবিত্র করে তোলা আর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ছিল আনন্দকেই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেওয়া। চিরকৌমার্যগ্রহণ এবং আরো নানারকমে জীবনকে অঙ্গহীন করা

বৌদ্ধধর্মের অস্বাভাবিক কঠোর তপশ্চর্যার ফলেই আসে। কিন্তু তপোবনের ব্রহ্মচারীর জীবন মানুষের সামাজিক জীবনের বিরোধী নয়, বরঞ্চ তার সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ। আমাদের দেশের তানপুরার মতো সংগীতের মূলস্বরগুলিকে সে ধরে রাখে, অসংগতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। তপোবনের আদর্শ আত্মার পূর্ণাঙ্গ সংগীতেই বিশ্বাস করে। তাই আত্মনিগ্রহ নয়, নির্দিষ্ট পথে চালিত করাই ছিল তার লক্ষ্য।

অসহযোগের ভাবটি হল রাজনৈতিক উগ্রতপস্যা। আমাদের ছাত্রেরা এই যে আত্মনিবেদন করছে, সেটা কার কাছে? পূর্ণতর শিক্ষার কাছে তো নয়, বরং অশিক্ষার কাছে। এর পশ্চাতে আছে আত্মবিনাশের ভয়ংকর আনন্দ। এর মনোহর দিক হল সন্ন্যাসের দিক। আর এর কুৎসিত দিকটা দেখেছি আমরা গতযুদ্ধে এবং আরো কয়েকটি ভয়াবহ ব্যাপারে যেখানে মানুষ স্বাভাবিক জীবনের সত্যে বিশ্বাস হারিয়ে অনর্থক লুণ্ঠন ও বিধ্বংসে অহেতুক আনন্দ বোধ করেছে। 'না' শব্দটি তার নিষ্ক্রিয়তার দিক থেকে বোঝায় ত্যাগের উগ্রতা আর সক্রিয়ভাবে বোঝায় হিংস্রতা। ঝড়ের সমুদ্রে যেমন মরুভূমিতেও তেমনি একই হিংসার আকার দেখতে পাই, কারণ এরা উভয়েই প্রাণের বিরোধী।

সেদিনের কথা মনে পড়ে, স্বদেশীযুগে যেদিন বিচিত্রাবাড়ির দোতলায় একদল ছাত্র আমার কাছে এল। তারা বললে, আমি আদেশ করলে এখনই তারা স্কুল কলেজ ছেড়ে দেবে। আমি খুব জোর দিয়েই তাতে আপত্তি জানালেম। তারা রাগ করে চলে গেল। আমার দেশাত্মবোধ যে অকৃত্রিম সে বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল। অথচ জনসাধারণের এই উত্তেজনার পূর্বে যখন নিজের বলতে আমার পাঁচটি টাকাও ছিল না, তখন আমি স্বদেশী-ভাণ্ডার খোলার সাহায্যে এক হাজার টাকা দিয়ে তীব্র শ্লেষ ও ক্ষতি স্বীকার করেছি।

ছাত্রদের সেরূপ কোনো উপদেশ দিতে আমি রাজী হই নি, তার কারণ, এই নিষ্ফল শূন্যতা আমাকে কোনোদিনই প্রলুব্ধ করে না, সে যদি স্বল্পকালের জন্য হয় তবুও না। এরূপ অবাস্তবতাকে আমি ভয় করি। এ সব ছাত্রেরা আমার চোখে নিছক ছায়ামূর্তি নয়। তাদের জীবন যেমন তাদের কাছে তেমনই সর্বমানবের অধিদেবতার কাছে পরম মূল্যবান। ওদের জীবনের মূল শীর্ণ হলেও, যে বর্জননীতি কর্মধারা থেকে ওদের উচ্ছেদ করবে, তার দায়িত্ব

আমি গ্রহণ করতে পারি নে। কোনোরূপ সার্থক ব্যবস্থা না করে যদি তাদের জীবনগতি ব্যাহত করা হয়, তবে যে ক্ষতি হয়, তার পূরণ কোনো কালেই হবে না। সমষ্টিগত তত্ত্ববিচারে হয়তো এই ক্ষতি কিছুই বিশেষ মনে হবে না— কারণ সত্যের ক্ষুদ্রতম অংশও যে মহামূল্যবান, বিমূর্ত কাল্পনিকতা এই বোধকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আমি যদি সেই 'জ্যাক' হতে পারি, আর অ্যাবস্ট্র্যাকশান-দৈত্যের নিধনই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিই, তবে বেশ হয়। সেই দৈত্যই তো ব্যক্তিবলির দাবী জানিয়ে ছলনার মুখোশ পরে সারা পৃথিবীর লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে।

বারবার বলি, আমি কবি, স্বভাবে আমি যোদ্ধা নই। নিজের চারি দিকের সঙ্গে যুক্তাত্ম হবার জন্যে আমি সব ছাড়তে রাজী।

মানুষকে আমি ভালোবাসি, তাদের ভালোবাসার মূল্যও আমার চোখে অপরিসীম। তবু বিধির বিধানে বিপরীত স্রোতের মুখে আমাকে তরী ভাসাতে হয়। অদৃষ্টের একি বিড়ম্বনা! সমুদ্রের অপরপ্রান্তে যখন অসহযোগ প্রচার করা হচ্ছে, তখন এই প্রান্তে বসে আমি পূর্বপশ্চিমের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বাণী শোনাচ্ছি।

আপনি জানেন, যেমন রক্তমাংসের শরীরটাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে আমি মানি নে, তেমনি পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাতেও আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরটাকে পীড়ন করায় এবং জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রতি অবহেলাতে আমার বিশ্বাস আরো কম। যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হল মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও অধ্যাত্মপ্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, ভিত্তি এবং অবয়বে সমতারক্ষা। পূর্বপশ্চিমের মিলনে আমি বিশ্বাসী। প্রেমই হল আত্মার পরম সত্য। সেই সত্যে যেন কোনো মলিনতা স্পর্শ না করে। শত বাধায়ও বিচলিত না হয়ে আমরা যেন সেই নিরঞ্জন সত্যের জয়পতাকা বহন করি। অসহযোগের ভাবটি এই সত্যে অযথা আঘাত হানে। তাই তাকে আমাদের গৃহদীপ বলতে পারি নে— গৃহদাহের আগুন বরং তাকে বলা যায়।

নিউ ইয়র্ক। ১৩ মার্চ ১৯২১

যা কিছু চিরস্থির, তার কোনো দায়দায়িত্ব নেই, আইনকানুনও নেই। মৃত্যুর পক্ষে স্মৃতিপ্রস্তরটুকুও বাহুল্যমাত্র। কিন্তু চিরস্পন্দমান যে জগৎ একটি

আইডিয়ার প্রতি ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে, তার সব নিয়মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের ভাব থাকা চাই। সেটিই হল সৃজনের মূলনীতি।

✓সহযোগিতার ভাবটি আবিষ্কার করে তবে মানুষ বড়ো হতে পেরেছে। এতে তাকে বহু লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে চলায় সাহায্য করেছে। বিশ্ব-ভুবনের চলার তালে পা মিলিয়ে সে তার কাছ থেকে গতি ও বেগ শিখেছে। সে সহজেই বুঝে নিয়েছে এই সঙ্গে চলাটি কেবল অভ্যাসবশে চলা নয়, কোনো সুবিধার প্রত্যাশায় বাহ্যিক নির্দেশেও চলা নয়। কবিতায় ছন্দের যা কাজ, এর কাজও তাই। ভাবগুলি এলোমেলো ছুটে যাবার ভয়ে বেড়া দেওয়া নয়, বরং তাদের সজীব সচল করা, সৃষ্টির মধ্যে তাদের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করাই তার কাজ।

এই সহযোগিতার চর্চা এতকাল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় গড়েছে। তার পরিবেষ্টনীতে শান্তি ব্যাহত হয় নি— বরং জীবনধারা সেখানে বিচিত্ররূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই সীমানার বাইরে সংযুক্ত হবার কোনো উদ্যোগ হয় নি। তার ফলেই এই বিরাট পৃথিবীর জনসমাজ প্রতিনিয়ত বিরোধের আগুনে জ্বলছে।

এতদিনে আমরা এ সত্য আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের যে সমস্যা, তা জগৎজোড়া। পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ জাতি অন্যদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছুতেই মুক্তি পাবে না। হয় আমাদের একসঙ্গে বাঁচতে হবে, নয়তো একসঙ্গেই ধ্বংসের মুখে তলিয়ে যেতে হবে।

✓ বিশ্বের সব মহামনীষীরাই এ সত্য মেনেছিলেন। মানুষের আত্মা যে এক এবং অবিচ্ছিন্ন, সে সম্বন্ধেও তাঁরা সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা তাই ছিল উদার। বুদ্ধদেবের ভারতবর্ষ তাই ভৌগোলিক ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে এবং যীশুখ্রীস্টের ধর্মও ইহুদী ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করেছে।

আজ পৃথিবীর ইতিহাসের এই সংকটমুহূর্তে ভারতবর্ষ কি তার দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে সকল জাতির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করতে পারে না? যাদের বিশ্বাস ক্ষীণ তারা বলবে ভারতবর্ষ নিজে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হলে তবে সমগ্র জগতের কাছে তার বাণী পৌছবে। আমি কিন্তু কিছুতেই সেকথা মানব না। বর্তমান যুগে মানুষের মহত্ত্বের মাপকাঠি যে কেবল বস্তুগত উপকরণে— এ ভয়ানক একটি ভ্রম। এতে মনুষ্যত্বের অবমাননা। এই ভ্রম

অপনোদন করতে পারে তারাই, পার্থিব সম্পদ যাদের কিছুই নেই। নিজের অভাব ও দৈন্য সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের উদ্ধার ভারতেই সম্ভব।

ব্যক্তির মধ্যে যে বন্ধনহীন অহমিকা দেখতে পাই, তা যথার্থ স্বাধীনতা নয়, তা স্বৈরাচার। কারণ মানুষের মধ্যে যা সর্বজনীন, তাই সত্য। যথার্থ স্বাধীনতা মানুষ তখনই লাভ করে যখন মনুষ্যত্বকে সে সত্যভাবে উপলব্ধি করে, জাতিগত অহংকারের উগ্রতা যখন তার থাকে না। আধুনিক সভ্যতায় স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি বড়োই কৃত্রিম ও স্থূল। ভারতের বিদ্রোহ সত্য হয়ে উঠবে, যদি স্বাধীনতার এই অমার্জিত সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করতে পারি।

প্রেমের অবাধ রশ্মিপাতে অন্তঃশীল শাশ্বত বোধি পূর্ণ বিকাশে মুক্তি পায়। অন্যদিকে ক্রোধের আগুনে কেবল নিজেদের বন্ধনশৃঙ্খলই গড়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক মানব পূর্ণতালাভের প্রয়াসী, আর যথার্থ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যও এই পূর্ণতালাভ। জাতীয় প্রয়োজনের নামে যদি আমরা চারিদিকে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর খাড়া করি, তবে প্রকৃত স্বাধীনতালাভের পথে অন্তরায়ই হবে— কারণ সে যে হবে কারাগার। জাতীয় মুক্তিরও শেষ লক্ষ্য হল নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের উদার আদর্শ গ্রহণ।

সৃষ্টির মূলে আছে পরাশক্তির নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া। এই কর্মেই কর্মের শেষ। স্বাধীনতা তখনই সত্য, যখন সে সত্যকেই প্রকাশ করে। মানুষের স্বাধীনতা তাই মানবসত্যের প্রকাশে, যে সত্য নির্মুক্ত হওয়ারই এই আলোড়ন। আমরা এখনো তা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারি নি। কিন্তু এই মহত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, এর শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা সবার উপরে স্বীকার করেন, তাঁরাই সকল বাধা তুচ্ছ করার প্রেরণা অন্তরে অনুভব করে তার আবির্ভাবের জন্য পথ প্রস্তুত করছেন।

মানুষ যে মূলতঃ আধ্যাত্মিক জীবন বহন করে, ভারতবর্ষে সেই বিশ্বাস চিরকালই অটুট ছিল। অন্তরে সেই সত্যের ধ্রুব প্রতিষ্ঠায় অতীতে সে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাস করেছে। তার মধ্যে কিছু কিছু প্রায় অস্বাভাবিকতার ধার ঘেঁষে গেছে, কিছু বা ছিল উদ্ভট। কিন্তু সে তার এই প্রচেষ্টায় কোনোদিনই ক্ষান্ত হয় নি। যদিও এ কারণে তাকে কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। জাগতিক সাফল্যে জলাঞ্জলি দিয়েও সে এই সন্ধানে এগিয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, যথার্থ ভারতবর্ষ একটি ভাববস্তু, সে ভৌগোলিক

সংজ্ঞা নয়। ইউরোপের নানা জায়গায় অনেক মহানুভব ব্যক্তির মধ্যে আমি এই মানবসত্যের স্ফুরণ দেখেছি— তাঁরা আমার দেশের লোক নন।

'পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ'— সেই মহান্ পুরুষ অন্ধকারের পারে যিনি জ্যোতির্ময়— তাঁর জয় ভারতেরই জয়। আমাদের যুদ্ধ এই অন্ধকারেরই বিরুদ্ধে। মানবসত্তায় অনন্তজ্যোতিস্বরূপের প্রকাশ আমাদের সাধনলক্ষ্য। এক-একটি ব্যক্তিবিশেষে নয়, সমগ্র মানবজাতির অখণ্ড সমন্বয়ের মধ্যেই তার পরিচয়। যে অহমিকার অন্ধকার দূর করতে হবে, তা হল জাতিগত অহমিকা। যে স্বাতন্ত্র্যবোধ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের সৃষ্টি করে, তা ভারতীয় ভাবের পরিপন্থী। তাই আমারও প্রার্থনা, ভারত যেন পৃথিবীর সকল জাতির সহযোগিতা কামনা করে। স্বৈরবুদ্ধিই বিচ্ছিন্নতার প্রবৃত্তি আনে, আত্মীয় মনোভাব জাগায় মানুষে মানুষে অভিন্নতাবোধ। ঐক্যই সত্য, অনৈক্য মায়া— এই ভারতের চিরঘোষিত সাক্ষ্য। এই ঐক্য কিন্তু শূন্য নয়, সকলকে মিলিয়ে নিয়ে এই একাত্মতা, তাই তা বিযুক্তির পথে আসতে পারে না।

আমাদের হৃদয়মনকে পশ্চিমের বিরোধী করে তোলার ইচ্ছায় বর্তমান সংগ্রামের এই যে প্রচেষ্টা, একে একরকম আধ্যাত্মিক আত্মহনন বলা যেতে পারে। জাতীয়তার মিথ্যা অহংকারে যদি নিজের গৃহশিখরে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘোষণা করি যে, মানুষের অশেষ প্রয়োজনে আসে এমন কিছুই পশ্চিমদেশ উৎপন্ন করতে পারে নি, তবে স্বভাবতই লোকের মনে পূর্বদেশের চিৎশক্তির মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমের মানবচিত্ত সত্যের বিভিন্ন প্রকাশকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমদেশ দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এটা যদি সত্য হয়, তবে পূর্বদেশের সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে। মিথ্যাগর্ব ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে আলো জ্বলেছে দেখে যেন আমরা আনন্দ করতে পারি, কারণ তাতে তো আমাদের ঘরও প্রদীপ্ত হবে।

সেদিন আমেরিকার একজন খ্যাতিমান শিল্পসমালোচকের গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম। তিনি প্রাচীন ইটালিয়ান শিল্পের একজন মস্ত ভক্ত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, ভারতীয় চিত্র সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না। তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, খুব সম্ভবত সেগুলো দেখলে তাঁর চোখে নগণ্য ও হেয়ই ঠেকবে। আমার মনে হল, তবে তিনি নিশ্চয় কিছু কিছু দেখেছেন এবং তাতে তাঁর

মনে অবজ্ঞা এসেছে। শোধ নেবার ইচ্ছে থাকলে আমি পশ্চিমের শিল্প সম্বন্ধেও অনুরূপ ভাষায় তাঁকে কিছু বলতে পারতুম। কিন্তু একথা আমি গর্ব করেই বলছি, সেরকম কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ আমি সর্বদা পশ্চিমের শিল্প বুঝতেই চেষ্টা করি, ঘৃণা করতে নয়।

মানুষের সৃষ্ট যে কোনো জিনিস আমরা বুঝি এবং দেখে আনন্দ পাই, তার উৎপত্তি যেখানেই হোক, তৎক্ষণাৎ তা আমাদের নিজস্ব হয়ে যায়। অন্যদেশের কবি ও শিল্পীদের নিজের বলে মনে করতে মানুষ হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। সমস্ত মহৎসৃষ্টিকে নিজস্ব মনে করে যেন আমি অপার আনন্দ অনুভব করি— ভগবান এই আশীর্বাদই আমাকে করুন। তাই পশ্চিমের বিরুদ্ধে বর্জনের নির্দেশ ধ্বনিত করে আমার দেশের লোক যখন বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেবল আমাদের ক্ষতিই করতে পারে, তখন আমি অন্তরে তীব্র আঘাত পাই।

এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না। আমরা নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ হারিয়েছি বহুকাল, তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের জীবনে তার সত্যমূল্য পৌঁছে দিতে পারে নি। প্রায়ই ভুল পরিপ্রেক্ষিতে তা আমাদের মনের দৃষ্টিকেও বিকৃত করে তুলেছে। জ্ঞানের মূলধন যার থাকে, বাইরের জগতের সঙ্গে চিন্তাধারার আদানপ্রদান তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ লাভজনক। কিন্তু এই ভাবের বাণিজ্য গোড়াতেই পরিত্যাজ্য বলে যদি বসে থাকি, তবে তাতে নিকৃষ্টতম প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ধীশক্তির দৈন্য ছাড়া অন্য কোনো ফললাভ এর দ্বারা হয় না।

পশ্চিম পূর্বকে ভুল বুঝেছে, উভয়ের অসম্প্রীতির মূল কারণই তাই। তা বলে পূর্ব যদি পশ্চিমকে ভুল বুঝতে চেষ্টা করে, তাতে কি কিছু সুবিধা হবে? বর্তমান যুগ পশ্চিমের শক্তিশালী অধিকারে। তা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে বিধিনির্বন্ধে মানুষের উপকারের মহৎ ব্রত তার উপরেই আজ ন্যস্ত। তার যা শেখাবার আছে, আমরা পূর্বদেশীয়রা তা শিখব, তবেই আমরা এ যুগের চরিতার্থতা সাধন করতে পারব। আমরা জানি, পূর্বদেশেরও কিছু দেবার আছে, তার নিজের আলো নিবতে না দেবার দায়িত্বও তার। সেই সময় আসবে, যেদিন পশ্চিমের বোঝার অবকাশ হবে যে, পূর্বদেশেও তার একটি ঘর আছে, সেখানে তার খাদ্য এবং বিরাম— দুইই সে খুঁজে পাবে।

নিউ ইয়র্ক। ১৮ মার্চ ১৯২১

আমার এখানকার এই কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেলে বেঁচে যাই। এসব কর্মভার কুয়াশার মতো আমাদের ঢেকে ফেলে— মনে হয় এই ধরণীর প্রত্যক্ষ স্পর্শ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ আমার মনে সেই স্পর্শের জন্যে এমন একটি ব্যাকুল ক্ষুধা রয়েছে। বসন্তকাল এল, আকাশে আলোর প্লাবন। কত ইচ্ছে করে পাখির সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, শ্যামলা বিপুলা এ ধরার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাই। আকাশ থেকে আমার গানের আহ্বান ভেসে আসে। অথচ দুর্ভাগা আমি ভাষণ দিয়ে বেড়াই। যে গানের জগতে জন্মেছিলুম— তার থেকে এভাবে নিজেকে বহিষ্কৃত করে রাখি। ভারতীয় ধর্ম-শাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছেন, আমরা যেন সমুদ্র অতিক্রম না করি। কিন্তু আমি তো তাই করেছি। আমি আমার নিজের জগৎ ছেড়ে এসেছি। সেখানে ভোরের জুঁইয়ের রাজ্য ছেড়েছি, শৈশবে মায়ের হাতের স্পর্শ দিয়ে যিনি আমায় জাগিয়েছিলেন, সেই বীণাবাদিনীর শতদলকুঞ্জ ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমি মাঝে মাঝে যখন তাদের কাছে ফিরে যাই, তখন বুঝতে পারি যে আমার জাত গেছে। যদিও তারা আমার নাম ধরে ডাকে, আমার সঙ্গে কথাও বলে, তবু, তারা আর আমাকে ধরা দেয় না।

আমি নিশ্চিত জানি, এখন আমার পদ্মানদী, যে এতকাল আমার গানে কৌতুকের হাসি হেসে স্নেহপূর্ণ স্বরে সাড়া দিয়ে এসেছে, আমি কাছে গেলে একটি অদৃশ্য আচ্ছাদনের আড়ালে সরে যাবে। করুণস্বরে এখন সে বলবে— তুমি সমুদ্র পার হয়েছ।

আদম-ইভ স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিল— তাদের বংশপরম্পরায় সেই অভিনয় আমরা বারেবারেই সংসারে দেখতে পাই। আমাদের আত্মাকে আমরা নানা মত নানা তত্ত্বের ভূষণে সজ্জিত করে রাখি। প্রকৃতির বিশাল বক্ষে যে অন্তহীন জীবনলীলা চলেছে, তার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলি। নির্বাসিত আত্মার ক্রন্দন বয়ে নিয়ে এই যে চিঠি আপনার কাছে যাবে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তার সুর আপনার কানে বেখাপ্পা ঠেকবে।

শান্তিনিকেতনে মাধবীবিতানে আমাদের অঙ্কের ক্লাস হয়। পড়াশুনোর সময় মাথার উপরকার গাছ থেকে যে ফুলের মতো করে জ্যামিতিক উপপাদ্য ঝরে ঝরে পড়ে না, সেটা কি ছাত্রদের পক্ষে খুশির কথা নয়? কবিরা যে

বড়ো বড়ো সভাসমিতির সব প্রস্তাব ভুলে বসে থাকেন, এটাও কি সংসারের পক্ষে কম মঙ্গল ? সৃষ্টিকর্তার হাতে গড়া অপদার্থের দল যে সংসারের কোনো প্রয়োজনীয় কাজের ভার পায় না, সে তো উচিতই।

বাতাসে যখন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে, তখন আমি হঠাৎ 'বাণী' দেবার দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে স্মরণ করি, আমি তো সেই আপন-গানে-বিভোল দলেরই লোক। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের সমবেত গানে গলা মেলাতে চাই। কিন্তু আমার চারিদিকে মৃদু গুঞ্জনে শুনতে পাই— এ সমুদ্র পার হয়ে গেছে ; তখন কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে।

কাল আমরা ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করব। আমার নির্বাসনের কাল শেষ হয়ে এল। সম্ভবতঃ এখন থেকে আমার চিঠিপত্র খুব কমই পাবেন। কিন্তু শ্রাবণের বৃষ্টিভরা মেঘের ছায়ায় যখন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন আমি সব শোধ করে দেব।

পিয়রসন স্বাস্থ্য এবং সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। শীতকালে ভারতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, সেজন্যও প্রস্তুত হচ্ছেন।

এস. এস. রীনডম

— পুবের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলেছি ভাবতেই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে। আমার প্রাচ্য কবিরই প্রাচ্য— রাজনীতিবিদ্ বা জ্ঞানীর প্রাচ্য নয়। সেখানে বিপুল আকাশে প্রচুর সূর্যালোক— একদা একটি বালক শৈশবচেতনার প্রদোষে সেই স্বপ্নারণ্যে পথ হারিয়েছিল। শিশুটি এখন বড়ো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার শৈশব কোনোকালেই অতিক্রান্ত হবে না।

একথা বুঝি, যখন রাজনৈতিক বা অন্য কোনো গুরু -সমস্যা কড়া সুরে আমার কাছ থেকে উত্তর দাবি করে। আমিও তখন নিজেকে সচেতন করে ভবিষ্যদ্বাণী দেবার জন্যে স্বর. চড়িয়ে দিই। ত্রস্তব্যস্ত হই মর্যাদার আসনটিতে মানিয়ে নিতে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেকে বড়ো ছোটো বোধ হয়। গভীর আতঙ্কে আবিষ্কার করি, আমি নেতা নই, শিক্ষকও নই, ভবিষ্যদ্বক্তা তো কিছুতেই নই।

এই দুর্বিষহ অবস্থায় ধরা পড়ে, আমি বাড়তে ভুলে গেছি। অতিশয় অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষেই এমন হয়েছে। যা কিছু বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

মানুষের জীবন পরিণত করে, সেসব থেকেই আমার মন চিরপলাতক। লেখা-পড়ায় অবহেলা করেছি। আর সেই শিক্ষার অভাবে, বর্তমান যুগসমস্যা নিয়ে পত্রপত্রিকায় যে বিচার বিতর্ক চলে তার পাঠক হিসেবে আমি বড়ো অজ্ঞ রয়ে গেছি। ভারতের বর্তমান সময়টি এই বালস্বভাব কবির প্রতি বড়োই অকরুণ। তার যে বোধের অভাব আছে, কোনো গুরুতর এবং জরুরি ব্যাপারে যে সে মন দিতে অক্ষম—এ আপত্তি জানিয়েও কিছু লাভ নেই। না, এবার তাকে সভায় উপস্থিত হতে হবে আর সম্পাদকীয় লিখতে হবে দেখছি। হয়তো তুলোর চাষ করতে হবে, আর জাতীয় প্রয়োজনে আসে এমন কিছু গুরু-দায়িত্বও গ্রহণ করে আবার কোন্ নির্বুদ্ধিতার দায়ে ঠেকতে হবে।

অথচ আমার একান্ত কামনা যথাযোগ্য আয়োজন করে বর্ষার প্রথম দিনটির অভিষেক করি, আর আমের মঞ্জরীর সৌরভে মনপ্রাণ ভরে নিই। এদিনে কি তা করা চলে? এখনো আমাদের দখিনাবাতাস কি বসন্তের দিনে চপলতা করে? আমাদের সূর্যাস্ত মুহূর্তগুলি তাদের মেঘের উষ্ণীষ থেকে সব রঙ মুছে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করে নি তো?

কিন্তু নালিশ জানিয়ে লাভ হবে কি? এই যুগের পক্ষে কবিরা অত্যন্ত প্রাচীন। বিবর্তনের রীতি মেনে তাদের যদি সরিয়ে দেওয়া না হত, তবে অনেক আগেই তারা রাজনৈতিক হয়ে উঠত। কিন্তু সমস্যা হল, জগতে কবিদের এমন একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে, প্রগতির পথ যার রুদ্ধ। যে ধনের কোনো প্রয়োজন বা বাজারদর নেই তারই মূল্য দিয়ে আজও চলে এদের কাজ কারবার। সমুদ্রের ওপার থেকে যখন আবার নব কর্মভারের আহ্বান আমার আসে,তখনই সজাগ হয়ে নিজের মধ্যে এই উত্তর শুনি— আমি কোনো কাজের নই, সুগভীর নিষ্কর্মণ্যতার মধ্যেই আমাকে ডুবে থাকতে দাও।

এও জানি, ভারতে পৌছলেই কবির পরাজয় ঘটবে। তখন আমি মন দিয়ে খবরের কাগজের প্রতি ছত্র পড়ব। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটি কবিতা রচনার পক্ষেও ভারি অসুবিধার মনে হচ্ছে। সমুদ্র অস্থির, আমার মাথা টলছে, আর জাহাজের দোলায় ইংরাজী ভাষাটাকে বাগ মানানোও অত্যন্ত কঠিন।

এস. এস. রানডম

আমার নিজের মধ্যে অনেকগুলি ব্যক্তি যে প্রাধান্য পাবার জন্যে পরস্পর সংগ্রামরত—তা দেখে আমার বেশ আমোদ বোধ হয়। বর্তমান ভারতে কোনো রাজনৈতিক কাজে আমার ডাক পড়ার সম্ভাবনা আছে—এটা নিশ্চিত বুঝে নিয়ে আমার কবিসত্তাটি বিচলিত হয়ে উঠেছে। সে জানে যে, তার দাবি অগ্রাহ্য হবে; কারণ সেই আমার ব্যক্তিত্ব সঙ্ঘের মধ্যে সবচেয়ে অকেজো। এ বিষয়ে কারো কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাবার আগেই ব্যাপারটি আঁচ করে নিজের দোষত্রুটিগুলো নিয়েই সে বড়াই করতে শুরু করেছে। অহংকার করে বলছে— আমি কাজ-ভোলা লক্ষ্মীছাড়ারই দলে। অমরাপুরীর পান-সভায় পরিচারক আমি। দেবতাদের মতো আমাকেও যদি লোকে ভুল বোঝে—তবে তাই হোক। আমার কাজ অমর্ত্য এই দেবদূতগণের কাছে সৃষ্টির অকারণ লীলারঙ্গ প্রকাশ। যে সব প্রাসাদ একদিন ধূলিসাৎ হবেই তাদের ভিত্তিস্থাপনে বা সভাসমিতিতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি স্বর্গ-মর্তের দুই তীরে খেয়াপারাপার করি। সে নৌকোয় হাটের জিনিস ফেরি হয় না, তাতে কেবল আমাদের রাজার চিঠির আনাগোনা চলে।

আমি তাকে বলি, বেশ তো, তোমার কথা মেনেই না হয় নিচ্ছি। কিন্তু স্বর্গের ডাকবিভাগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন সব জরুরি কাজেও তোমার ডাকের নৌকোর প্রয়োজন হতে পারে—এ কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। শুনে তার মুখ শুকিয়ে যায়, চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রথম শীতের হাওয়ায় সাইপ্রেস গাছের পাতায় পাতায় যেমন কাঁপন লাগে, তেমনি ওঠে সেও কেঁপে। বলে, আমার সঙ্গে এই ব্যবহার কি তোমার সাজে? তবে বুঝি আর আমার জন্য নেই তোমার প্রাণের টান? আমার উপর সামরিক আইন জারি করার কথা কেমন করে তুমি বল? তোমার জীবনে অমৃতের প্রথম পাত্র ভরে কি তুমি আমার হাতেই পাওনি? আর আজ যে সংগীতলোকের অধিবাসী হতে পেরেছ, তাও কি আমার সুপারিশেই নয়?

তখন আমি চুপ করে বসে ভাবি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। খবরের কাগজের তাড়া আমার টেবিলে জমা হতে থাকে। আমার মধ্যেকার কাজের মানুষটি তার পাশে-বসা স্বদেশসেবকের দিকে ব্যঙ্গভরে ইঙ্গিত করে, আর ভালোমানুষটি ভাবে কবিকে বাধা দেওয়া তারই কর্তব্য, যদিও তাকে খানিকটা প্রশ্রয় দিতে

তার মন্দ-চায়।

এই পঞ্চায়েতের সভাপতি আমি। কবিটির সম্পর্কে আমার মন বড়োই স্নেহকাতর। তার কারণ হয়তো এই যে, সে একেবারে অপদার্থ এবং গুরুতর কাজের সময় প্রথমেই তাকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভীরু কবি, সবার অলক্ষ্যে আমার কাছে এসে কানে কানে বলে, দেখ বাপু, জরুরি সময়ের কাজের জন্যে বিধাতার সৃষ্টি তুমি নও। প্রয়োজনের উর্ধ্বে যে চিরন্তন কাল, তারই কাজে তোমার অধিকার।

হতভাগাটা মিষ্টি কথায় মন ভোলাতে জানে, তাই আমার কাছে প্রায়ই জিতে যায়, বিশেষ করে অন্যরা যখন নিজেদের আবেদনের ফলাফল সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চিত থাকে তখনই। আমি আমার বিচারের আসন থেকে লাফিয়ে উঠে কবির হাত ধরে একপাক নেচে নিয়ে গেয়ে উঠি— আমি তোমার সঙ্গেই যোগ দেব বন্ধু, নেশায় মত্ত হয়ে চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হায়রে আমার দুরদৃষ্ট, আমি জানি কেন যে সভাপতিরা এই অর্বাচীনকে অবজ্ঞা করেন, খবরের কাগজের সম্পাদকরা গালাগাল দেন আর পৌরুষভাবসম্পন্ন লোকেরা আমার মধ্যে নারীসুলভ স্বভাব দেখতে পান। তাই তো আমি শিশুদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজি, কারণ ওরা যে এমন বস্তু ও মানুষের মধ্যে আনন্দ পায় যাদের কোনো মূল্যই নেই।

এস. এস. রীনডম

আমার অসুবিধা হল এই, চিত্তের পরিমণ্ডলের মধ্যে গর্ব বা ক্ষোভের অনুভূতি তীব্র হয়ে একটি বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হলে, আমি জীবন ও পৃথিবীর প্রতি সত্যদৃষ্টি হারিয়ে ফেলি। তাতে আমার প্রকৃতিও গভীর আঘাত পায়। দেশের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই— একথা সত্য নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে আমার সেই দেশপ্রীতি বাইরের কাউকে আঘাত করে না। বরং তখন একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অপরের সঙ্গে আমি সহজ সম্পর্ক রাখতে পারি। কিন্তু দৃষ্টিকোণই যখন বাধার সৃষ্টি করে, তখন আমার অন্তঃপ্রকৃতি সজোরে ঘোষণা করে যে আমার স্থান অন্য কোনোখানে।

আমি এখনো সেই আধ্যাত্মিক ভূমিতে পৌঁছই নি যেখানে দাঁড়িয়ে

নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে এরূপ বাধার সৃষ্টি অন্যায় অথবা অপ্রয়োজনীয়। অথচ আমার সহজাত প্রবৃত্তি বলে যে, এর মধ্যে অনেকখানিই অসত্য। সত্যের বড়ো একটি অংশকে বর্জন করার মধ্যে, চেতনাকে সংকীর্ণ করার মধ্যে যে একটি ক্রোধের ভাব থাকে— তাতে যেমন সত্যভ্রংশ হয়, এও তেমনি।

আমার মনে পড়ে, আপনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন, ইহুদীদের মধ্যে যে সুতীব্র স্বজাতিবোধ দেখা যায়, যীশুখ্রীস্টের মধ্যে কেন তা কখনো দেখতে পাই নে ? তার কারণ হল, ভগবদনুরাগে তিনি যে মহান সত্যে পৌঁছেছিলেন, ক্ষুদ্র স্বাজাত্যের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তা সংকীর্ণ হয়ে ধ্বংস পেত। আমার নিজের মধ্যে স্বদেশসেবকও রয়েছেন, রাজনীতিবিদ্‌ও রয়েছেন। তাই তাঁদের সম্বন্ধে আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকি। তাঁদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আমাকে রীতিমত সংগ্রাম করে চলতে হয়।

আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না। বিচারের একটি নৈতিক ধারা আছে। ভারতের প্রতি যখন অবিচার হয় তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। ভারতবাসী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আমাদের। সেই কর্তব্যপালনে আমার দেশের বেশির ভাগ লোকের চেয়ে আপনার মাহাত্ম্য অনেক উর্ধ্বে। কারণ আপনি যে ভারতের পক্ষ গ্রহণ করেছেন মানবধর্মের আহ্বানে। জানি আমার দেশের লোকেরা আপনার সাহায্য নেবে, অথচ সেই শিক্ষাটি গ্রহণ করবে না। যে স্বজাতিপ্রীতির বশীভূত হয়ে পশ্চিম প্রাচ্যের অবমাননা করছে, তা জাতীয় অহংকারেরই নামান্তর। তারই বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম করে চলেছেন।

ইউরোপের ইতিহাসে কিন্তু এই জিনিসটি খুব বেশি দিনের আমদানি নয়। প্রাচীন ইতিহাসের যাযাবর জীবনের বর্বরতা এবং হিংস্র রক্তপিপাসার চেয়েও মানবজগতে ঢের বেশি দুঃখ ও অবিচার ঘটিয়েছে দেশানুরাগের এই ভ্রান্ত আদর্শটি। ভারতে পাঠান এল, মোগল এল— তারা নির্বিচারে জঘন্য কুকার্য করে গেছে। কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বিন্দুবিসর্গও ছিল না, তাই তারা ভারতবর্ষের মূলে আঘাত করে নি। তারা প্রচণ্ড ঘৃণায় নিজেদের তফাতে রাখে নি। ক্রমশ তারা আমাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেত, যেমন মিশেছিল নর্ম্যান এবং স্যাক্সনরা। মুসলমান আক্রমণকারীরাও সমস্ত পার্থক্য

হারিয়ে এদেশের লোকের সঙ্গে মিশেই যেত, এবং তাতে ভারতীয় সভ্যতা সমৃদ্ধও হত।

মনে রাখতে হবে, হিন্দুসমাজ মূলতঃ আর্যসমাজ নয়, এর একটি বড়ো অংশই অনার্য। বস্তুত আরো বড়ো রকমের একটি মিশ্রণের অপেক্ষা ছিল— সেটি হত মুসলমানের সঙ্গে সামাজিক ভেদলোপ। আমি জানি সেই সম্মিশ্রণের পথে বাধা ছিল অনেক, তবু যেটি সবচেয়ে বড়ো বাধা, তার অভাব ছিল। তা হল— ভৌগোলিক বাধা। ব্রিটিশ দেশাত্মবোধ আয়র্ল্যাণ্ডে কী বীভৎস পাপানুষ্ঠান করছে তা দেখুন। এখন আয়র্ল্যাণ্ড স্বাতন্ত্র্য ফিরে পাবার আশায় যত সংগ্রামই করুক, অজগরের মতো ইংল্যাণ্ড তাকে গ্রাস করেছে, আর উগরে ফেলতে চাইছে না। কারণ দেশাত্মবোধ তার বিরাটত্ব নিয়ে গর্বিত ; তাই যারা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়, তাদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে আমাদের স্বদেশপ্রেমিকরাও তাই করবেন।

দেশেরই একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন অসবর্ণ বিবাহের অধিকার দাবি করলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিষ্ঠুরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। যে পার্থক্য সহজ ও সত্য তাকে সেদিন স্বীকার না করে শারীরিক আঘাতের চেয়েও ঢের বেশি দুঃসহ নৈতিক আঘাত হানা হয়। তার কারণ কি? না, এঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের অর্থ হল— সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রসার। ক্ষমতা— তা সে স্বদেশপ্রেমের রূপেই আসুক বা অন্য যে কোনো মূর্তিতে দেখা দিক— সে স্বাধীনতার অনুরাগী নয়। সে ঐক্যের কথা বলে বটে, কিন্তু ভুলে যায় যে, স্বাধীনতার মধ্যেই প্রকৃত ঐক্য। একাকারত্ব হল ঐক্যের বন্ধন।

মনে করুন, এই স্বরাজলাভের প্রয়াসে অব্রাহ্মণ সমাজ যদি যোগ না দেন, তাঁরা যদি আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখার জন্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দাবি করেন— তখন স্বাদেশিকতা তাঁদের বাধ্য করবে একটি অপ্রীতিকর সংহতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে। কারণ, স্বদেশপ্রেম যে চায় অপ্রতিহত প্রতাপ। সংখ্যাতত্ত্বের উপর সে তার প্রাসাদ নির্মাণ করে। আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি— কিন্তু এই ভারতবর্ষ কোনো ভৌগোলিক সত্তা নয়, সে একটি ভাবময় রূপ। তাই আমি প্রকৃতপক্ষে স্বদেশবৎসল নই, কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই আমি আমার স্বদেশীয়দের সন্ধান

করে বেড়াব। তাদের মধ্যে একজন হলেন আপনি। আরো যে অনেকে রয়েছেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই

এস. এস. গ্রীনডম

প্লেটো বলেছিলেন, তাঁর রিপাব্লিক থেকে সব কবিদের নির্বাসিত করবেন। আচ্ছা, এই কথাটি যে তিনি বলেছিলেন, সে কি করুণায়, না ক্রোধের ভরে—তাই ভাবি। ভারতীয়রা যখন স্বরাজলাভ করবেন— তখন যারা মাটিও খোঁড়ে না, ফসলও বোনে না, রুটিও সেঁকে না, রান্নাও করে না— যারা সুতোও কাটে না, রিফুও করে না, প্রস্তাব পেশও করে না বা সমর্থনও করে না— কেবল স্বপ্ন দেখে আর ছায়ার পিছনে ছোটে— তাদের কি সেই রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে?

অনেক সময় আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি, সেই নির্বাসিত কবির দল যেন ধরুন প্লেটোর রিপাব্লিকেরই কাছাকাছি কোনো জায়গায় এসে তাঁদের রিপাব্লিক গড়ে তুললেন। স্বভাবতই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দার্শনিকরা এবং রাজনীতিবিদরা কবিদের রিপাব্লিক থেকে বিতাড়িত হবেন। তারপরে এই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি থেকে কত অসংখ্য রকমের সম্ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে, তাও ভেবে দেখুন। শান্তি মহাসভা স্থাপন, প্রতিনিধি প্রেরণ, ব্যস্তবাগীশ সচিববর্গ এবং স্থায়ী অর্থভাণ্ডারসহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে— এই দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। তার পরেই একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনার কল্পনা করুন। একটি দল-ছাড়া স্বপ্নবিলাসী তরুণ ও একটি বিষাদবিধুরা তরুণী দুই রাজ্য থেকে বেরিয়ে সীমান্তে এসে মিলিত হল এবং জন্মগ্রহের যোগাযোগে তখনই পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল।

দার্শনিকদের রিপাব্লিকের যিনি রাষ্ট্রপতি, তরুণটি তাঁরই পুত্র আর তরুণীটি হলেন কবি-রাষ্ট্রপতির কন্যা— এ কথা মনে করে নিতে কোনো বাধাই নেই। এমন ঘটনার ফলে এই দুই গোষ্ঠীর দার্শনিকদের বিচার-বিতর্ক ও টীকাটিপ্পনীর মধ্যে সেই মিলনপিয়াসী প্রেমিকের নিষিদ্ধ প্রেমগীতির অবৈধ আমদানী তো হবেই। পণ্ডিতদের মধ্যে একদল যাঁরা পীত উষ্ণীষ ধারণ করেছেন তাঁরা বলছেন, একই সত্য— আর দুই হল মায়া। অন্যদল হরিৎ উষ্ণীষধারী—

তাঁরা বলেন, দুইই সত্য, এক হচ্ছে মায়া।

তারপরে এল বিরাট দর্শনমহাসভার দিন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সেই সভায় সভাপতি হলেন। দুই দলের পণ্ডিতই সত্যনির্ধারণের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমবেত হলেন। তর্কের ঝড় প্রচণ্ড হল। দুই পক্ষের সমর্থনকারীর দল হিংস্র হয়ে উঠল, ফলে সত্যের সিংহাসন এসে দখল করল হৈ হৈ রণঝঞ্জনা। প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম, সহসা রঙ্গভূমিতে প্রণয়ীযুগলের আবির্ভাব ঘটল। এরূপ অসবর্ণ বিবাহ যদিও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তবু এক ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাতে এরা গোপনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। দুজনে এসে দুই দলের মাঝখানে দাঁড়ানোমাত্রই সভাস্থল নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সেই অপ্রত্যাশিত অথচ অতি স্বাভাবিক ঘটনা কি করে সেই সব নিষিদ্ধ প্রেমগীতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তর্কশাস্ত্রের বিরোধমীমাংসায় সাহায্য করল— সে এক বিরাট ইতিহাস। বিচারকদের শেষ নির্ণয় যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন, দুটি মতই নিঃসন্দেহে সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। এক দুয়ের মধ্যে রয়েছে, তাই দুই নিশ্চয় একের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবে। এ সত্যটি স্বীকৃত হতেই ওই অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হল। তারপর থেকে দুই রিপাব্লিক নির্বিবাদে তর্কযুদ্ধে নিরস্ত হয়ে গেল। কারণ তারা বুঝল, এতকাল তাদের মধ্যে যে তফাৎ ছিল সেটা কাল্পনিক।

এই নাটকের এমন সহজ সুন্দর পরিণতির ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা প্রচারচেষ্টায় স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের সাহায্যে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তাদের সচিব ও প্রচারকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিল ও গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হল। সেসব সংস্থার কর্মপন্থা এমনই নিখুঁত যে ফলাফলের শূন্যতারূপ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা তারা অগ্রাহ্য করতে পারে। সেই কর্মী-বৃন্দের অনেকেই পরোপকারের অদম্য নেশায় অন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী অর্থভাণ্ডার রয়েছে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বাণী প্রচার করতে সাহায্য করবেন যে, দুই চিরকালই দুই থাকবে— তারা কখনো এক হয়ে মিলতে পারে না।

উদ্ধৃত কাহিনীটি যে সত্য তা মহামতি প্লেটো নিজেই স্বীকার করবেন। দুইয়ের সঙ্গে একের এই লুকোচুরির উপাখ্যানটি নিয়ে কোনো কবির কাব্য রচিত হওয়া উচিত। তাই আমি বলি কি, আপনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে

আমার আশীর্বাদ জানিয়ে বিষয়টি পাঠিয়ে দিন। ছন্দের রাজা সে। তার অতুলনীয় কাব্যছন্দে রঙ্গরসের মূর্ছনায় যেন সে খুশির গানে একে রূপায়িত করে।

এস.এস. রীনডম

সমুদ্র অত্যন্ত অশান্ত। উদ্দাম পুবে হাওয়ার সাপখেলানো বাঁশি শুনে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ আকাশে ফণা বিস্তার করছে। সমুদ্রের এই চোখ-রাঙানি আমি বড়ো গ্রাহ্য করি নে, কিন্তু প্রকাণ্ড দৈত্যের বুক চাপড়ানোর মতো এই উত্তাল ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত ঘাতপ্রতিঘাত— এ আমার মনকে বড়ো দমিয়ে দেয়।

একটি কাল্পনিক দুর্ভাবনা আমাকে প্রায়ই উদ্‌বেগ-চঞ্চল করে তোলে। সেটি হল, আমি যদি আর কখনো ভারতের উপকূলে না পৌছতে পারি, তবে? তখনই আমার যে মাতৃভূমি সমুদ্রের দিকে তাঁর মর্মরিত তালপল্লববাহু বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে দেখবার জন্য আমার মন একান্ত ব্যাকুল হয়। এই দেশেই তো আমি আমার প্রথম প্রেয়সী কবিতা কল্পনাময়ীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেই তো আমাকে শিশির-ভেজা বিষণ্ণ শরৎপ্রভাতে নারকেল গাছের শীর্ষে সূর্যকিরণের স্পর্শটিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। আর ভালোবেসেছি দিগন্তের ওপার থেকে ছুটে-আসা জলভরা ঝড়ের মেঘকে— যার স্তরে স্তরে বয়ে চলেছে বর্ষণের প্রলয়োচ্ছ্বাস।

কিন্তু হায়, আমার সেই একমাত্র বাল্যসঙ্গিনী, স্বপ্নরাজ্যের রহস্য অনুসন্ধানে আমার যৌবনের দিনগুলি আমি যার সঙ্গে কাটিয়েছি, আমার সেই প্রেয়সী এখন কোথায়? আমার জীবনে সেই মোহিনী রানীর অস্তিত্ব আর নেই। সৌন্দর্যের অন্দরমহলের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ। তাতেই আমার জগৎ থেকে স্বাধীনতার স্বাদ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রিয়তমা মমতাজের মৃত্যুর পরে শাজাহানের যে অবস্থা হয়েছিল, আমার অবস্থাও তাই। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব পরিকল্পনা আমার চিন্তাধারার উত্তরাধিকার বহন করবে। সেও আওরঙজেবের মতো আমাকে বন্দী করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার উপর প্রভুত্ব করবে। এর প্রতি আমার ভয় ও অবিশ্বাস প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। কারণ সে এখন যে শক্তিসঞ্চয় করছে তা আমার সংগতির বাইরে

—তা হল বৈষয়িক সম্পদ।

আমার চিত্তের লীলানিকেতন হল এই শান্তিনিকেতন। এর মাটিতে যা গড়ে তুলেছি, তা আমারই স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। তার উপাদান কম, আইনকানুন কঠিন নয়, তার স্বাধীনতার মধ্যে সৌন্দর্যের আভ্যন্তরীন সংযম আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ওজনে ভারী হবে। তার গঠন হবে অনমনীয়। তাকে যদি একটুও নড়াতে যাই তো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পরে হয়তো এই অনুজটিরই এমন প্রতাপ হবে যে তার অগ্রজা শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের নম্রতার সুযোগ নিয়ে তাকে কোণঠেসা করে রাখবে। বন্ধু, প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন। লোকে বলে, কোনো পরিকল্পনাকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের দরকার। কিন্তু সে তো সমাধি-প্রস্তরের স্থায়িত্বও হতে পারে।

আমার এই চিঠিতে হয়তো একটি নিরাশার স্বর বেজে উঠেছে। তার কারণ আমি অসুস্থ, ঘরে ফেরার জন্যে উন্মুখ। দিনরাত যে স্নেহনীড়ের কথা মনে পড়ছে— সে আমাদের শান্তিনিকেতন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ চূড়া তাকে আড়াল করতে চায়। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, গত কয়েকমাস ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি একটি উদ্দেশ্য ধরে চলতে। আর যে পথে চলেছি তা আমার অন্তরতম সত্তার স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে।

এস. এস রীনডম

আপনারা যাঁরা স্থির শক্তভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান করছেন তাঁরা বুঝতেই পারবেন না অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে এই মত্ত সাগরের দোলা খাওয়ার কি কষ্টকর পরীক্ষা যে দুদিন ধরে চলছে। সমুদ্রপীড়া আমার হয় না, কিন্তু আমরা যে মাটিরই সন্তান, সে একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যটি স্থির, কিন্তু যখন সমুদ্রে এসে অস্থির হতে হয়, তখন তা যে আমাদের বেদনা দেয় শুধু তাই নয়, প্রকাণ্ড অপমানও করে। যে গর্বিত জীবগুলির কেবল এক-জোড়া নড়বড়ে পা আছে, ডানার অংশমাত্রও নেই, তাদের দেখে এই বিপুল বারিধি যেন উল্লাসে অট্টহাস্য করে ওঠে।

এর হাতে প্রতিমুহূর্তে মানবসন্তানের মর্যাদাহানি ঘটে। কারণ, বিনা-প্রতিরোধে বেকায়দার ঘায়ে সে ডিগবাজি খায়। অবিরাম এক বিরাট প্রহসনে

যোগ না দিয়ে তার অব্যাহতি নেই। কষ্টভোগ করতে হয় চূড়ান্ত, অথচ তার চেহারাটি হয় হাস্যকর— এর চেয়ে অপমানের আর কি হতে পারে? এ যেন সার্কাসের ভাঁড়কে লাথি মেরে তাকে দিয়ে নানারকম কিম্ভূতকিমাকার খেলা দেখানো। হাঁটতে বসতে খেতে প্রতিক্ষণেই আচমকা এমন সব ভঙ্গি করতে আমরা বাধ্য হই, যা অসুবিধার তো বটেই— লজ্জারও কম নয়।

দেবতারা যখন কৌতুক করতে চান তখন আমরা মর্তবাসীরা ভারি মুশকিলে পড়ি। কারণ তাঁদের নিদারুণ পরিহাসের উচ্ছ্বাস লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের গর্জনে ফেনিয়ে ওঠে। তাতে তাঁদের দিব্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু আমাদের আত্মসম্মান তো এদিকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এই জাহাজে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসির ভাষায় নিজের যন্ত্রণাটাকে ব্যক্ত করছে, প্রকৃতির এই নির্বোধ ছেলেখেলাতে সে কেবল একটি নিষ্ক্রিয় খেলোয়াড় হয়ে থাকতে রাজী নয়। নিষ্ঠুর হাস্যের উত্তর দিতে হয় বিদ্রোহের হাসি দিয়েই। আমার এই চিঠি সেই অবজ্ঞার হাসি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ সকালে চিঠি লিখতে বসার অভিপ্রায়ই ছিল এই। আজ আপনাকে বলার আমার বিশেষ কিছু ছিল না। তাছাড়া জাহাজ যখন এভাবে পাগলের মতো দুলছে— তখন কিছু চিন্তা করার চেষ্টা মানেই মত্ত অবস্থায় কলসীভরা জল বয়ে নেবার মতো, তার বেশির ভাগই ছলকে পড়ে যায়। তবু আজ আমাকে এ চিঠি লিখতেই হবে। কারণ দেখাতে চাই, যদিও এ মুহূর্তে আমি পায়ের উপর সোজা দাঁড়াতে পারি নে, তবু আমি লিখে যেতে পারি। বিদ্রূপমত্ত প্রবল অতলান্তিকের রুদ্রকরতালির মুখে প্রমাণ করতে চাই— আমার মন ভাষার রাজ্যে যে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাই নয়, দৌড়তেও পারে, এমন-কি নাচতেও পারে। সেখানেই আমার জয়।

আজ মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার [২৪ মার্চ ১৯২১] সকালে আমরা প্লীমাথে পৌছব আশা করছি। আপনার চিঠিগুলো আমার এই দুর্বিষহ নির্বাসনের কালটিতে যতটা সাহায্য করেছে, এমন আর কিছুই নয়। যে সৈনিক তার ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত প্রত্যঙ্গগুলিকে টেনে টেনে, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গুনে গুনে দুর্গম পথে শিবিরে প্রত্যাগমনের চেষ্টা করছে— তার খাদ্য ও পানীয়ের ন্যায় কাজ

করেছে এই চিঠিগুলি। যাই হোক, এখন যাত্রার শেষে এসে পৌঁছেছি। আশা করি ফিরে গিয়ে আপনাকে দেখতে পাব। দুর্ভোগ যা গেছে, সে একমাত্র আমার ভাগ্যদেবতাই জানেন। বিশ্রামের জন্য এখন আমার দেহমনপ্রাণ সমাকুল।

ভূমিকা

আগের বছর হাউস অব লর্ডস্-এ ডায়ার বিতর্কের ফলে ইংলণ্ডের আবহাওয়া তিক্ত হওয়ায় কবির মন অপ্রসন্ন ছিল। এবার আমেরিকা থেকে ফিরে দিনগুলো তার তুলনায় অনেক আনন্দে কাটালেন। যাঁরা তাঁর জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখা করার মতো বেশি দিন তিনি সেখানে রইলেন না। ইউরোপের চারি দিক থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু তাঁর সময় ছিল কম। কারণ যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ভারতে ফিরে আসবেন স্থির করেন। কবির অসামান্য ব্যক্তিত্ব ইউরোপে যে অপরিমিত সমাদর পেয়েছিল, তার অল্প অংশই এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। তাঁর আপত্তিতে আমাকে লেখা এসময়কার তাঁর অনেক চিঠিই অপ্রকাশিত রয়ে গেল। কারণ যে-অভ্যর্থনা তিনি সেখানে সর্বত্র পেয়েছিলেন, তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা সম্বন্ধে তাঁর মনে কুণ্ঠিত সংকোচের অন্ত ছিল না। কোনো কবির পক্ষে এ ধরনের সাদর সংবর্ধনা পাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এর মধ্যে যে জিনিসটি তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, তা হল ইউরোপীয় মনের আধ্যাত্মিক পিপাসা। বিশেষ করে সম্প্রতি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত প্রদেশের মানুষ অন্তরের সঙ্গে আশা করেছিল, পূর্বদেশ থেকে কোনো আলোর রশ্মি নিষ্ক্রমিত হয়ে তাদের সমাচ্ছন্ন অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবে।

বিশ্বভারতীর আদর্শ যা এতকাল খানিকটা অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট ছিল তা এবার একটি বিশিষ্ট রূপ পেল। অথচ ভারতবর্ষে তখন লাঞ্ছিত পরাধীনতার বিক্ষোভ এমন আকার নিয়েছিল যে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আশঙ্কা করছিলেন, বিদেশ থেকে ফিরলে তাঁর দেশের লোকে তাঁকে ত্যাগ করবে।

বাস্তবে তা ঘটে নি। কারণ, মহাত্মা গান্ধীর এই জাতীয়-আন্দোলনের অন্তরে উদার অহিংসভাবের মূলকেন্দ্রটি ছিল। পশুশক্তির নির্ভীক প্রতিরোধ ও দীনের সেবায় তাঁর সক্রিয় অনুরাগের জন্য কবি মহাত্মা গান্ধীকে যে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এমন কমই মেলে।

লণ্ডন। ১০ এপ্রিল ১৯২১

এবার ইংল্যাণ্ডে এসে আমার ভারি ভালো লাগছে। এখানে প্রথম যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন এইচ্. ডব্লিউ. নেভিনসন। তখনই একথাটি অনুভব করলুম, এমন একটি লোক যেদেশে জন্মেছেন, সেখানকার জনচিত্ত নিশ্চিতই সজীব।

মহৎসন্তানদের পরিচয়েই প্রত্যেক দেশের বিচার চলে। ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা মহাপ্রাণ, তাঁরা যে পৃথিবীর মহত্তম মানুষেরই নিদর্শন— একথা বলতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না।

ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে যতই অভিযোগের কারণ থাক, আপনার দেশকে তো আমি ভালো না বেসে পারি নে। কারণ, আমার কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু যে সে দেশেরই। এই সৌভাগ্যে যে আমার কত আনন্দ! কারণ জানি, বিদ্বেষ মানুষকে বড়ো পীড়া দেয়। যুদ্ধের সময় সেনাপতি যেমন একটি সম্পূর্ণ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করবে বলে একমুখো ব্যূহে নিয়ে যেতে চায়, ক্রোধে অন্ধ হয়ে তেমনি আমরা একটি পুরো দেশের লোককে এক সাধারণ নিয়মে বিচার করি, যাতে আমাদের প্রত্যাঘাত ব্যাপক হয়ে মনের ক্ষোভ দূর হয়।

আয়র্ল্যাণ্ডে যা ঘটছে, তা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এর পিছনে আবার যে উৎকট রাজনৈতিক মিথ্যাপ্রচার চলেছে, তাও বিস্ময়কর। আমাদের ক্রোধও সেই অনুপাতে বড়ো বলিই চায়। আমরা ধরে নিই, ইংল্যাণ্ডের সব লোকই দোষী। যদিও ভালোই জানি, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই নৃশংস আচরণে যে-কোনো নিঃস্বার্থ বিদেশীর মতোই লজ্জিত ও দুঃখিত।

আয়র্ল্যাণ্ডকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখাই এদেশের লোকের স্বার্থ। অথচ নিপীড়িত আইরিশদের বেদনা তাঁদের এত ক্ষুব্ধ করে দেখে বুঝি, সব বিকৃতির মধ্যেও সুবিচারের প্রবণতা এঁদের সহজাত। একটি জাতির বাঁচা নির্ভর করে মুষ্টিমেয় সত্য মানুষেরই উপর কারণ কালে কালে যখনই অধর্মের গ্লানি বন্যার বেগে দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন জাতির নৈতিক ঐতিহ্যকে অন্যায় অবিচারের খরস্রোতের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখেন— অমরবীর্যসহায় তার বরপুত্রগণ।

ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো লোক থাকা সত্ত্বেও এডমণ্ড বার্কেরা চিরকাল গ্রেটব্রিটেনের মহত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় যদিও

রয়েছে বাহির বিশ্বকে বর্জনের বিধি, আর যে-ধর্ম আমরা অনুশীলন করি— তাতে মিশেছে প্রথার জড়ত্ব ও বাহ্য উপচারে পূজারীতি, তবু মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিতে যে ভারতবর্ষ এখনো বিশ্বাস হারায় নি— তা প্রমাণের সুযোগ দিলেন বলে আমরা সকলেই আজ মহাত্মা গান্ধীর কাছে ঋণী।

দেশে কি বিদেশে গুণীজন সহজেই নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পান। কাঠে কাঠে তফাৎ থাকে, কিন্তু তাতে যে আগুন জ্বলে তার স্বরূপ এক। এই দেশে যখন তার শিখা দেখি তখন চিনতে পারি, ভারতবর্ষে যে-আলো আমাদের পথ দেখায়, আর যা আমাদের গৃহদীপ হয়ে জ্বলে, সে যে এই একই আলো। এখন সেই মহাহোমের আগুন আমরা খুঁজে বের করব। যেন মনে জানি, যেখানে বিরোধের ভাব, সেখানেই অন্ধকার। ঐক্যের অনুভূতি থেকেই তমোনাশী সত্য ও জ্যোতি বিভাসিত হয়।

আমাদের আপন ঘরে যখন আলো জ্বালি, দেবলোকের অনির্বাণ জ্যোতি-শিখায় তার দীপ্তি পৌছয়। নিজের দেশ থেকে একটি দীপ হাতে আপনি বেরিয়েছেন। আমিও তবে এবার আপনার দেশের উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অনুরাগে হৃদয় ভরে আমার অন্তরপ্রদীপখানি জেলে নিই।

[একজন মহিলা পত্রে অভিযোগ করেছিলেন যে কবির একটি বক্তৃতায় ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর ক্রোধ ব্যক্ত হয়েছে। তার উত্তরে কবি নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন এবং পত্রের একটি অনুলিপি আমাকে পাঠিয়ে দেন।]

লণ্ডন। ১২ এপ্রিল ১৯২১

মহাশয়া,

আপনার পত্র সেদিন সকালে একটু বিলম্বেই পাই। পরে শুনি, আপনি যখন এই হোটেলে এসেছিলেন, তখন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় খুবই দুঃখিত হয়েছি।

আমার ভাষণে আমি ব্রিটিশ জাতির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছি, এই কথাটা কল্পনা করে নেবার মূলে রয়েছে সম্ভবতঃ আপনার উগ্র স্বজাতি-চেতনা, যা হয়তো অজ্ঞাতসারে আপনার মনে সঞ্চিত রয়েছে। যে-কোনো ক্ষমতাশালী জাতির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানবের জন্যে আমি অন্তরে গভীর বেদনা বোধ করি, সে পূর্বদেশেরই হোক বা পশ্চিমদেশেরই হোক।

আমেরিকায় যে নিগ্রোদের বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়, জাপানে সাম্রাজ্যবাদের বলি যে কোরীয়রা এবং এদিকে আমাদের দেশের অসহায় জনসাধারণ— সকলের প্রতি অন্যায় ও অবিচার আমাকে দুঃখ দেয়।

অশুচি জীবিকায় রত ব'লে যাদের উপস্থিতি ধর্মমন্দির অপবিত্র করেছিল, তাদের প্রতি যীশুখ্রীস্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যদি আজও বেঁচে থাকতেন তবে যে-সব জাতি বিজিত দেশের রক্ত শুষে নিজেদের উন্নতি করতে চায়— তাদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হতেন। দুর্বল ও পরাহতের প্রতি যাদের হিংস্র নিপীড়ন সমাজদ্রোহীর নির্বিচার দুষ্কৃতিকেও ছাড়িয়ে যায় সেই সব দুর্বৃত্তদের শাসনের ভার তিনি নিজের হাতেই নিতেন। বিশেষ যখন তাঁর ভক্তের দল— তাঁর নামে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের প্রচারণাই যাদের আপাতবৃত্তি— তারা অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনায় নিরুত্তরে নিরপেক্ষ থাকে।

অপরপক্ষে, যদিও আমি মাঝে মাঝে একথা ভেবে গর্ব অনুভব করি যে, আমার মধ্যে উগ্র স্বজাতীয়তা বিন্দুমাত্রও নেই, তবু সম্ভবতঃ আমার অন্তর্মনে তার অস্তিত্ব এখনো যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। নিজ দেশের লোকের বেদনা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন আমি কিছু লিখি— তা পড়ে হয়তো বিদেশীর চোখে আমার মগ্নচেতনার এই প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশা করি, আমার এ দুর্বলতা ক্ষমার্হ; কারণ, আমার দেশবাসী অন্য কোনো দেশের প্রতি অবিচার করলে আমি তো তা মার্জনা করি নে।

ওতুর দ্যু মঁদ। প্যারিস। ১৮ এপ্রিল ১৯২১

সংক্ষিপ্ত বিমানযাত্রার শেষে আবার আমি ধুলোর রাজ্যে ফিরেছি। সুদূর মহাকাশের জ্যোতিষ্কটি, তাঁর নামের দোসর আমায় তখন সকৌতুক স্নেহহাস্যে অভিষিক্ত করছিলেন। আর বাঁধনছেড়া এপ্রিলের মেঘগুলি অবাক হয়ে ভাবছিল, আমি বুঝিবা তাদেরই দলে যোগ দিতে চলেছি।

যখনই একটু সময় পাই, জানলার ধারে এসে একা বসি। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বিষণ্নস্বরে নিজের মনে বলি— যারা জন্মনির্বোধ তারা নির্জনতার মধ্যে মুক্তি পেলে তবেই তো অলসতার ডানায় ভর দিয়ে আকাশে উড়তে পারে, আর অকারণ গুঞ্জরণে বিধাতাকে তৃপ্ত করতে পারে। তুমি কবি— ও

ধরনেরই এক বিচিত্র সৃষ্টি। আপন প্রকৃতির সার্থকতা যদি চাও, তবে একা থাকাই তোমার দরকার। কেনই বা এসব পরিকল্পনা ? একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে বলে লোকমত পরিচালনা আর সমাজে দশজনের সঙ্গে কাজ না করলেই বুঝি নয় ?

জীবনভর একাই কাজ করে গেছি। কারণ আমার জীবনে ও কাজে কোনো ভেদ ছিল না। গাছ তার বাড়বার বেগেই নিজেকে পরিণতি দেয়। তার তখন চাই প্রচুর অবকাশ, চাই প্রশস্ত স্থান আর অবাধ আলোহাওয়া ; আমারও প্রয়োজন তাই। ইঁট কাঠ, রাজমিস্ত্রী বা এঞ্জিনীয়ারের বাঁধা পরিসরে আমার সাধনচিন্তন ডালপালা মেলতে পারবে না।

স্বপ্নরাজ্যের গহনে আমার সব কবিতাগুলির মূল। অথচ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাকা বনিয়াদ চাই ; তার তো মূলের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞ দূরদর্শী লোকের কমিটি ও স্থায়ী অর্থভাণ্ডারই তার চাই।

দূরদর্শিতা গুণটি আমার আদৌ নেই। কিছু অন্তর্দৃষ্টি হয়তো আছে, কিন্তু দূরদৃষ্টির বড়োই অভাব। দূরদৃষ্টির আছে হিসেবের ক্ষমতা আর অন্তর্দৃষ্টির আছে কল্পনাশক্তি। অন্তর্দৃষ্টি যার রয়েছে, তাতে তার বিশ্বাসও আছে। ভুল করতে বা অকৃতকার্য হতে তার ভয় নেই। দূরদৃষ্টি কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে। সমগ্রদৃষ্টি নেই বলেই সে ভুলের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে থাকে। তার ব্যবস্থাপনা হয় সুসম্বদ্ধ ও অনমনীয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বিজ্ঞজনের দূরদৃষ্টি আমাকে কখনো পরিহার করবে না জানি। সোজা গিয়ে সে কর্ণধার হয়ে বসবে। হিসেবী লোক যারা টাকা দেবে আর বিচক্ষণ লোক যারা পরামর্শ দেবে— তাদের তৃপ্তি তো এতেই। কিন্তু বুদ্ধি বা দায়িত্ববোধ যাদের তেমন প্রখর নয়, তাদের জায়গা কোথায় থাকবে বলুন তো ?

বিশ্ববিদ্যায়তনটি স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা চাই। কিন্তু এই স্থায়িত্ব কি পাব আমরা প্রাণের মূল্যে ; স্বাধীনতার মূল্যে ? খাঁচাখানা স্থায়ী, নীড় তো স্থায়ী নয়। যথার্থ স্থায়ী পদার্থকে অজস্র অস্থায়ী অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। বসন্তের ফুল চিরস্থায়ী কারণ সে মরতে জানে। পাথরের তৈরি মন্দির মৃত্যুকে বরণ করে তার সঙ্গে সন্ধি করতে পারে না। ইটপাথরের গর্বে সে মৃত্যুকে বাধা দিয়ে যায়, অবশেষে পরাজয় অবশ্য তাকে মানতেই হয়।

আমাদের শান্তিনিকেতনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে মানুষের প্রাণের উপর, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভর আইনকানুনে। কিন্তু—

যাক গে, সে কথা ভুলে থাকাই ভালো। হয়তো আমি বাড়িয়ে বলছি। তার কারণও আছে— দিনটি যে ভারি বিশ্রী। ক্রমাগত বরফ পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তাঘাট জলে মগ্ন আর দেশের জন্যে আমার বড়ো মন কেমন করছে।

একটি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে। সারাংশটি সভ্যদের মধ্য বিতরণ করবে বলে আগেই চেয়েছিল। তার একটি অনুলিপি পাঠাচ্ছি।

প্রবন্ধের সারাংশ

ঐতিহাসিক যুগ থেকেই পাশ্চাত্য জাতি জড় প্রকৃতিকে শত্রু বলে জেনেছে। তাতে এ ধারণা ওদের মনে বদ্ধমূল যে, অখণ্ড সত্তায় দ্বৈতভাব রয়েছে। তাই ভালো ও মন্দে নিরন্তর দ্বন্দ্ব। এ কারণে ইউরোপের সভ্যতার অন্তরে একটি সংগ্রামের ভাব চিরজাগরূক। জয়ের আশায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই তারা শক্তিচর্চা করে।

ভিন্ন পরিবেশ থেকে আর্যরা ভারতবর্ষে এসে দেখলেন চারিদিকে অরণ্য। অরণ্যের একটি জীবন্ত সত্তা আছে— এ সমুদ্র বা মরুভূমির মতো নয়, এ প্রাণের আশ্রয় ও পুষ্টি জোগায়। এই পরিবেশে ভারতবর্ষের অরণ্যবাসীরা বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলেন। তাতে সত্যের অদ্বৈত রূপটিই তাদের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই ভূমার সঙ্গে মিলিত হয়েই তাঁরা আত্মার অনুধ্যান করেছিলেন।

এই যে সংগ্রামশীলতা ও মিলনের মহাভাব— সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতযন্ত্র নির্মাণে যন্ত্রশিল্পী বস্তুর দুর্দম কাঠিন্যকে নিজের প্রয়োজন মতো বশে আনে। সংগীত কিন্তু সৌন্দর্যেরই অভিব্যক্তি, সংগ্রামের নয়— গভীর রসানুভূতি থেকেই এর জন্ম। সংগীত এবং যন্ত্র উভয়েরই প্রয়োজন আছে মানুষের।

যে সভ্যতার মূল কথা যুদ্ধ এবং জয়লাভ— আর বিশ্বাত্মবোধ যে-সভ্যতার প্রাণ— এই দুই সভ্যতাই পরস্পরের পরিপূরক। এরা যখন যুক্ত হয় তখন

মানবপ্রকৃতিতে সাম্য ফিরে আসে এবং বিঘ্নসংকুল এই পথেই মানুষ পূর্ণের মধ্যে পরম সার্থকতা খুঁজে পায়।

ওতুর দ্যু মঁদ। প্যারিস। ২১ এপ্রিল ১৯২১

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন পশ্চিমে যখন জানিয়েছিলেম, তখন শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি ব্যবহার করেছি। কিন্তু এই শব্দটির যে কেবল একটি অন্তর্নিহিত অর্থই আছে তা নয়, যাঁরা এটি ব্যবহার করেন তাঁদের কাছে এর একটি পরিচিত বাইরের রূপও আছে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা ছক আমার পরিকল্পনাটিকে গ্রাস করে ফেলে, তাতে ক্ষোভ হয়।

বিদেশী মিউজিয়ামের মরা প্রজাপতির মতো আমার আইডিয়াটিকে একটি ছোট্ট আলপিনের ডগায় আবদ্ধ রাখতে পারি নে। তাই কেবলমাত্র একটি শব্দে এর পরিচয় দেওয়া যায় না, ক্রমপরিণতিতেই এর পরিচয়।

শিক্ষাবিভাগের স্টীমরোলারের চাপ থেকে গোড়ার দিকে আমি শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করেছি। আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থসংগতি কম, সাজসরঞ্জাম নেই। কিন্তু এর মধ্যে সত্যের যে সম্পদ আছে, তা অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় না। বরং এতেই আমার গর্ব যে, এ কারখানার তৈরি যন্ত্রে-গড়া জিনিস নয়— এ আমাদেরই, 'আমাদের সব হতে আপন।'

বিশ্ববিদ্যালয় যদি গড়তেই হয়, তার উদ্ভব হোক আমাদের জীবনের অঙ্গরূপে ও জীবনের স্বাভাবিক প্রসারণেই হোক তার পরিপুষ্টি। কেউ কেউ বলবেন ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁদের মতে ছাঁচেঢালা শিক্ষাবিধির সাহায্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ব কমে— কাজও সহজ হয়ে আসে। জীবন পরিচালনায় সংশয় সংকট আছে জানি, আর অবাধ স্বাধীনতায় শঙ্কাও কম নয়। তবু বলি, অপরিসীম মূল্য সেই দুরূহ সাধনার— ভবিষ্যৎ ফলাফল তার যাই হোক।

এতকাল আমি আমার স্বাধীনতার মর্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পেরেছি। তার কারণ, নিজের সংগতিতে আমার আস্থা ছিল। তাই গর্বভরে তারই সীমার মধ্যে কাজ করে গেছি। আমার পাখি তার ডানার স্বাধীনতা রক্ষা করবে— কারো পোষ-মানা হয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব হারাবে না।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারটি জটিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের মতো করে তাকে আমি সহজ করে নেব। এমন সব লোক— যাঁদের নাম নেই, যশ নেই, পার্থিব সম্পদ কিছু নেই, অথচ যাঁদের মনস্বিতা আছে, বিশ্বাসের সজীবতা আছে, যাঁরা তাঁদের স্বপ্ন দিয়ে বিরাট ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবেন— তাঁরা যদি এখানে আকৃষ্ট হয়ে আসেন, তবেই খুশি হব। প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী সম্মানিত ট্রাস্টীদের সঙ্গে খুব সম্ভবত আমার কাজ করা চলবে না— কারণ আমি যে মনেপ্রাণে দলছাড়া। এ জগতের শক্তিশালী লোকেরা, এ মর্তভূমির প্রভু যারা— তারা যে আমাকে নিজের কাজই করতে দেয় না। শান্তিনিকেতনে নানা সূত্রে এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। অকৃতকার্য হবার ভয় আমার নেই। বরং সফলতার সন্ধানে পাছে সত্য থেকে বিচ্যুত হই— এই আশঙ্কা মনে জাগে। সেই লোভ মাঝে মাঝে এসে আমাকে আক্রমণ করে। তবে সেটা বাইরের দিক থেকেই আসে। অন্তরের অন্তস্তলে আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে মুক্ত দীপ্ত এই মহাজীবনে। আমার প্রার্থনা হল— 'অসতো মা সদ্‌গময়'— সত্যে আমাকে প্রকাশ কর।

আজকের চিঠি এই সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে যে, সহায়-খোঁজার মোহপাশ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করেছি। আপনারা সেই ঘরছাড়া বৈরাগীর দল— যাঁদের দেখতে অসহায় অথচ যাঁরা দেবসেনাবাহিনীতে নিযুক্ত— তাঁদের মহাসঙ্ঘে যোগ দিতে আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

স্ট্রাসবুর্গ। ২৯ এপ্রিল ১৯২১

স্ট্রাসবুর্গ থেকে এ চিঠি লিখছি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ রাতে একটি ভাষণ পড়ব।

এই সব মুহূর্তে আপনার অভাব বড়ো অনুভব করি। ইউরোপ মহাদেশের যে যে স্থানে আমি ভ্রমণ করেছি, আমার প্রতি সেখানকার লোকের প্রেমোচ্ছল আবেগ দেখলে যে আপনি অভিভূত হয়ে যেতেন সে আমি নিশ্চয় জানি। এমন তো কখনো আমি চাই নি, তা পাবার চেষ্টাও কোনোদিন করি নি। বিশ্বাসও হয় না যে, এ সম্মাননার যোগ্যতা আমার আছে। পাওনার চেয়ে যদি বেশি পেয়ে থাকি, সে ভুলের জন্যে আমি দায়ী নই। কারণ গঙ্গার ধারে নিস্তব্ধ বালিচরে চক্রবাকদের প্রতিবেশী হয়ে প্রচ্ছন্নতার মধ্যেই আমি

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে কাটিয়ে যেতে পারতুম।

জীবনের বেশির ভাগ সময়—
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন
আকাশে।

ফসল কিছু ফলল কিনা তার দিকে ফিরেও তাকাই নি। আর এখন সেই ফসল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। তা আজ প্রায় আমার চলার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। অথচ তাকে নিজের বলে দাবি তো করতে পারি নে।

ভূগোলের, ইতিহাসের এমন-কি ভাষার দূরত্ব পর্যন্ত ঘুচিয়ে মানুষের কাছ থেকে এই যে স্বীকৃতি পাওয়া, এ একটি মহাসৌভাগ্য। এই তো সত্য, এই তো প্রমাণ যে মানুষের মনের সর্বত্র একই ধারা। স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ সংঘাত— এ সবই জীবনের বিকৃতি।

কাল আমরা সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছি। তার পরে জার্মানীতে যাব। এ বছর জুরিখে আমার জন্মদিন কাটাব। পশ্চিমে আমার দ্বিতীয় জন্ম— তার ফলেই এই আনন্দোৎসব। সব মানুষই প্রকৃতিতে দ্বিজ— প্রথমে তারা জন্মায় নিজগৃহে, পরে জীবনের সার্থকতার দাবীতে বৃহত্তর পৃথিবীতে তাদের জন্ম হয়। আপনার দ্বিতীয় জন্ম যে আমাদের মধ্যে তা কি আপনি নিজে বুঝতে পারেন না? এই দ্বিতীয় জন্মেই আপনি মানবের চিত্তে আপনার যথার্থ স্থানটি অধিকার করেছেন।

এই স্ট্রাসবুর্গ শহরটি বড়ো সুন্দর, আজ সকালের আলোটিও বড়ো মধুর। সোনার রোদ্দুর আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আমার ভাবনাগুলোকেও রাঙিয়ে তুলল। মনে হয় এবার গেয়ে উঠি—

আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

যে ঘরখানিতে বসে আছি সেখানি অতি মনোরম। ব্ল্যাক-ফরেস্টের অরণ্যপ্রান্ত জানালার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের গৃহস্বামিনীটিও ভারি চমৎকার মহিলা। তাঁর ছোট্টো মিষ্টি বাচ্চাটি তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে আমার চশমার রহস্য অনুসন্ধান করতে ভালোবাসে।

আমাদের এখানে ভারতীয় ছাত্র অনেক আছে। তাদের মধ্যে একজন হল লালা হরকিষেণলালের ছেলে। সে আপনাকে তার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন

পাঠাচ্ছে। সরল হাসিখুশি, ভারি সুন্দর ছেলেটির ধরণ। শিক্ষকরাও তাকে খুব স্নেহ করেন।

গত সপ্তাহের চিঠিগুলি আমরা পাই নি। সেগুলি হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভূমধ্যসাগরের এ অপরাধ কিন্তু আমি মার্জনা করতে পারি নে। এ সপ্তাহের চিঠি আসারও সময় হয়েছে। টমাস কুক যদি একটু তৎপর হন, তবে হয়তো আজই পেয়ে যেতে পারি।

জেনিভা। ৬ মে ১৯২১

আজ আমার জন্মদিন। তবে তাতে আমি মনে কোনো বিশেষ আনন্দের সাড়া পাচ্ছি নে। বস্তুত এ দিনটির বিশেষত্ব যারা আমাকে ভালোবাসে তাদেরই কাছে— আমার কাছে নয়। আজকের দিনটিতে আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছি বলে পঞ্জিকার একটি দিন ছাড়া এর আর অন্য কোনো তাৎপর্যই আমার চোখে পড়ে না। আজ আপন মনে কাটাবার নিরালা অবকাশ পেলে বেশ হত। কিন্তু তাও তো সম্ভব হল না। সারাদিন অজস্র আগন্তুক এসেছেন, অবিরত কথাবার্তা চলেছে। দুর্ভাগ্যবশত তার কিছু অংশ রাজনীতি ঘেঁষে গেছে। তাতে আমার মনের আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়ে যায়, পরে আবার আমাকে অনুশোচনা করতে হয়।

রাজনৈতিক তর্ক মাঝে মাঝে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মতো হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে শরীরে মনে একটা অস্থিরতার ভাব রেখে যায়। রাজনীতি আমার প্রকৃতির একেবারেই বিরোধী। তবু হতভাগ্য দেশে অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মেছি বলে আমাদের পক্ষে এসব উচ্ছ্বাস এড়ানো দুঃসাধ্য। এখন একা বসে মনে ভাবি— যেখানে ফুল ও তারার অন্তহীন ছন্দে পৃথিবীর সব অন্যায় মিলিয়ে গিয়ে সুষম হয়ে ওঠে, সেই অসীম শান্তির অন্তরে ডুবে গিয়ে আমার চিত্তটিকেও শান্ত স্থির করে নিই।

কিন্তু জগৎ জুড়ে মানুষের দুঃখ, আমার মনও বিষণ্ণ। গান দিয়ে এই দুঃখকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে বিশ্বাত্মার অতল গভীরতা থেকে চির আনন্দের বাণীটি তুলে এনে যদি পৃথিবীর ক্রোধজর্জর বা লজ্জাভারাবনত মানুষগুলিকে শুনিয়ে বলতে পারতুম— 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' এই যে প্রকাশমান জগৎ, এ আর

কিছুই নয়, তাঁর অন্তহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দেই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

অভিযোগের কথা, বিদ্বেষের কথা— সেগুলো আমি কেন ভাষা দিতে যাব? সত্যের মহাশান্তি থেকে যে অমৃতবাণীর উদ্ভব হয়েছে, যা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি দূর করে দেয়, ঘৃণাকে ক্ষমায় রূপান্তরিত করে— তারই জন্যে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

পূর্বপশ্চিমে সংযোগ হয়েছে। ইতিহাসের এই ঘটনাটি এতকাল ধরে আমাদের তুচ্ছ রাজনীতিরই সৃষ্টি করেছে। কারণ তা এখনো সত্যে পরিণত হয় নি। সত্যের এই অপ্রকাশ দুপক্ষেরই ভারস্বরূপ। লাভের বোঝাও ক্ষতির বোঝার চেয়ে তো কম পীড়াদায়ক নয়। এ যে প্রাচুর্যের বোঝা, স্ফীতির বোঝা। পূর্বপশ্চিমের এই মিলনযোগ এখনো মাত্র উপরের স্তরে রয়েছে— এ বাইরের জিনিস। এর ফলে আমাদের সম্পূর্ণ মন বাইরের দিকেই নিবদ্ধ। সেখানে কেবলই আমরা আঘাত পাচ্ছি অথবা পার্থিব লাভক্ষতির হিসেবই করছি। ৮

কিন্তু এই যোগ-সংঘটনেরই অন্তরে ভবিষ্যৎ সম্মিশ্রণের বীজ বর্ধিত হচ্ছে। তা যখন উপলব্ধি করি— বর্তমানের কঠিন চাপ থেকে সরে গিয়ে আমাদের মন নিরবধি কালে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রখর নৈরাশ্যের হাত থেকে সে মুক্তি পায়। পূর্বপুরুষের প্রজ্ঞার অধিকারে জানি জগতের সকল ক্ষণস্থায়ী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিধৃত করে রয়েছেন একম্ অদ্বৈতম্— দুই এর অন্তরে যে এক, সেই তিনি। পূর্ব ও পশ্চিমে যে দ্বৈতভাব— তার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে মৈত্রীবন্ধন, তাই মিলনে এর পরিসমাপ্তি হবেই।

এই মহান্ সত্যকে আপনি নিজ জীবনে প্রকাশ করেছেন। ভারতের প্রতি প্রেমে আপনি সেই পরম একের বাণী বহন করেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আপাতসংঘাত রয়েছে। কিন্তু আপনার মহানুভবতায় এই দুই দিগন্তের সম্মিলনে নিত্যসত্যের অম্লানসৌন্দর্য উন্মোচিত হল। আমরা যারা প্রতিশোধ-স্পৃহায় কোলাহল করছি, তারা কেবল পূর্বপশ্চিমের অনৈক্য সম্বন্ধেই সজাগ রয়েছি, তাই দুই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য কাম্য মনে করি। ইতিহাস-বিধাতার সুমহান অভিপ্রায় কি, তা আমরা ঠিক ধরতে পারি নি।

ক্রোধ যে মহাতামস— তাই তমসাচ্ছন্ন দৃষ্টি ক্ষুদ্র ঘটনাকে বৃহৎ করে প্রতি পদেই মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। প্রেমের আলোকেই অন্তর্মিলের পূর্ণচ্ছবিটি

স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তখনই আমরা বিচ্ছিন্নতার আঘাত থেকে, প্রত্যক্ষের রূঢ়তা থেকে মুক্তি পাই।

আজ তবে আপনি আমার সাদর আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। আপনার ভালোবাসায় এই দিনটিতে আমার প্রাণ ভরে নিই, জন্মদিনের নমস্কারও সঙ্গে রইল।

জুরিখের কাছে। ১০ মে ১৯২১

জার্মানী থেকে এইমাত্র আমার জন্মদিনের শুভেচ্ছাবাণী পেলুম। অয়কেন, হারন্যাক, হউপ্‌ম্যান ও আরো কজন মিলে এক কমিটি থেকে পাঠিয়েছেন। বহুমূল্যবান চারশোখানি জার্মানগ্রন্থের একটি উপহারও এর সঙ্গে আছে। এতে আমি ভারি অভিভূত হয়েছি। আমার দেশের লোকের মনেও যে এটি গভীরভাবে স্পর্শ করবে, আমি জানি।

আগামীকাল জুরিখে আমার আমন্ত্রণ আছে। এ মাসের ১৩ই সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে জার্মানীতে যাব। কোনো একখানি চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছি, আকাশচারী মিতা রবির মতো আমারও জীবনের শেষ পরিক্রমা এই পশ্চিম-প্রান্তে। এই দাবী যে কত সত্য তা ইউরোপ মহাদেশে ভ্রমণের আগে বুঝতে পারি নি। এর জন্যে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ মানুষের কাছ থেকে যথাযথ প্রশংসা মেলা আনন্দের ঠিকই, কিন্তু আকৃতি প্রকৃতিতে যাদের এত পার্থক্য তাদের সঙ্গেও মনের মিলের পরিচয় পাওয়া যে পরম লাভ।

ভারতবর্ষে এমন সুযোগ কমই পাই, কারণ বৃহত্তর জগতের সংযোগ আমরা হারিয়েছি। আমাদের এই বিযুক্তি জনচিত্তের উপর দুটি পৃথক ভাবে কাজ করে। এর ফলে একটি অনুদার সংকীর্ণ সীমাগত দৃষ্টিভঙ্গী এসে পড়ে। তাই উদ্ধত গর্বে কখনো আমরা ঘোষণা করি সর্বতোভাবে বিশিষ্ট আমাদের এই ভারতবর্ষ। অথবা নিজেদের এতই ক্ষুদ্র করে দেখি যে, তা প্রায় আত্মহননেরই নামান্তর। মরমী মন নিয়ে যদি বিচিত্র এ নিখিলের দ্বারে পৌঁছতে পারি, তবেই মানবজগতের প্রতি দৃষ্টিপাতের ঠিক পরিপ্রেক্ষিতটি খুঁজে পাই। সেখানে নিজেদের স্থান কোথায় তাও বুঝতে পারি, আর সে সম্পর্কটিকে প্রশস্ততর ও গভীরতর করার সম্ভাবনায় সংশয় থাকে না। জীবনধারা ও

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকা যে গর্বের বিষয় নয়, তা আমাদের বোঝা উচিত। 'যে তারা জ্যোতির্হীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না, কিন্তু জ্যোতির্ময় তারাগুলি আলোকের অখণ্ড সংগীতে যোগ দেয়।'

গ্রীস তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীতে থাকে নি। ভারত যখন গৌরবের উচ্চশিখরে সমাসীন, তখন সেও বিচ্ছিন্ন ছিল না। সংস্কৃতে একটি প্রবচন আছে— 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'— যা আগলে রাখতে চাই, তার বিকার ঠেকানো যায় না। ভারতবর্ষ যদি আপন মহৎ পরিচয় চায়, তবে বিশ্বজগৎকে কিছু দিতে হবে। দানের শক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে গ্রহণের শক্তির সঙ্গে মিলিত হলে তবেই। যে-শক্তি কেবল বর্জনই করতে পারে, দান করতে পারে না, সে মৃত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বর্জনের যে সজোর ঘোষণা আজ আমাদের দেশে শোনা যাচ্ছে, তাতে পশ্চিমকে দেবার আমাদের নিজের যে ক্ষমতা ছিল, তাকেই মিথ্যে খর্ব করা হবে। এই মানব-সংসারে দানের মধ্যেই বিনিময়ের ভাব থাকে, তাই মাত্র একদিক থেকে দেওয়া বা নেওয়া চলে না। পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নয়, নিজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সজাগ থেকে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। তবেই পশ্চিমের শিক্ষার মূল্য দেবার উপায় আমাদের হাতে আসবে। সত্য সম্পদ— সে পার্থিব বা পারমার্থিক হোক— আহরণের মধ্যে তার মূল্য নয়, গ্রহণের স্বাধীনশক্তিতেই তার মূল্য।

আমাদের ধীসম্পদ বিদেশী দাতার প্রসাদপুষ্ট ছিল বলে দীর্ঘদিন আমরা সঞ্চয়ই করেছি, আয়ত্ত করতে পারি নি। তাই আমাদের প্রতিভা রয়েছে বন্ধ্যা। এই নিষ্ফলতার কারণ হিসেবে যদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে দায়ী করি, তবে তা অনুচিত হবে। এই সংস্কৃতি ধারণের জন্যে নিজেদের পাত্র ব্যবহার করি নি, আমাদের ত্রুটি হল সেইখানে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এরকম পরাশ্রয়ী হয়ে থাকার ফলে চিত্ত তার উন্মেষশক্তিকে হারায়। প্রত্যাখ্যান করতে হবে পশ্চিমের জ্ঞানের অন্ন নয়, পরজীবী হবার যে প্রবৃত্তি আমাদের, তাকেই।

আধুনিক শিক্ষার ত্রুটি বিশ্লেষণের সূত্রে মহাত্মা গান্ধী যে রামমোহন রায়ের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের নিন্দা করবেন, তার প্রতিবাদ না করে আমি পারি নে। এত রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এখনো রামমোহনের মতো যুগসাধকের জন্ম হয়। ভারতমাতার সেই সব বিশ্বপ্রাণ- সম্বুদ্ধ সন্তানের জন্য

প্রত্যেক ভারতীয় যেন গর্ববোধ করে। মহাত্মাজী নানক কবীর প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনে ও শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ই করেছিলেন। সকল পার্থক্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐক্য, তার উপলব্ধিতেই হল ভারতীয় মনীষার সার্থক পরিচয়।

আধুনিক যুগে রামমোহন রায়ের চিত্তের সেই ব্যাপকতা ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান সংস্কৃতির মধ্যে মূলগত ঐক্য অনুধাবন করেন। তাই তিনিই সত্যভাবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই সত্যের ভিত্তি বহির্বিবর্জনে নয়, সমন্বিত পূর্ণতায়। রামমোহন পশ্চিমকে স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ছিল সম্পূর্ণ প্রাচ্য। ভারতীয় জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকার তিনি বহন করেছেন। তিনি পশ্চিমের ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন না, তাই তাদের বন্ধু হবার মর্যাদা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আধুনিক ভারত যদি তাঁকে না বুঝতে পারে, তবে বুঝব অন্ধ বিদ্বেষের ঝড়ে তার নিজস্ব সত্যের নির্মল আলোক সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

হামবুর্গ। ১৭ মে ১৯২১

এদেশ পরিক্রমণের দিনগুলিতে আমি পেয়েছি অভাবিত দাক্ষিণ্যের কিরণসম্পাত। এতে যেমন আনন্দ পাই, বিব্রতও বোধ করি। এদের দেবার মতো আমার কী আছে। সত্যই কি এরা আমার বাণীতে মুক্তির বার্তা পেয়েছে? দেখছি রাত্রির উচ্ছৃঙ্খল উৎসবের অবসানে এরা সূর্যালোকের অপেক্ষা করছে। সেই আলো পূর্বদেশ থেকে আসবে— এমনই এদের বিশ্বাস।

সমস্ত পৃথিবীতে যে জ্যোতির্ময় প্রভাতসূর্যের অভ্যুদয় আসন্ন, ভারতের অন্তরে কি সেই স্পন্দন পৌঁছেছে? তার একতারার একটি তার কি বাঁধা হয়েছে? মানবের সুমহান ভবিষ্যতের আশার সংগীত যা পৃথিবীময় অনুরণন জাগাবে, তার মূল সুরের ধুয়োটি কি ভারত ধরিয়ে দিতে পারবে? কবীর নানকের মতো ভারতের মধ্যযুগীয় সন্তদের চিত্তে ভগবৎপ্রীতিই মানবপ্রেমের ধারায় নেমে এসেছিল, সেই প্রবাহে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের বাঁধে ভাঙন ধরল।

এই ঐক্যসাধক মহাত্মারা শক্তিতে খর্ব ছিলেন না, দৈত্যের মতোই তাঁরা

শক্তিধর। কারণ, সাময়িক কালের বন্ধন অতিক্রম করে তাঁরা অনন্ত সম্ভাবনার আশ্বাস পেয়েছিলেন তাঁদের অধ্যাত্মদৃষ্টিযোগে। সেই সময়কার চেয়ে আমাদের কালের মানবজগতের পরিধি বিস্তৃত। জাতীয় স্বার্থ ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এখন আরো অনেক প্রবল ও জটিল। রাজনীতির আঁধি দৃষ্টি রুদ্ধ করায় জাতিগত ঈর্ষার ঘূর্ণিঝড়ে সকলে বিপর্যস্ত, তার ফলে জগৎজোড়া দুঃখের শেষ নেই।

বর্তমান যুগ একটি দৈববাণীর অপেক্ষায় আছে। সেই সরল উদাত্ত মন্ত্রেই আছে উজ্জীবনী শক্তি, আছে দুঃখহরণের অমৃত। এই মহাদেশের আর্ত মানুষের আত্মা কী অসীম আগ্রহে প্রাচ্যের দিকেই তার প্রত্যাশার দৃষ্টি ফিরিয়েছে, দেখে বিস্মিত বোধ করছি।

সেই মন্ত্র যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, তিনি রাষ্ট্রনেতা নন, পণ্ডিতও নন— তিনি একটি সহজ মানুষ, প্রাণে যাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাঁর নির্মল চিত্তের স্থির প্রত্যয়ে যেন আমরা আস্থা রাখি— তাঁর আশ্বাসবাণী আমাদের পরম লক্ষ্যে নিশ্চিতই পৌঁছে দেবে।

গৌরবভ্রষ্ট ভারতবর্ষ আজকের দিনে অজস্র বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও তার অন্তরতলে অমৃতমন্ত্র ধারণ করে রেখেছে— শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

একদা এই ভারতের তপোবনচ্ছায়ে ধ্বনিত হয়েছিল সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বিতীয় একের মিলনমন্ত্র। মানবসন্তান— যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভুলে গিয়ে আজ পরস্পর যুদ্ধরত— তাদের মিলনসাধনের জন্য সেই বাণী অপেক্ষা করে আছে।

আধুনিক ভারতে যাঁদের দৃষ্টিতে এই সত্য প্রতিভাত হয়, তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়ই হলেন অগ্রণী এবং মহত্তম ব্যক্তি। তিনি উপনিষদের পূত আলোক এযুগে বিশ্বক্ষেত্রে উদ্‌বারিত করে দিলেন। সেই আলোকে জিতাত্মা পুরুষেরা, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্ রূপবিদ্'— নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে জানেন। সেই আলোক বিশ্লেষ-ব্যবধানের নয়, সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হবার সহায়।

মুসলমানরা যে সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে তা ছিল প্রবল বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। কিন্তু সে সমাজের সাধুসন্তদের মনেও উপনিষদের বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্য যেখানে অসম্ভব মনে হয়,

সেখানেও মূলগত ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন বলেই এই সত্যে এঁদের শ্রদ্ধা জন্মে। রামমোহন রায়ের সময় পশ্চিম যে ভাবে পূর্বদেশকে আঘাত করেছে, তাতে ভারতের অন্তরে আশঙ্কা জেগেছিল। তাই পশ্চিমকে বর্জনের জন্য প্রাচ্যের অন্তরে উত্থিত ক্রন্দন স্বাভাবিক। কিন্তু সে ক্রন্দন ভয়ের, সে ক্রন্দন দুর্বলের, সে ক্রন্দন বীর্যহীন ক্লীবের। রামমোহনের সর্বতঃ প্রসারিত বিশাল চিত্তের তেজোদ্দীপ্ত স্পর্শে ভারতের ভীত সন্ত্রস্ত সত্তা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠল। সেদিন সে উদার চিত্তে পাশ্চাত্যকে যে স্বীকৃতি দিল, তা ভারতের আত্মাকে উপেক্ষা করে নয়, পশ্চিমের আত্মাকে গ্রহণ করে।

যে-মন্ত্র আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টিকে সর্বত্র প্রবেশের অধিকার দেয়, সে মন্ত্র ভারতেরই মন্ত্র। সে মন্ত্র হল শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। পশ্চিমের বিহ্বল চিত্ত ভারতের দ্বারে এসে আঘাত করছে। তাকে কি তবু রুষ্ট চীৎকারে বাইরে সরিয়েই রাখব ?

হামবুর্গ। ২০ মে ১৯২১

আমার দীর্ঘ ভ্রমণ এবারে শেষ হবে আশা করছি। তাই প্রতি মুহূর্তেই সমুদ্রতীরের আহ্বান শুনতে পাই আর ক্লান্ত পথিকের প্রত্যাবর্তনের আশায় বাতায়নতলে নিভৃতে যে সন্ধ্যাদীপটি জ্বলবে, তার ছবিও মনের চোখে ভাসে। কিন্তু একটি চিন্তার গুঞ্জরণ ফিরে ফিরে আমার মন আকুল করে। সেটি এই— যে নৌকো রোদে পুড়ে জলে ভিজে সমুদ্র পার হয়ে এল, তাকে হয়তো প্রাত্যহিক পাঁচমিশেলি কাজে লাগানো হবে।

আজকের দিনে পৃথিবীর কোথাও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নয়। সমস্যাসংকুল চারিদিক। গায়কদের গাইতে দেওয়া হয় না, তাদের উচ্চস্বরে বাণী প্রচার করতে হয়। কিন্তু বন্ধু, আমার জীবনও কি মেরুপ্রদেশের গ্রীষ্মের একটানা দিন হবে— সেই অবিশ্রাম আলোকে অতন্দ্র জাগরণ, নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্যে ঠাসা ? তারা-ভরা রাত্রি কি আমাকে অনন্তের পথ দেখাবে না ? মৃত্যু মানে কি কেবলমাত্র থেমে যাওয়া ? স্বদেশপ্রেমের সীমানার বাইরে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে, তার মধ্যে প্রবেশের পথ কি সে খুলে দেয় না ? জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন করে কবে আমি আত্মার জগতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হব ?

জাতীয় মানচিত্রে যে দেশের ছবি দেওয়া হয় নি তার কোনো মর্যাদাই

নেই— এ শিক্ষা আমরা পশ্চিমের ইস্কুলমাস্টারদের কাছেই পেয়েছি। শিখেছি, আমার দেশই আমার একমাত্র জগৎ এবং তাই আমার স্বর্গ। জীবনের অমরতা যেন আপন দেশের যোগসূত্রেই কেবল লাভ হয়। তাই দেশাত্মবোধের অভিমানে যখন পশ্চিমকে পরিহার করি তখনো হতভাগা ভিক্ষুকের মতো ওদেরই ঝুলি হাতড়ে ওদের নীতিই চুপিচুপি সংগ্রহ করে আনি।

স্বাধীনতা বলতে আমাদের পূর্বপুরুষরা যা বুঝতেন তার ডানা কেটে তাঁরা তাকে ভূগোলের খাঁচায় বন্দী করেন নি। সেই সত্যে সচেতন হবার সময় আমার এসেছে। তাই প্রার্থনা করি, আমি যেন স্বদেশসেবক বা রাজনীতিবিদ হয়ে না মরি, মুক্তাত্মা রূপে যেন আমার জীবনের অন্ত হয়। সাংবাদিক কিছুতেই নয়, কবি হওয়া চাই।

স্টকহল্‌ম্‌। ২৭ মে ১৯২১

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ডেনমার্ক, ডেনমার্ক থেকে সুইডেনে— আমি বসন্তের পথ অনুসরণ করে চলেছি। দেখছি ফুলগুলো রঙের নেশায় মাতাল হয়ে ফুটে উঠছে। এ যেন ধরিত্রীর দিগ্বিজয়ের ঘোষণা। বিজয়কেতন ঊর্ধ্বে উড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমে ভ্রমণকালে আমার পথও স্বাগতসম্বর্ধনায় তেমনই উদ্ভাসিত ছিল।

গোড়ায় আমার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনার কাছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেব। আমি তো জানি, তা শুনে আপনি কত আনন্দ পেতেন। কিন্তু এখন সেসব লিখতে সংকোচ বোধ হয়। কারণ আমার মনেও তা এখন তেমন আনন্দ জাগায় না, কেমন একটা বিষাদের ভাবই আনে। যা পেলুম, তা সম্পূর্ণ নিজের বলে দাবি করা অসংগত। বস্তুত পশ্চিমের চিৎসমুদ্রে যে-জোয়ার এসেছে, তা কোনো এক অজ্ঞাত আকর্ষণের বেগে প্রাচ্যের তীরে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ইউরোপীয় জাতির সীমাহীন গর্ব হঠাৎ যেন কোথায় বাধা পেয়েছে। মনে হয়, তাই ওদের প্রাণমন যে পথ কেটে চলেছিল, সে পথযাত্রায় এমন দ্বিধাসংশয় আজ।

পরিশ্রান্ত দৈত্য এখন শান্তিতে বিশ্রাম চায়। শান্তির নির্ঝরপ্রবাহ পূর্বাঞ্চল হতেই সতত উৎসারিত হয়েছে। তাই ইউরোপ তার বিব্রত অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রাচ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। সে যেন খেলতে গিয়ে আঘাত

পাওয়া একটি শিশু। চারদিককার ভিড় এড়িয়ে সে তার মাকে খুঁজছে। প্রাচ্যদেশ তার প্রাণ হতে প্রাণ দিয়ে আধ্যাত্মিক পিপাসাকাতর মানুষের মায়ের স্থান পূর্ণ করতে কি উন্মুখ নয়?

দুঃখ এই, আমরা ভারতীয়রা জানতে পারি নি যে, ইউরোপ আমাদেরই সাহায্যপ্রার্থী। আজও বুঝি নি, মানবসমাজের এই প্রয়োজনের দিনে তার সেবার আহ্বান আমাদের পক্ষে কতখানি সম্মানের।

আমার অভ্যর্থনায় এসব দেশে যত আড়ম্বর আয়োজন হয়েছে, আমি বিস্ময় বিহ্বল হয়ে তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। শুনি, আমি মানুষকে ভালোবাসি, সেই প্রেমের এই বন্দনা। হয়তো এর মধ্যে সত্য আছে। মানুষের প্রতি আমার প্রেমের বাণীরূপ বাধার পারাবার পেরিয়ে দেশ দেশান্তরে প্রাণ বিস্তার করেছে। সর্বত্রই তা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তাই যদি সত্য হয়, তবে আমার রচনার সেই মূলসুরটি এবার আমার জীবনকেও ওই সুমহৎ লক্ষ্য-পথে চালিয়ে নিয়ে যাক। সেদিন হামবুর্গের হোটেলে একা বসে বিশ্রাম করছি, দুটি জার্মান মেয়ে লাজুক মিষ্টি মুখে গোলাপের গোছা নিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। সে বললে, আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি। আমি তাকে প্রশ্ন করলুম, কেন তুমি ভারতবর্ষকে ভালোবাস? সে উত্তর দিলে, আপনারা যে ভগবানকে ভালোবাসেন, তাই।

প্রশংসাটি এতই মহার্ঘ যে সহজে আমি তা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের কাছে এ দেশের লোকে কী প্রত্যাশা করে, এর কথায় তা কিছু স্পষ্ট হল। সেদিক থেকে একে আমি একটি আশীর্বাণী হিসেবেও নিতে পারি। হয়তো সে বলতে চেয়েছিল— ভারতবাসী ভগবদ্‌ভক্ত বলেই ভারত তার এত প্রিয়। এমন এক আশা ও বিশ্বাস এতে নিহিত আছে যার আবেদন আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

সকল জাতিই নিজ নিজ দেশের প্রতি অনুরক্ত। সেই জাতীয়তাবোধ থেকেই ঘৃণা ও সন্দেহের উৎপত্তি। পৃথিবী এমন একটি দেশের প্রতীক্ষা করছে, যে আপনাকে নয়, এই বিচিত্র বিশ্বের স্রষ্টাকে পূজা করে। একমাত্র সেই দেশই পৃথিবীর সকল দেশের সৌহৃদ্য দাবি করতে পারে।

বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে কানে আসে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, আর তারই সঙ্গে

সঙ্গে প্রতিবেশীদের যদি সরোষে বলতে শুনি, 'তোমরা আমাদের ভাইবন্ধু নও' তবে এর মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য কোথায় পাই? যেহেতু তা অসত্য, তা বাতাসকে ঘুলিয়ে তোলে, আকাশকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সাম্প্রতিক কালে এমন ঘোষণার কারণ যাই থাক, এ যেন Lamb যেমন বলেছেন— শুয়োর পোড়াবার জন্যে বাড়িতে আগুন লাগানো। আত্মতুষ্টি— সে জাতিগতই হোক বা ব্যক্তিগতই হোক, আত্মহত্যা ছাড়া তার অন্য পরিণতি নেই। 'পরমাত্মার প্রতি প্রেমেই আমাদের সত্যতম পরমতম বিকাশ।' সমস্ত সমস্যার, সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষ-সমাধান আমরা এর মধ্যেই খুঁজে পাব।

পরশু আমরা সুইডেন থেকে বার্লিনে যাব। চেকোশ্লোভেকিয়ার গভর্নমেণ্ট বার্লিন থেকে প্রাগে এবং প্রাগ থেকে মিউনিকে আমাদের বিমানে যাবার ব্যবস্থা করবেন জানিয়েছেন। মিউনিক থেকে আমরা ডার্মস্টাট যাব, সেখানে জার্মানীর কয়েকজন খ্যাতনামা লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ের জন্যে সভার আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ই জুনের মধ্যে এসব শেষ হয়ে যাবে, তার পরে ফ্রান্স আর স্পেন হয়ে অন্তত জুলাইয়ের আরম্ভে জাহাজে উঠতে পারব আশা করছি।

বার্লিন। ২৮ মে ১৯২১

আজ আমি জার্মানী ছেড়ে ভিয়েনা যাব। সেখান থেকে চেকোশ্লোভেকিয়া, তার পরে প্যারিস— আর তার পরেই ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেব। ২রা জুলাই আমার জাহাজ ছাড়বে। তাই এই চিঠিই সম্ভবত এদেশ থেকে আমার শেষ চিঠি।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আর জার্মানীতে, যেখানেই গিয়েছি কত আন্তরিক প্রীতিতে যে সবাই আমাকে ঘিরেছিল, সে আপনি ভাবতেই পারবেন না। তবুও স্বদেশে ফিরে যাবার অধীর ইচ্ছাটি আমার মন জুড়ে আছে। সেখানে আমার জীবন কাটিয়েছি, আমার কাজের ক্ষেত্র সেখানে, আমার প্রেমের সাধনাও সেইখানে। দেশে যদি আমার জীবনের ফসল সঞ্চয়ের পুরো দাম নাই পাই, তবে তাতে আমার মনে করার কিছু নেই। ফসল যে সেখানে পরিণতি লাভ করেছে, তাতেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছি। সেই ফসলের ক্ষেত্র থেকেই আমার আহ্বান এসেছে— রবিকর সেখানে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

প্রতিটি ঋতু আমার প্রত্যাগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব। যে-আমি সারাজীবন ধরে সেই মাটিতে আমার স্বপ্নের বীজ বুনেছি— তাকে তারা জানে। কিন্তু আমার পথে যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আমি বড়ো পরিশ্রান্তও। দেশের লোকের কাছে আমি স্তুতিনিন্দা কিছুই চাই নে। কেবল তার উদার আকাশের তলে বিরাম চাই।

বার্লিন। ৪ জুন ১৯২১

আজ আমার বার্লিন ভ্রমণের দিন শেষ হল। আজ সন্ধ্যায় মিউনিক যাত্রা করব। এদেশে আশ্চর্য সমাদর পেলুম। এমন প্রশস্তির আমি যোগ্য নই। এত সহজে, এত স্বল্পদিনে এ পাওনা নয়— কালের প্রেক্ষণে এর যাচাই হয় নি। তাই আমি এসবে এত ভীত হই, এত ক্লান্ত বোধ করি। মনটাও বিষণ্ণ হয়ে যায়।

আমি একটি গৃহদীপমাত্র, ঘরের কোনায় আমার স্থান। স্নেহপ্রীতির নিবিড় আওতাতেই আমার পরিচিতি। তাই আমার আলোটুকু নিয়ে যদি আতশ-বাজির বহ্ন্যুৎসব-সমারোহ হয়, তবে সংকোচে আমাকে নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে মাপ চাইতে হয়।

বার্লিন থিয়েটারে ডাকঘর নাটকের অভিনয় দেখলুম। যে মেয়েটি অমল সেজেছিল, সে চমৎকার অভিনয় করেছিল। সব মিলিয়ে জিনিসটি সুন্দরই হল। তবে বিচিত্রায় আমরা যে অভিনয় করেছিলুম, তা থেকে এর রূপের বদল করে ফেলেছে। তফাৎটা আমি মনে মনে বুঝে নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে একজন— মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অটো এ বিষয়ে কথা তুললেন। তিনি বললেন, জার্মান ভাষায় নাটকটির যে রূপান্তর ঘটেছে, তাতে এটিকে একটি রূপকথার মতো করেই দেখানো হয়েছে। আসলে কিন্তু নাটকটির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অধ্যাত্মরসমণ্ডিত।

যখন আমি নাটকটি লিখছিলুম, তখন কোন্ ভাবের প্রেরণা পেয়েছি, তাই এখন মনে পড়ছে। অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে। মানী লোকের কড়া মতামতের খাড়া দেয়াল আর অভিজ্ঞ লোকের বিধিবদ্ধ অভ্যাসের বেড়া— এ সবের হাত থেকে সে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু বিষয়ীলোক মাধব দত্ত তার চঞ্চলতাকে মারাত্মক রোগের লক্ষণ বলে ধরে

নিলে। তার পরামর্শদাতা কবিরাজও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শ্লোক আউড়ে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললে, ছাড়া পাওয়াটা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়, রোগীকে যথাসম্ভব ঘরের বন্ধনীর মধ্যে ধরে রাখা চাই। তাই এত সতর্কতা।

এ দিকে জানালার সামনে ডাকঘর বসেছে। অমল রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে। সে চিঠি রাজার কাছ থেকে তার মুক্তির বাণী নিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত রাজবৈদ্য এসে দ্বার খুলে ফেললেন। প্রচলিত ধর্মবিধি ও বিষয়বিত্তের জগতে যা মৃত্যু বলে পরিচিত, তাই অমলকে আত্মার মুক্তলোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিলে।

তার সেই নবজন্মান্তরে একমাত্র জিনিস যা সঙ্গে গেল, তা হল সুধার দেওয়া প্রেমের ফুলটি।

সেই প্রেমের মূল্য আমিও জানি। তাই তো আমার রানীর কাছে এই আবেদন— 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'। নিত্যপ্রাতে তাঁর গলার মালা গাঁথাই হবে আমার পুরস্কার।

আমাদের দেশের এই অবস্থায় 'ডাকঘর' নাটকের অন্য কোনো অর্থ কি আপনার মনে আসে? ভারতবর্ষের মুক্তির বাণীও রাজার দূতের হাতেই আসা চাই— ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছ থেকে নয়। এদেশ যেদিন জাগবে, কোনো দেয়ালই তাকে আর রুদ্ধ রাখতে পারবে না। রাজার চিঠি কি এখনো সে পায় নি?

দিনুর কাছে এ গানটি শুনে নেবেন—

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত।
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে।
অম্বরপ্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

আজ ৫ই জুন। ৩রা জুলাই জাহাজ ছাড়বে।

ডার্মস্টাট। ১০ জুন ১৯২১

জার্মানীর সব অংশ থেকেই প্রতিনিধি কয়েকজন ডার্মস্টাটে একটি সভায় আমাকে আহ্বান জানান। হেস্-এর গ্র্যাণ্ড ডিউকের বাগানে সবাই সমবেত হলেন। সেখানে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন। তার উত্তরে আমি যে ভাষণ দিই, যাঁরা ইংরেজী বোঝেন না তাঁদের কাছে কাউণ্ট কাইজারলিং তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দিলেন।

গতকাল আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। বিকেলে আমাদের প্রথম সভাটি হয়ে গেছে।

প্রথম প্রশ্নটি করলেন একজন ক্যানাডিয়ান জার্মান। প্রশ্নটি হল, এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি?

আমার বক্তব্য শেষ হলে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন— অতিপ্রজনন সমস্যার সমাধান কি হতে পারে?

সে আলোচনার পরে তাঁরা আমাকে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন।

এই তিনটি বিষয়ে পুরো তিনঘণ্টা বলেছি। এ দেশের লোকদের একাগ্র জিজ্ঞাসা দেখলেও আনন্দ হয়। জীবনের গভীর সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করার মানসিক অভ্যাস তাঁদের আছে। যে কোনো আইডিয়া নিয়ে তাঁরা গম্ভীর ভাবে বিচার করতে পারেন। ভারতবর্ষে আমাদের আধুনিক বিদ্যালয়ে আমরা কেবল পাঠ্যবই থেকেই ভাব সংগ্রহ করি। পরীক্ষা পাসমাত্রই তাদের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া এখনকার আমাদের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও প্রায়ই ইংরেজ। অন্য সব পাশ্চাত্য জাতির চেয়ে ভাবের আবেদন তাঁদের কাছে কম। তাঁরা সৎ, সাধুপ্রকৃতির আর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দৈহিক শক্তির এমন প্রাচুর্য যে তাঁরা মল্লযুদ্ধ, শিকার, দৌড় ইত্যাদিতে বেশি আসক্ত হন এবং উচ্চচিন্তার ছোঁয়াচ যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চলেন।

অতএব বুঝতে পারছেন, এই ইংরেজ গুরুরা আমাদের মনে অনুপ্রাণনা জাগাতে পারেন না। মানব-জীবনধারণের জন্য যে ভাবগ্রাহিতারও প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে সেটি ধরা হয় নি। যে অন্তর্প্রেরণা আত্মার শক্তি— তা এতে আমরা পাই নে। এখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হয়েছে তুচ্ছ রাজ-নীতি ও সেই পেশারই মত্ত অনুসরণ। তার মূল লক্ষ্য হল সফলতালাভ, তার

পথ চলে আপসের বক্র অসরল গতিতে। প্রত্যেক দেশেই রাজনীতি নৈতিক জীবনের মান নাবিয়ে দিয়েছে। তাতে মিথ্যা ও ছলনার, নিষ্ঠুরতা ও কপটতার নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। স্থূল অসার আত্মশ্লাঘার জাতিগত অভ্যাস অত্যধিক বেড়ে গেছে।

এস. এস. মোরেআ। ৫ জুলাই ১৯২১

মাটি আমাদের আতিথ্য দেয়, তাই আমাদের উপর তার দাবি আছে। কিন্তু সমুদ্রের তা নেই। কারণ, মানুষের প্রতি তার সুগভীর ঔদাসীন্য। তার জলকল্লোল আকাশের সঙ্গে সংলাপেই নিরন্তর ব্যস্ত। এই দুই চিরসখা—জল ও আকাশ—সৃষ্টির প্রথম দিনের দায়িত্বহীন শৈশব অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

জীবনবহনের উপযোগী অনুশাসন আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় এই স্থলভূমি। তাই আমাদের বক্তৃতা শুনতে হয়, পাঠ্য বই নিয়ে বসতে হয়। সাহিত্যিক কাগজের নৌকো তৈরি করে যখন ভালো কাগজ নষ্ট করি, তখন অভিভাবকের অধিকার থাকে আমাদের শাসন করার। সমুদ্রে কিন্তু কোনো নৈতিক বালাই নেই। বিধিবদ্ধ জীবনের কোনো ভিত্তি সেখানে নেই। তরঙ্গগুলি মাথা তুলে একমাত্র আদেশের বাণী উচ্চারণ করে চরৈবেতি, এগিয়ে যাও।

জাহাজে উঠে লক্ষ্য করেছি, সেখানে স্ত্রীপুরুষে কি ভাবে খেলার ছলে প্রণয়ের ভাণ করে। তার কারণ, আমাদের সমস্ত দায়িত্বজ্ঞান ধুয়ে মুছে দেবার ক্ষমতা আছে জলের। তাই স্থলে যাদের দেখতে পাই ওক গাছের মতো শক্ত, জলে তারা সামুদ্রিক শ্যাওলার মতো ভাসমান। মানুষের জীবনে যে অসংখ্য শিকড় আছে, আর মাটির কাছে যে তাদের কোনো জবাবদিহি আছে, সমুদ্র মানুষকে সে-কথা ভুলিয়ে দেয়।

সেই কারণেই পদ্মার বুকের উপর যখন ছিলুম, তখন আমি গীতিকবি ছাড়া আর কিছুই ছিলুম না। কিন্তু যেদিন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিয়েছি, তখন থেকে ইস্কুল মাস্টারের সমস্ত লক্ষণ আমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। রীতিমত প্রচারক হয়ে জীবন শেষ করার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এখন থেকেই সকলে আমার কাছে বাণী চায়। হয়তো এমন দিন আসবে, আমি তাদের

নিরাশ করতে ভয় পাব। কারণ বিশেষ দৌত্যে ধর্মগুরুদের যখন সত্যই একদিন আবির্ভাব হয়, তখন সংশয়ী মানুষ তাদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। আবার লোকে যাদের গুরু বলে মেনে প্রত্যাশার আসনে বসায়, পরিণামে তাদের অক্ষমতার দায়ে ব্যঙ্গের হাস্যেই চিরবিলুপ্তি ঘটে। যুগবাণীর দূত এই বীরের দল আত্মদানেই আপন উদ্দেশ্যসাধন করে মহনীয় হন— কিন্তু অন্য বিড়ম্বিত জীবনগুলির কী দুর্গতি, কী অপচয়। তারা মানুষকেও তৃপ্ত করে না, দেবতাকেও নয়।

এই সর্বনাশের হাত থেকে কবিকে বাঁচাবে কে? আমার অকিঞ্চিৎকরতা আর কি ফিরে পাই নে? যে পাথেয় হাতে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়েছিলুম —বিনা প্রয়োজনের স্বর্গের দিকে, সে পাথেয় কে আমাকে আবার ফিরিয়ে দেবে? আমার এই যশমানের দুর্গ থেকে আমাকেই যুদ্ধ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, এর কঠিন প্রাচীর ভেদ করে এখনো পদ্মার আহ্বান আমার কানে এসে বাজে। সে আমাকে ডেকে বলে— কবি, তুমি কোথায়? তখন আমি মনে প্রাণে আমার মধ্যে কবির অন্বেষণ করি। তাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে। কারণ, প্রবল জনসমুদ্র তার উপরে সম্মান বর্ষণ করছে, এখন তার নীচে থেকে তাকে বের করে আনা কঠিন। এখানেই আমাকে থামতে হল দেখছি। কারণ জাহাজের এঞ্জিনের চলার যে ছন্দ, তা আমার কলমের গতির সঙ্গে মিলছে না।

এস. এস. মোরেআ। ৬ জুলাই ১৯২১

ইউরোপে যে আমি উচ্ছ্বসিত স্বাগত সম্বর্ধনা পেয়েছি, তার খবর আপনি পত্রিকায় পড়েছেন বোধ করি। তাদের আগ্রহ দেখে আমার মনে কৃতজ্ঞতা জেগেছিল ঠিকই, তবু অন্তরের গভীরে কেন জানি না একটা বিহ্বলতা এসেছিল, তাতে পীড়িতও বোধ করেছি।

এক বিপুল জনসংখ্যার ভাবের প্রকাশের মধ্যে অনেক পরিমাণেই থাকে যা অবাস্তব। কারণ জনতার আবেগপূর্ণ অনুভূতি অতিরঞ্জিত না হয়ে পারে না। বড়ো একখানা খালি ঘরে ছোটো শব্দই নানা দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে যেমন শোনায়, এও সেরকম। এই ভাবোচ্ছ্বাসের বেশি অংশই সংক্রামক, এ যুক্তিহীন। জনতা ইচ্ছামত কল্পনায় রঙ লাগায়। তারা আমাকে যা ভাবে,

বাস্তবে আমি তা নই। এই ভুল বোঝায় ওদের জন্যে আমার দুঃখ হয়, নিজের জন্যে তো বটেই। আমার আগের প্রচ্ছন্ন জীবনে আমি ফিরে যেতে চাই। অন্য লোকের তৈরি অলীক কল্পনার মায়াময় জগতে বাস করা অত্যন্ত লজ্জার। আমার পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ করে ভক্তিতে তা চুম্বন করবে বলে চারপাশে লোকের ভিড় দেখে আমি বিচলিত হই। কি করে বোঝাই যে আমি এঁদের চেয়ে বড়ো নই? বরং এঁদেরই মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা আমার কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

তবু জানি, এঁরা কেউই আমার মতো কবি নন। কিন্তু এই ধরনের ভক্তি-অর্ঘ্য— এ তো কবির জন্যে নয়। কবি জীবনের উৎসব-অনুষ্ঠানের পুরোহিত, সেই সমাদরে জগতের সকল আনন্দযজ্ঞে তার নিমন্ত্রণ। যজ্ঞভার পেয়ে সে যদি কান্নাহাসির অমৃত পরিবেশন করতে পারে— তবেই চিরকালের মানুষের হৃদয়ে সে স্থান পাবে; পথপ্রদর্শক নয়, পথের সাথী হিসাবে। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আজ যদি আমাকে বেদীতে বসানো হয়, তবে যে আসনে আমার আপন অধিকার, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হবে।

মিথ্যে মান, অকারণ পুরস্কার পাবার চেয়ে কবির পক্ষে এই জীবনে স্বীকৃতি না পাওয়াও ঢের ভালো। যে-লোক সর্বদা ভিড়ের প্রশংসা ও সম্মান কুড়োচ্ছে, সেই সম্মানের উপর ক্রমশ সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সচেতন কি অচেতন ভাবেই হোক, তা পাবার বাসনা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। তাতে বঞ্চিত হলেই সে ক্ষুব্ধ হয়।

আমার নিজের সম্বন্ধে এরকম সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার ভয় হয়। কারণ, এযে অতি নীচ মনোভাব। জনহিতকর কাজ যে করতে চায়, জনপ্রিয়তাই তার পক্ষে বিশেষ সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। দলে দলে লোকে যখন তাকে অনুসরণ করে, তখন তার আপনজনও সাদর সম্বর্ধনা জানায়। সেই ব্যক্তি তখন জনপ্রিয় হবার লোভ আর সংবরণ করতে পারে না। কিন্তু সদাচঞ্চল লোকমত যখন অন্যখাতে বইবে, তখন অনুসরণকারীদের অনেকেরই মনে হবে তাদের প্রবঞ্চনা করা হয়েছে।

এস.এস. মোরেআ। ৭ জুলাই ১৯২১

আধুনিক যুগের দর্শনে আপেক্ষিকবাদের বিচারে আমি আমার কবি-প্রতিভার একক অধিকার সমর্থন করি, বলতে পারি নে। আমার ভিতরকার কবিসত্তাটি যে হঠাৎ প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে বসে, এ তো সত্য কথা। নিজের মধ্যে আমি এমন একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছি, যাতে আবেগপ্রবণতারই প্রাধান্য। তারই দোলায় আমি যেমন গাইতেও পারি, তেমন বলতেও পারি। আমি যেন আকাশের মেঘেরই মতো, বৃষ্টিও ঝরাতে পারি, আবার ইচ্ছে হলে কেবলমাত্র রঙের সমারোহ নিয়ে দিগঙ্গনে উৎসবসভা সাজাতে পারি। তাই লোকে আমার কাছে দুটি বিপরীত কাজের প্রত্যাশা করে। আনন্দমেলার আয়োজনেও আমার ডাক পড়ে, আবার লোকহিতের দরবার নিয়েও আসে।

আনন্দসৃষ্টির কাজে চাই প্রাণঝরনার উচ্ছল উৎস। আর সেবাব্রতের জন্যে চাই প্রতিষ্ঠান। রঙে রসে নবীন প্রাণ ভরিয়ে দিতে নিজের উপর নির্ভর করা চলে, কিন্তু জনকল্যাণে যেসব উপায় এবং উপাদান প্রয়োজন, তার আমদানি করতে হয় বাইরে থেকে। এইখানটাতেই আমার বিপদ। কাব্যলক্ষ্মী কবিকে নির্জন কল্পলোকে নিয়ে যান। অন্যপক্ষে সৃষ্টিকর্মে যে নিরাসক্ত বিবাগী মনটির প্রয়োজন, গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে গেলে তার স্পর্শ সে হারায়। সেই ধরনের সংগঠনের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং কর্মশক্তি প্রয়োগ করা চাই। তাই সে কাজ হাতে নিলে নিজের জগতে ফিরে যাবার অবসর আর কবির হবে না।

একথা চিন্তা করে আমার প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তখন আমি ভাবি, মঙ্গলকর্মে প্রেরণা সর্বদা সকলের প্রকৃতির অনুকূল হবে— তা নয়। তবু সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে, আমি তার প্রবর্তনা থেকে বিরত হতে পারি নে। অথচ কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গেলে যে-জায়গায় আঘাত পাই, তা হল— এমন লোক নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়, প্রকরণের সমারোহে যাদের তপস্যায় আস্থা জাগে।

/ সিদ্ধি আমার কাম্য নয়, আমার ধ্যানের সত্যতা-সন্ধানই একমাত্র সাধনা। যাদের মনে জীবন-স্বপ্নের একটি যথাযথ রূপ নেই, এবং তার প্রতি যাদের প্রেম ঐকান্তিক নয়, লাভের অঙ্কে তারা সার্থকতা দেখতে চায়। তার জন্যে আদর্শ-খর্বেও তাদের আপত্তি নেই।

যে বিশেষ ভাবটি আমার মনে আছে, রূপে তার বিকাশ সাধনে জীবনের হীন সংকীর্ণ অনুভববৃত্তিগুলি সংযত করতে হবে। কিন্তু অনেকের ধারণা প্রবৃত্তির উত্তেজনাই আমাদের কর্মে গতিবেগ সঞ্চার করে। তারা পূর্ব-অভিজ্ঞতার নজির দেখিয়ে বলে— শুদ্ধ ভাব কখনো কোনো ফল ফলাতে পারে নি। কিন্তু আপনি যদি বলেন, সফলতার চেয়ে আদর্শ অনেক বড়ো— তবে আপনার কথা তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে।

গত চোদ্দমাস ধরে আন্তর্জাতিক বিদ্যাকেন্দ্র সৃষ্টির অভিযানে বারবার নিজেকে বলেছি, ব্যর্থতার সম্ভাবনায় তোমার অভিমান যেন আহত না হয়, কারণ ব্যর্থতা সত্যকে আঘাত করতে পারে না। সত্যে তোমার মনোযোগ বিধৃত কর। কিন্তু যেখানে আমার ভালোবাসা, সেখানে আমি বড়ো দুর্বল। যাদের আমি ভালোবাসি, তারা যখন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে —তখন তাদের জন্যে আমি এই খেলনাটি জোগাড় করার কাজে লেগে যাই।

এস. এস. মোরেআ। ৮ জুলাই ১৯২১

অতিশয়োক্তি করব না। আদর্শ-রূপায়ণের মধ্যে একটি বাইরের দিক আছে মানি। সেখানে আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজন আছে। তবে আবার উপকরণের প্রাচুর্য— তা মানুষই হোক কি বস্তুই হোক, সার্থকতার পথে অনেক সময়ই বাধা ঘটায়। তাই তাকে ভয়ের কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যা বলতে চাই তা হল, ব্যাকরণে পটুতা এবং সাহিত্যসৃষ্টি এক জিনিস নয়। ব্যাকরণে জোর দিতে গেলে প্রকাশের ক্ষমতা হয়তো বাধা পায়। সিদ্ধির উজ্জ্বল রূপের প্রলোভন বহুক্ষেত্রেই আদর্শভ্রষ্ট ক'রে পরিপূর্ণতার প্রতিবন্ধক হয়। গত মহাযুদ্ধেই দেখেছি, সফলতা-লাভের আশায় সত্যাদর্শকে বলি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, কিন্তু আদর্শে পৌছনো হয় নি।

আন্তর্জাতিক বিদ্যানিকেতনের পরিকল্পনা যখন সাধারণে প্রচারলাভ করল —তখন থেকেই আমার মনে আদর্শের স্বপ্ন ও সফলতার স্বপ্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে। পরিকল্পিত রূপটি বৃহৎ সন্দেহ নেই। যাদের ক্ষমতার অভিমান আছে আর তা প্রয়োগ করতেও চায়, তাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উচ্চাশাতেই যে আমরা অযথা প্রলুব্ধ হই, তা নয়— কখনো বা আমরা কার্যের

ফলাফলের উপর অতিমাত্র মূল্য আরোপ করি। অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছতে হলে ধারণ- ও মননশক্তির প্রয়োজন। অনেক সময় তা হাতের কাছে থেকেও ধরা পড়ে না। বাইরের সফল মূর্তি— সে তো সকলের কাছেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

আমার চিত্রাঙ্গদা নাটকে দেখেছেন, দেবতার বরে চিত্রাঙ্গদা যে দৈহিক সৌন্দর্য লাভ করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর চিত্তের অসহিষ্ণুতা। কারণ, সে সৌন্দর্যে সত্য কিছু ছিল না, সেখানে ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা। সত্য অবহেলা সইতে পারে, কিন্তু সার্থকতার লোভে অসত্যের সঙ্গে সন্ধি করতে চায় না।

দুর্ভাগ্যবশে এই পৃথিবী জুড়ে বিষয়ী ও চতুর লোকেরা তাদের ইষ্টদেবের কাছে পৌঁছবার জন্যে মেফিস্টোফিলিসের প্রলুব্ধ প্ররোচনার আশ্রয় নেয়। তারা জানে না, সে পথে অভীষ্টলাভ হয় না। কারণ বৈষয়িক কৃতকার্যতা এবং পরমার্থলাভ এক নয়। এসব কথা চিন্তা করলে রিক্তভূষণ দারিদ্র্যের প্রতি আমার মনে আকুলতা জাগে। ফলের কঠিন আবরণ ভিতরের শাঁসটুকুকে যেমন আশ্রয় দেয়, তেমনি দারিদ্র্যের অন্তরালেই আদর্শের সতেজ নিষ্ঠা বিরাজ করে। যাই হোক, শক্তি বা উৎসাহের অভাবে সার্থকতার পথ ত্যাগ করা চলবে না। তবে সত্যের অনুপ্রাণনাতেই যেন আমরা আত্মাহুতি দিই, সফলতা লাভের আশায় নয়।

এস. এস. মোরেআ। ৯ জুলাই ১৯২১

সত্য আদর্শ আমাদের দীপ্ত প্রাণের পূর্ণ সহযোগ দাবি করে। এ ক্ষেত্রে বলা চলে না— সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, অর্থাৎ সর্বনাশের সম্ভাবনায় অর্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। আদর্শ তো টাকাকড়ি নয়। তার একটি জাগ্রত সত্তা রয়েছে। অখণ্ড তার পূর্ণতা। পুরো এক টাকার বদলে আট আনা দিয়ে ভিখারিনীকে সন্তুষ্ট করা যায়। কিন্তু তার সন্তানের অর্ধাংশ গ্রহণ করতে সে কিছুতেই স্বীকৃত হবে না।

পূর্বপশ্চিমে প্রকৃত মিলন সাধনের কাজে আমার ডাক পড়েছে জানি। এই ব্রতগ্রহণে আমি প্রস্তুতও হয়েছি। আমি যখন আমার 'সাধনা' বক্তৃতামালা লিখেছি, তখনো জানি নে যে আমি কেবল আমার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত পথেই অগ্রসর হচ্ছি। ইউরোপ পরিভ্রমণকালে প্রায়ই শুনতে পেতুম, সেগুলি পশ্চিমের

পাঠকের বিশেষ উপকারে এসেছে। ঘটনাচক্রে একদিন গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলুম। পঞ্চাশ বছর বয়সে অকস্মাৎ ইউরোপে যাবার জন্যে আমার মনে অকারণ বাসনা জাগল। তখনো বুঝি নি, নিয়তি অলক্ষ্যে আমাকে কোন্ পথে ঠেলছে। এইবার ইউরোপ ভ্রমণকালে আমি তার নিহিত ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করেছি।

আগেও বলেছি, মহৎ উপলব্ধি মাত্রই পূর্ণপ্রাণে স্বীকার না করে উপায় নেই। অহিংসার যে নঙর্থক নীতি, তার শাসন সব ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মানবসমাজে অন্তরের সত্য মিলন ঘটাবার শক্তি কেবল প্রেমেরই আছে। গানের সঙ্গে মাদলের যে যোগ, প্রেমের সঙ্গে ন্যায়বিচারেরও সেই যোগ। পশ্চিমের হাতে বহুকাল আমরা অবমানিত হয়ে এসেছি। তাই পাশ্চাত্য জাতির প্রতি প্রেমের অনুশীলন বা প্রকাশ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এই বন্ধুত্বের ভাবে স্বার্থের অভিসন্ধি বা মহানুভবতার স্পর্ধা রয়েছে, মনে হতে পারে। ভারতবর্ষে মধ্যপন্থীদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ আমাদের মনে দাগ ফেলতে পারে না। কারণ তাদের কাজের পিছনে রয়েছে স্বার্থসিদ্ধির কৌশল। প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে এই যে স্বার্থের মিতালি, তা গ্লানিকর। আবেদন নিবেদনের থালা বহন ক'রে আমাদের ভাগ্যে যে উপহার আসে, তাতে গর্ব করার কিছুই নেই।

দানের মাহাত্ম্য তখনই স্বীকৃত হয় যখন প্রার্থীর ত্যাগের বীর্যে তা মূল্য পায়। আমাদের দাবি যখন হয় ক্ষীণ এবং গ্রহণের মধ্যেও যখন পৌরুষ থাকে না— সে অবস্থায় যে বর আমরা পাই, তা কেবল আমাদের দৈন্যকেই বাড়িয়ে তোলে। সেই কারণেই ভারতবর্ষে উগ্রপন্থীদের তুলনায় মধ্যপন্থীরা এতই নিষ্প্রভ।

যাই হোক, আদর্শবাদী হিসেবে আমি বলতে চাই— যারা আমাদের বন্ধুপ্রীতি দাবিও করে না, যারা তা দিতেও চায় না— তাদের প্রতি প্রেমের সাধনা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। তবু সেই অবস্থাটিকেই ধ্রুব সত্য বলে যেন আমরা মেনে না নিই। আমাদের পরস্পরের মধ্যেকার অন্তরাল অপসারণ করতে হবে। দুই মহাদেশের অবস্থার তারতম্য ও সুযোগের বৈষম্যই হয়তো এই বিভেদের কারণ। এই যে বিদ্বেষভাব আমরা মনে পুষে রেখেছি, তার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লড়তে হবে। উভয় পক্ষের মিলনোৎসুক নরনারী যেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলতে পারে, তার জন্যে প্রশস্ত পথ রাখতে হবে। আপনার দেশবাসীকে

ভালোবাসা আমার পক্ষে সহজ করেছেন বলে আপনার কাছে আমি কত যে কৃতজ্ঞ। কারণ ভারতবর্ষকে যে আপনি ভালোবাসেন সে তো কর্তব্যবোধে নয়, সে আপনার অকৃত্রিম প্রেমের দান। আপনার কাছ থেকে এই যে প্রেমের শিক্ষা— তা যখন ব্যর্থ হয়, দেশাত্মবোধের চেয়ে যে আপনার বিশ্বপ্রেম বড়ো— সে সত্য যখন আমার দেশের লোকের সগৌরব অভিনন্দন না পায়— আমি বিষণ্ণ বোধ করি।

এবার ইউরোপযাত্রায় আপনাকে সঙ্গী না পেয়ে ভারি নিরাশ হয়েছি। আপনার আসতে না পারার কারণ অবশ্য মানি। আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তার মহৎ মর্যাদা আপনি যথার্থ অনুমান করতে পারতেন। আমার নিজের দেশের বেশির ভাগ লোকের কাছে আমার জীবনের এবারকার এই অভিজ্ঞতা চিরকালই অস্পষ্ট থাকবে। তাই সমগ্র মানবজাতির পটভূমিতে ইতিহাসকে দেখার আমার যে আবেদন— তাদের কাছে তা কোনো মূল্যই পাবে না। একমাত্র আপনারই সহমর্মিতার উপর আমাকে নির্ভর করতে হবে। সেজন্য যে ভাবধারা বর্তমানে আমার চিত্তকে একান্তভাবে অধিকার করেছে— তার প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার সুযোগ আপনার হল না বলে আমার দুঃখ হয়। আপনার জীবনের গতিপথ এখন যেদিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন— তা আমার পথ থেকে অনেক দূরে বেঁকে যাবে। যে কাজের দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন— সেও আমার নিজের কাজের থেকে স্বতন্ত্র। তাই অতীতে আমার কর্মক্ষেত্রে যে একাকিত্বের মধ্যে সাধনকৃচ্ছ্রতায় কাটিয়েছি, সেইভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে একলাই চলতে হবে দেখছি। কোনো অভিযোগ করব না। আমার জীবনদেবতার আহ্বান শুনে এগিয়ে যাব— তার ফল যাই হোক, নিজের মতো করে সে ডাকে সাড়া দেওয়াতেই আমার জীবনের সার্থকতা।

এস এস.মোরেআ ১২ জুলাই ১৯২১

গত চোদ্দমাস ধরে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, ভারতবর্ষকে বৃহৎ মানব-সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে যেতে হবে। এই যোগাযোগে ভারতবর্ষই কেবলমাত্র লাভবান হবে, এমন নয়। মনে কোনো সংশয় ছিল না যে, তার সুপ্তচিত্ত যখন জড়তার মোহ থেকে জাগ্রত হয়ে উঠবে, তখন সে সমস্ত বিশ্বের তপস্যার অগ্নিতে এমন কিছু ইন্ধন দিতে পারবে, যার মূল্য কম নয়।

রাজনৈতিক সহযোগ এবং অসহযোগের বিবিধ পন্থা অনুসরণ করে ভারতবর্ষ এখন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা পরনির্ভর ভিক্ষুকের। আমি যে সহযোগিতার স্বপ্ন দেখছি, বাস্তবে তাতেই বিশ্বসত্তাকে উপহার দেবার মহার্ঘ সম্পদে তার অঞ্জলি ভরে উঠবে। পশ্চিম মহাদেশে মানবচিত্ত অত্যন্ত সক্রিয়। জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপায় চিন্তা ক'রে কাজেও তা প্রয়োগ করে। ধীশক্তি যেখানে এতখানি প্রাণবন্ত, সেখানে চিৎশক্তিও উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তির পরিণত ফলটিই শুধু আমাদের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাই, এর প্রাণরস আমাদের সজীব করে না। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় আমাদের মন ভারগ্রস্ত হয়, সতেজ হয় না। আমি নিঃসন্দেহে বুঝেছি, পশ্চিমের ইস্‌কুলমাস্টারে আমাদের প্রয়োজন নেই, সত্যের পথ অনুসরণে আমরা সহকর্মী চাই।

আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভারতীয় চিত্ত বর্তমান বিশ্ব-উদ্‌বোধনের বিরাট আন্দোলনে যোগ দেয়। এই প্রয়াসে আমরা যতখানি কৃতকার্য হব ততই মানুষ যে মূলতঃ এক— তা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেই ঐক্যে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। চিত্তের সক্রিয়তাতেই আমরা তার প্রমাণ পাব। যে-মুহূর্তে আমরা মানবসভ্যতার ভিত্তিনির্মাণে যোগ দিই, তখনই আমাদের অবরুদ্ধ আত্মা নির্বাসন হতে মুক্তি পায়। পৃথিবীতে নূতন যুগসৃষ্টিতে যে-শক্তি কাজ করছে তার সঙ্গে সমান তালে কাজ করার ক্ষমতা যে আমাদেরও আছে— সে আত্মপ্রত্যয় এখনো জাগে নি। হয় অহংকারের বশে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে আমরা আত্মঘোষণা করি, নয় অতিমাত্রায় নত হয়ে আত্মলাঘবে রত হই।

কিন্তু এই সাধ্য যে সত্যই আছে, আমার তাতে সন্দেহ নেই। আত্মশক্তিতে আস্থার এবার উদ্‌বোধন হোক। মিথ্যা দম্ভ নয়, সর্বকালের সর্বমানবের শুভ-সাধনায় আমাদেরও কিছু করার আছে এ সম্মানবোধ যেন বাহিরে আপনাকে প্রকাশের অধিকার দেয়। সেই আশ্বাসে দেশে দেশে আমি জ্ঞানান্বেষী ছাত্র ও বিশেষজ্ঞদের এই প্রাচ্যবিদ্যাঙ্গনে বিশ্বভারতীর নীড়ে সমবেত হয়ে এদেশের বিদ্যার্থীমণ্ডলীর সঙ্গে একযোগে বিশ্ববিদ্যাচর্চার আহ্বান জানাতে সাহস করেছি। এ দিনে আমাদের দেশের জনচিত্তে এই ভাবটি অনুকূল আগ্রহ জাগাবে কিনা কি জানি।

এস. এস মোরেআ। ১৩ জুলাই ১৯২১

—আমাদের সংগীতে প্রত্যেক রাগিণীর স্বরগ্রামের পর্দায় সুরভেদ আছে। কোথাও কয়েকটি স্বর বাদ পড়ে, কয়েকটি স্বর আবার যোগ করতে হয়। তাদের পর্যায় এবং ক্রমও ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তার বিভিন্ন রাগিণীতে বিভিন্ন সুরবিস্তারের কল্পনাই আমার মনে আসে। পশ্চিমে থাকতে এর একটি বিশেষ স্বরবিন্যাস আমার মনের বীণায় বাজত। তার ফলে, আমার জীবনে সেই অনুভূতিটিরও তখন একটি বিশিষ্ট মূল্য ছিল।

আপনার সঙ্গে যখন চিঠিপত্র লেখালেখি করেছি, তখনো কল্পনা করতে পারি নি যে, সেই মুহূর্তে আপনাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার ভারতবর্ষের কোনো যোগই নেই। এডেনে এসে কয়েকখানি ভারতীয় সংবাদপত্র পড়ে অবস্থাটি আমি অনুধাবন করলুম। চোদ্দমাসের মধ্যে এই প্রথম স্পষ্ট বুঝেছি যে, আমার জন্মভূমিও আমার অভীপ্সিত আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছু মীমাংসা সত্যিই সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অপরপক্ষের সঙ্গে নিত্যসংঘর্ষ বা বাক্‌বিতণ্ডার সম্ভাবনায় আমার ধিক্কার জাগে।

আমি যে-ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি, তার স্থান বিশ্বভূমিকায় পরিব্যাপ্ত— আর যে-ভারতে আমি পৌছব, সে তার নিজের মধ্যেই নিজে স্বতন্ত্র। এর মধ্যে কোন্‌টির আমি সেবা করব ?

কয়েক মাস আগে নিউইয়র্কের একটি হোটেলের জানালায় বসে দিনের পর দিন গুনেছি, কবে দেশে ফিরে আমার মাতৃভূমির কোলে গিয়ে পৌছব! কিন্তু আজ মেঘে-ঢাকা আকাশের ছায়ায় ঘনান্ধকার উদ্‌বেল সমুদ্রের মতো আমারও মন বিষাদম্লান। গত কয়েকদিন ধরে কেবলই ভাবছি, ইউরোপের সাগ্রহ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে আরো অন্ততঃ একবছর সেখানে থেকে আসাই বোধ হয় সংগত ছিল। কিন্তু আর তার সময় নেই। এখন থেকে আমার অপ্রস্তুত মনকে প্রতিকূল অবস্থায় চলার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে।

এস. এস. মোরেআ। ১৪ জুলাই ১৯২১

এক ধরনের উগ্র আদর্শবাদ আছে যা অসহ্য আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। নিজ আদর্শের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের মূলে সর্বদা অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠা নাও থাকতে পারে।

একে একপ্রকারের আত্মকেন্দ্রিক গোঁড়ামিও বলা যায়। এরূপ আদর্শবাদ সিদ্ধির প্রয়োজনে অপরের স্বাধীনতা হরণ করতেও দ্বিধা করে না।

আমার আদর্শের মধ্যেও পাছে সেই পীড়নের ভাব আসে, আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। তার অর্থ হবে—আমার মনে আত্মশ্রদ্ধার চেয়ে সত্যে শ্রদ্ধা দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। জনসেবাব্রতের পরিকল্পনার মধ্যেও আমাদের আত্মাভিমান ঢুকে যায়। তখন অকৃতকার্যতায় আহত হই, কারণ পরিকল্পনাটি যে আমাদের।

এ-ধরনের আত্মপ্রাধান্য অপর লোকের জীবনের আদর্শের প্রতি একেবারে অন্ধ হয়ে থাকে। যেসব লোক রুচি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের উপযুক্ত, তাদেরও একই কাজের চাকায় ঘোরায়। এ যেন যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়ে শিক্ষককে খুঁড়তে হয় পরিখা, কবিকে ধরতে হয় অস্ত্র। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যের বিরোধী বলে এ যে সমূহ ক্ষতি। আদর্শবাদের দৌরাত্ম্য বিধির অধিকারেও হাত বাড়াতে চায়।

গত কয়েকদিন যে-বিষণ্ণতায় আমার মন ছেয়ে আছে তা হয়তো আমারই অহংকারের ছায়া। ভয়ে তার আশার রশ্মিটি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কয়েকমাস ধরে ভেবে এসেছি, আমার এই ভাবপরিকল্পনাটি এবং সেই কাজের ভার দেশের লোক গ্রহণ করবে। আমার সেই আত্মসত্য-অভিমান হঠাৎ বাধা পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

না, না—এ আমার ভারি অন্যায়। একটি মহৎ ভাব সত্যে ও সৌন্দর্যে যুক্ত হয়ে আমার চিত্তে এসে আসন পেতেছে—এতেই যেন আমি আনন্দ পাই। তাকে মেনে চলার দায়িত্ব আমার একার। সে তার মুক্ত পাখায় ভর দিয়ে নিজের লক্ষ্যে ঠিকই পৌছবে। সংগীতেই তার আহ্বান, শাসনে বা নির্দেশে নয়। সত্য তো কখনো ব্যর্থ হয় না। অকৃতার্থ আমিই হতে পারি কিন্তু তাতে কী বা আসে যায়।

এখন থেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে কথাবার্তা চলবে। কিন্তু দূরত্বের একটি নিজস্ব সার্থকতা আছে। চিঠিতে যে-কথা বলি, মুখে তা বলতে পারি নে। তাই যখন আমাদের দেখা হবে, তখন ব্যবধান ও মৌন নীরবতার অভাবে অনেক কথাই না-বলা থেকে যাবে।

এস. এস. মোরেআ। ১৫ জুলাই ১৯২১

এই আমার শেষ চিঠি। বন্ধুবর, এখানি শেষ করার আগে আপনার চিঠি-বর্ষণের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে আমার প্রবাসের দিনগুলি পূর্ণ করেছেন বলে আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। মরুযাত্রীর কাছে খাদ্য ও পানীয়ের মতো ক'রে তাদের আমি পেয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রে যে কয়মাস কাটিয়েছি, সে সময় আমার এ চিঠিগুলির বড়ো প্রয়োজন ছিল। মনে সংকল্প ছিল, আমিও সেভাবে আপনার ঋণশোধ করে যাব। সে প্রতিজ্ঞা বোধ হয় রাখতে পেরেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা সন্দিগ্ধ গুপ্তচরেরা যদি মধ্যপথে তাদের আত্মসাৎ না করে থাকে, তবে অবশ্যই আপনি আমার চিঠি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পেয়েছেন।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ হয়তো কুঁড়েমি করে আমার সব খবর আপনাকে জানাবার ভার পিয়রসনের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। তাই এখন সেই ঘাটতি শোধ করে দিচ্ছি। তবে এই একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না। কারণ পত্রলেখক হিসেবে আপনার তুলনা হয় না। আমার চিঠিকে যদি চিঠি বলতে হয়, তবে চিংড়ি মাছকেও মাছ বলা যায়। এরা যেন কোনো বইয়ের অংশ, উল্কাপিণ্ডের মতো কোনো এক গ্রহ থেকে ছিটকে এসে পড়েছে। আপনার দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু বেশির ভাগই হঠাৎ আলোর চমক লাগিয়ে আবার ছাই হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো। ওদিকে আপনার চিঠিগুলি যেন তৃষিত ধরণীকে বৃষ্টিধারায় সিঞ্চিত করে দিয়ে গেছে। আমার পক্ষ হতে একটি কথা ভেবে দেখবেন— আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমার প্রধান বাধা ছিল ভাষার। তাছাড়া যে-কোনো ভাষাতেই চিঠি লেখায় আমার একটি নিজস্ব জড়তাও আছে। অন্যদিকে— বসন্তের সাড়া পেয়ে শালগাছ যেমন অনায়াসে পাতা গজায়, আপনার পক্ষে চিঠি লিখে যাওয়াও তেমনি। যাই হোক, ফিরে গেলে আমার এই চিঠির গোছার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এযে দেখছি অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল। এবার তবে বিদায়।

উইলিয়ম পিয়রসনকে লিখিত

কলিকাতা। ৬ মার্চ ১৯১৮

আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের সব লোককেই অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আমাদের ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ নিজেরা যে ধুলো ওড়ান, তার আড়ালে আমাদের স্পষ্ট দেখতে পান না। প্রতিটি সৎকর্মের প্রযত্নে, প্রতি পদে পদে আমাদের হীনতার অপমান সইতে হয়।

গতানুগতিক নীতির অন্ধ অনুসরণই শুরুতে সহজ মনে হয়। কিন্তু এই অবজ্ঞাত প্রণালী শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না। সত্যি বলতে জবরদস্তি মূর্খতা মাত্র। কারণ কড়াকড়ি নীতি প্রয়োগের পথ না পেয়ে জেদ শেষে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ঠিক এই ভুলই আমাদের শাসকরাও করেন। তাঁরা যে আমাদের জানেন না, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সজাগ, তবুও তাঁরা আমাদের জানতেই চান না। আর তার ফলে শাসক আর শাসিতের মধ্যে যে দুর্নীতিপরায়ণ মধ্যস্থ ব্যক্তিরা কাঁটাঝোপের মতো গজিয়ে ওঠেন, তাঁরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন, যা শুধু শোচনীয় কেন, কম ইতরও নয়।

এইমাত্র থাডানির[১] চিঠি পেলুম। ব্রিটিশ বন্দরগুলিতে কেবলমাত্র ভারতীয় প্রজাদের যে অপমান আর হয়রানি সহ্য করতে হয়, তার বিরুদ্ধে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই অপমানের ফলে সেই-সব প্রজারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকতে লজ্জা বোধ করে। এরকম ঘৃণ্য আচরণ আমাদের দেশের লোকদের স্মৃতির মর্মে দাগ ফেলে যায়। মানব-সমাজের উপর এই যে অযথা অবজ্ঞার ভার চাপানো হচ্ছে, স্বয়ং ইতিহাসবিধাতাও একে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

১. নানিকরাম ভাসানমল থাডানি দিল্লীর হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর প্রবল আকর্ষণ থাকায় সমকালীন সমাজ-সেবক ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

শান্তিনিকেতন। ১১ মার্চ ১৯১৮

আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন যে আপনার মনে জেগেছে তা আপনার চিঠি পড়েই আমি অনুমান করেছি। সব মানুষের পথ এক নয়। কেননা আমাদের সকলেরই প্রকৃতি এবং অভ্যাস বিভিন্ন। তবে আমরা শুধু তাকেই ভালোবাসতে পারি, যা আমাদের কাছে গভীরভাবে বাস্তব। বেশির ভাগ লোকেরই অনুভূতি নিজের সম্বন্ধে যতটা তীব্র, অন্যের সম্পর্কে ততটা নয়। আত্মপ্রীতির গণ্ডির বাইরে তাঁরা যেতে পারেন না। এ ছাড়া অন্যদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়— তাঁদের মধ্যে কেউ ভালোবাসেন কোনো বিশেষ লোককে, কেউ-বা ভালোবাসেন কোনো বিশেষ ভাবধারাকে।

সাধারণত মেয়েদের এর প্রথম পর্যায়ে ফেলা হয়, আর পুরুষদের স্থান হল দ্বিতীয় পর্যায়ে। ভারতবর্ষে আমরা স্বীকার করি যে, এই ভাগটি যথাযথ। তাই এদেশের শিক্ষাগুরুরা পুরুষ ও নারীর জন্য দুই ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় যে, তারা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উর্ধ্বায়িত করে আদর্শের জগতেই মুক্তিলাভ করে। একটি নারী তার স্বামীর সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন কিছু পায়, যা সব অক্ষমতার উর্ধ্বে। স্বামী-ভক্তির মধ্য দিয়েই সে অসীমের স্পর্শ পায়, তাতেই স্বার্থঘন দীনতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। প্রেমের দিব্য দীপ্তিতে পতিপুত্রের মধ্যেই সে পরম সত্যের সন্ধান পায়। জীবসৃষ্টিপ্রভেদে পুরুষের স্বভাব মেয়েদের তুলনায় কিছু নির্লিপ্ত নিরাসক্ত। তাই সে শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা ও সৃজনতত্ত্বলোকে সহজে প্রবেশ করতে পারে। সত্যের অন্তরতত্ত্ব অবারিত হলে অমেয় আনন্দের স্পর্শে তার সব কামনা সব স্বার্থচেতনার অস্ত হয়, তখন আর আপনাকে উৎসর্গিত করায় বাধা থাকে না।

তবে মনে রাখা চাই, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরক্তি এবং ভাবধারার প্রতি অনুরক্তি— দুইই প্রচণ্ড 'অহং' বুদ্ধি প্রণোদিত হতে পারে। তার ফলে মুক্তির চেয়ে বন্ধনে জড়াবার সম্ভাবনাই অধিক।

সেবাপরায়ণতার আত্মত্যাগেই কামনার বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক কি ভাবকেন্দ্রিকই হোক, আমাদের কোনো অনুরাগ যেন শুধুমাত্র তার সৌন্দর্যের এবং তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট না হয়, বরং জীবনশিল্পে রূপ

দিয়ে যেন তাকে সার্থক করে। সত্যের যে আদর্শ কল্পনায় আছে, তার মূর্তিপ্রতিমা গড়তে পারি কেবল আত্মদানের স্ফূর্তিতে। তবে অস্তিত্বের কোনো প্রচ্ছন্ন রহস্য উন্মোচনের প্রতি এক অনমনীয় বিরোধের ভাব প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মতো জীবনীশক্তির ক্ষেত্রেও থাকে। সৃজনকার্যে রত হলে প্রতিপদে যেই বিরোধের ভাবটি ধরা পড়ে, তখনই আঘাতে আঘাতে শিল্পী তাকে মনোমত গড়েপিটে নিতে পারে।

আশ্রমের চারপাশে যে সাঁওতাল মেয়েরা আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দৈহিক স্বাস্থ্য তাদের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। তার কারণ, তারা কাজের মধ্যেই সক্রিয়ভাবে তাকে গড়ে তুলেছে। জীবনের কর্মতানে বাঁধা হয়ে তাদের শরীরের গঠন ও গতিবিধি সুসমঞ্জস হয়েছে। আমাকে যা মুগ্ধ করে তা হল ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা। সর্বক্ষণ ধুলোর মধ্যে থেকেও তা ক্লিন্ন হয় না। আমাদের মেয়েরা নানারকম দামি প্রসাধনের প্রলেপে সাজিয়ে তাদের স্বাস্থ্যহীন দেহকে কৃত্রিম চাকচিক্য দেয়। কিন্তু স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহের সাবলীল গতির মধ্যেই যে স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে—তা তারা পাবে কোথায় ?

আমাদের আধ্যাত্মিক দেহ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অতি সাবধানে সবরকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আত্মার শুচিতাও রক্ষা করতে পারি নে, তাকে সৌন্দর্যও দিতে পারি নে। অথচ সংসারের ধুলোবালি উত্তাপের মধ্যে থেকেই অন্তরতম সত্যকে সদীপ্ত করতে পারি।

এবার একটু থেমে গিয়ে ভেবে দেখি আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দেওয়া হল কি ? প্রত্যাশিত সমাধান হয়তো দিতে পারি নি, কেন না আপনি আমার কাছে কি জানতে চান তা স্পষ্ট করে বোঝা মুশকিল। আপনি নৈর্ব্যক্তিক কর্ম ও নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের কথা তুলেছেন। তার পরে জানতে চেয়েছেন, আমার মতে এর কোনটি শ্রেয়তর। সূর্য আর তার আলো যেমন—তেমনি এ দুটিও আমার চোখে অভিন্ন। কারণ প্রেমের বিকাশ সেবায়। ভালোবাসা যেখানে নিষ্ক্রিয়, তার জগৎ সেখানে মৃত

শান্তিনিকেতন। ৬ অক্টোবর ১৯১৮

আশ্রমে এ বছরকার এই শেষ পর্যায়ে আমি সারা সকাল স্কুলের ক্লাস নিচ্ছি আর বাকি দিনটা স্কুলপাঠ্য বই লিখে কাটাচ্ছি। আমার যে প্রকৃতি তাতে এ ধরণের কাজ আমার উপযোগী নয় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। তবু আমি কিন্তু এ কাজের মধ্যে উৎসাহ ও বিরাম দুইই পাই। মনের নিজস্ব একটা ভার রয়েছে— কাজের প্রবাহে তাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে তবে সেটা হাল্‌কা হয়। সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পারি এমন কোনো চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে পারলেও তা হয়। অথচ চিন্তাধারা নির্ভরযোগ্য নয়, তারা তো সময়ের তালিকা ধরে চলবে না— তাদের অপেক্ষায় থেকে কেবল দিনগুলি ভারাক্রান্ত হবে।

আজকাল আমার মনের এমন অবস্থা, ভাবের প্রেরণা আসার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারি নে। তাই এমন কাজের মধ্যে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি যা খামখেয়ালী নয়, যার প্রতিদিনের নিয়মিত সরবরাহ ব্যাহত হয় না! সে যাই হোক, পড়ানোটা একঘেয়ে বা বিরক্তিকর বলে আমার মনে হয় না। কেননা জীবনে জীবন যোগ করার কাজ কখনো নিষ্প্রাণ হতে পারে না। আর আমি তো ছাত্রদের সজীব প্রাণী হিসেবেই দেখি।

দুঃখের বিষয়ে কবিরা পাগলামি থেকে বেশিদিনের বিরতি পায় না। নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকলেই তারা একেবারে আর সবরকম কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আছে ঘূর্ণির বেগ, ভবঘুরে ভাব তাদের রক্তে। এখনই সেই পলাতক জীবনের ডাক আমি পেয়ে গেছি— সে এক ধরণের কুঁড়েমির নেশা। একটি দুরন্ত স্কুল-পালানো মনোভাব আমার ভিতরকার স্কুলমাস্টারটিকে প্রায় প্রলুব্ধ করে এনেছে।

দু-একদিনের মধ্যেই এই জায়গা ছেড়ে যাব। বাইরে থেকে দেখতে গেলে তার কারণ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসছে কিছুদিন ধরে। আপনাকে কিন্তু গোপনে বলছি, আসল কারণটি হল অকারণ। সেই আমার চির-অতিথি, কাজ-পালানো বৃত্তি, সেই আমাকে ডাক দিয়েছে। বিধিবদ্ধ সব কাজের গণ্ডি ভেঙে সে আমাকে কেবলই টেনে নিয়ে যায়। ইচ্ছা হয়, এমন একটা কল্পলোক যদি খুঁজে পাই, যেটা কেবল ছুটি দিয়ে ভরা। সেটা কল্পনাপ্রবণ লোকদের 'পদ্মসেবীর রাজ্য' নয়··· যেখানে সপ্তাহের সব দিনগুলিই রবিবার। সে এমন জায়গা যেখানে রবিবারের দরকারই হয় না। সেখানে বিরাম কাজেরই

অঙ্গ, কর্তব্য খেলার ছল— যেন বৃষ্টি-ভরা মেঘ, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না যে তার কোনো উদ্দেশ্য আছে।

শান্তিনিকেতন। ১১ ডিসেম্বর ১৯১৮

কাল সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একখানি পত্র পেলুম। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে আহ্বান এলেও আমি সেখানে যাব না, এ কথা কি সত্যি? আমি লিখেছি, কোনো নিমন্ত্রণে যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে তা গ্রহণ করাই উচিত। দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্যে নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি ঘর খুঁজে পাব, এই একান্ত আশা আমার মনে আছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই হবে। ন্যায়ের জন্যে দুঃখভোগ— তাও আমাদের বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু নামের ভেদে প্রতিবেশীর সঙ্গে ক্ষুদ্র কলহবিদ্বেষ রাখা উচিত নয়।

আত্মপর ভেদ হল মায়া। সেই মোহ কেটে গেল সৃষ্টির বক্ষ থেকে যে দুঃখের হলাহল নিয়ত ফেনিয়ে উঠে অপার আনন্দ সমুদ্রে মিশে যায়— সেই আনন্দ বেদনার স্বাদ পাই আমরা নিজ নিজ জীবনের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে।

যদি অনন্তের ব্যাপ্তিতে না দেখতে পাই নিজেদের মুক্ত স্বচ্ছ প্রকাশ, যদি দুঃখকেই করি একান্ত, তবে জীবন হয় অনৃত, অসমাপ্ত ও দুর্বহ। বুদ্ধদেবের উপদেশটির সত্যতা ক্রমেই স্পষ্ট ধরতে পারি যে, সমস্ত দুঃখের মূলে আছে অহং চেতনা। দুঃখের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে নিরহংকার মুক্তি যদি পেতে চাই, তবে সর্বানুভূতির অনুশীলনই তার পন্থা।

দুঃখের পথেই আসবে মুক্তি। বেদনার চাবি দিয়ে আনন্দের সিংহদ্বার উন্মোচন করব। আমাদের হৃদয় একেকটি উৎসের মতো— একক জীবনের সংকীর্ণ পথে যখন চলে তখন সন্দেহে ভয়ে বেদনায় পরিপূর্ণ থাকে। তখন তার পথ অন্ধকার, পথের শেষ জানা নেই। কিন্তু যখন খোলা জায়গায় সমস্তর বুকের মধ্যে এসে পড়ে তখন তার পথ হয় আলোয় ঝলমলে, আর সে মুক্তির আনন্দে গান গেয়ে ওঠে।

পরিশিষ্ট

১. তথ্যপঞ্জী

১৯১২ সালের ২৪ মে কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন। 'যাত্রার পূর্বপত্রে' (আষাঢ় ১৩১৯ তত্ত্ববোধিনী) লিখছেন, 'মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি, আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি।' লণ্ডনে গিয়ে সুবিখ্যাত চিত্রকর কলাবিশারদ রোটেনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে রোটেনস্টাইন যখন ভারত-ভ্রমণে আসেন তখনই কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এবার হ্যাম্পস্টেডে তাঁর গৃহে ইংলণ্ডের ভাবুক-সমাজের অনেকের সঙ্গে কবির সাক্ষাতের সুযোগ হল।

রোটেনস্টাইন ইংরেজি গীতাঞ্জলির টাইপ-করা কপি কবি ইয়েট্‌স্‌, ব্র্যাডলি ও স্টপফোর্ড ব্রুককে পাঠিয়েছিলেন। ৩০ জুন রোটেনস্টাইনের গৃহে সাহিত্যিক আসরে কবি ইয়েট্‌স্‌ ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের শোনালেন। সে সান্ধ্য-আসরে উপস্থিত ছিলেন মে সিনক্লেয়ার, ইভ্‌লিন আণ্ডারহিল, আর্নেস্ট রীস, হেনরি নেভিনসন, এজরা পাউণ্ড ও আরো অনেকে। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক চার্লস ফ্রিয়র এণ্ডরুজের সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ সেখানেই।[১]

১৯০৪ সালে কেম্ব্রিজ ব্রাদারহুডের ধর্মযাজকরূপে এণ্ডরুজ এ দেশে আসেন। অথচ দীর্ঘ আট বৎসর পরে বিলাতেই রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজের প্রথম পরিচয়।

সে রাত্রির কথা স্মরণ করে এণ্ডরুজ লিখেছেন—

That night, the supreme delicacy and beauty of India's great world culture was brought home to me with overwhelming power as I listened to the poet's songs and met the poet himself. It was a night of inner illumination and clear vision.[২]

---

১ *Rabindranath Tagore Centenery Volume*: *A Chronicle of Eighty Years.* Sahitya Akademi, p. 468

২ *What I Owe to Christ,* p. 265-66

সেই প্রথমপরিচয়ের ক্ষণটিকে মনে করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০এর ৫ এপ্রিল এণ্ডরুজের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনায় বলেন—

"হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ডরুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরপ্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।"

সেদিন তিনি আরও বলেন, "এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি।"[১]

সি. এফ. এণ্ডরুজের ছোটো ছোটো দুটি ডায়ারি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রয়েছে। তাতে তিনি ১৯১৩, ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি নকল করে রেখেছেন। মনে হয় সে ডায়ারি-দুটি তিনি আবার পত্রলেখককেই উপহার দিয়েছিলেন। কেননা, প্রথম ডায়ারিটিতে লেখা—From Charlie to the Author। দ্বিতীয় ডায়ারির চিঠিগুলোতে আলাদা করে তারিখ দেওয়া নেই, উপরের পাতায় লেখা আছে— Gurudev's letters written during May, June, July, August, 1915.

আর এই কবিতাটি রয়েছে—

What can I give you, my Friend?
My heart is already your own
I have given it long ago.
But here in this slender book
Is a gift that is mine indeed,
For it comes from your own dear hand.
So I take it with all its wealth
Of wisdom and sheer delight,
To return you the joy that it gave
When you sent it to me, my Friend.

---

১ প্রবাসী, ১৩৪৭ বৈশাখ, পৃ. ১২৮-১৩০

এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রথম আসেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সালে।[১] তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে। ৮ মার্চ দিল্লী থেকে এণ্ডরুজ তাঁকে যে চিঠি লেখেন তাতে দেখি জুলাই মাসে সেখানকার কাজের অবকাশে তিনি আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদের সঙ্গে বাস করতে চান। কবির মত নিয়ে সেবার এসে তিনি আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কর্মে প্রেরণা দিয়েছিলেন।

এই আশ্রমবাসকালে তিনি তাঁর জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের স্থচনা অনুভব করেন। তিনি ছিলেন খ্রীস্টান মিশনারি। তাঁর প্রভু এবার তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের জন্য আহ্বান করছেন— এ ভাব তাঁর মনে এল। সেইজন্য তিনি তাঁর প্রথাগত ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে নতুনভাবে স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবনে প্রবেশ করতে চাইলেন। শান্তিনিকেতনে থেকে ভারতীয় চিন্তাধারা অনুধাবন ও ভগবান যীশুর বাণী যেভাবে তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন— প্রাচ্যদেশে তা প্রকাশ করাই তাঁর কর্তব্য মনে করেন। ভারতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাঁরা ছিলেন— দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, লালা মুন্‌শিরাম [স্বামী শ্রদ্ধানন্দ]— তাঁদের পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলেন। সকলেই তাঁকে ধৈর্যভরে কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে বললেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ তখনই তাঁকে পুরানো সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করতে না দিয়ে বিবেচনার কাজ করেছিলেন। ১৯১৩ সালের ১৯ অগস্ট এ বিষয়ে তিনি বিলাত থেকে লিখছেন—

My advice to you about the course you should take in your own life, is not to do anything rash, but to wait with a prayerful heart—till the call comes to you with an urgent force. Love is free even when the circumstances are narrow and nothing will hamper you when your heart is full.[৩]

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা এণ্ডরুজের কয়েকখানি চিঠিতেও এই দেব-ইঙ্গিত [God-Calling] এর উল্লেখ পাই :

---

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৯, পৃ. ১৯৩

২ *Charles Freer Andrews*, by Benarsidas Chaturvedi & Marjorie Sykes, p. 89

৩ ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত

Santiniketan, July 28, 1918

—If I remain a missionary, in a somewhat narrow missionary society, I am in a sort of bondage.

…On the other hand, the call comes more and more insistently to give my whole love and affection to India herself and live the Christian life in doing so.[১]

Delhi, Sept 1, 1918

…I have found my goal in India and can never think of this land even for a moment as any other than my home and this has come so naturally and spontaneously that I cannot doubt it is from God Himself.[২]

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দিতে বলেন। তাই এণ্ড্রুজের পরবর্তী চিঠিতে পাই (৭ ডিসেম্বর ১৯১৩)—

You, my dear friend, by welcoming me to Santiniketan—have opened the way to enter into His Peace.[৩]

শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে এক সভা (১৫ এপ্রিল ১৯১৪) আহ্বান করে কবি এণ্ড্রুজকে স্বাগত জানালেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান—

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু গ্রহণ কর, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ কর, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।[৪]

১-৩ মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত

৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২১, পৃ. ৮৫

সেবার নববর্ষের দিন কবি তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থ এণ্ডরুজকে উৎসর্গ করেন (এপ্রিল ১৯১৪)।

প্রথম পর্বের ভূমিকা

'রামগড়'। ১৯১৪ মে মাসে রবীন্দ্রনাথ রামগড়ে যান। 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই সময়কার মনের অবস্থার কথা পরে তিনি বলেছেন—

'চার পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।'[১]

'আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ'। ১৯১৪য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৪ অগস্ট ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগদান করায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

'সর্বনেশে'। (রামগড় ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "য়ুরোপীয় যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে। এণ্ডরুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল।"[২]

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো (বলাকা কাব্যগ্রন্থের ২ নং কবিতা)

Is it the Destroyer who comes ?[৩]

প্রথম পর্বের চিঠি

১৯১৩ এবং ১৯১৪ সালে এণ্ডরুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রগুলি পাওয়া

১-২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৩ *Lover's Gift and Crossing*, 22

যায় নি। পূর্বে উল্লিখিত এণ্ডরুজের ডায়ারি দুটির মধ্যেই কেবল সেই সময়কার কয়েকখানি চিঠির কপি পাওয়া যায়।

লণ্ডন। ১৬ অগস্ট ১৯১৩

ডায়ারিতে ১৬ অগস্টে লেখা কোনো চিঠি নেই। এ চিঠির প্রথমাংশ পাই ২৯ জুলাই; আর দ্বিতীয়াংশ পাই ১৯ অগস্টের চিঠিতে।

'রোটেনস্টাইনের পল্লীভবন'। গ্লস্টারশায়ারে চ্যালফোর্ড নামে এক গ্রামে রোটেনস্টাইনের Far Oakridge নামে ভবনটিতে কবি আমেরিকা থেকে ফিরে কয়েকদিন ছিলেন (১৯১৩ অগস্ট)।[১]

কলিকাতা। ১১ অক্টোবর ১৯১৩

ডায়ারির ১৬ অক্টোবর ১৯১৩ চিঠির শেষাংশ এ চিঠির সঙ্গে যুক্ত আছে।

'শান্তিনিকেতনে আমাদের ছেলেদের দৃষ্টির পরিধি যথাসম্ভব বিস্তৃত হওয়া চাই।'

পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে কি প্রসঙ্গে এ কথাগুলি তিনি লিখেছিলেন।

'I send you the reply I gave to Professor Starbuck of Boston with his own letter—[suggesting Scholarships] as to cultivate the feeling of international fellowship among the boys of our school and those of some schools in the West (i. e. by means of interchange of letters etc, objects of interest for the school library, natural history specimens etc), but definitely refusing any money-aid.

What do you think of this? Or have you any other suggestion to make ?[২]

শান্তিনিকেতন। ১১ অক্টোবর ১৯১৩

ডায়ারিতে ১৯১৩, ১৬ অক্টোবরের দুখানি চিঠি আছে। তার দ্বিতীয়টি

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

২ ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত

পুস্তকের শান্তিনিকেতন ১১ অক্টোবরের চিঠি।

'জগদানন্দ'। ১৮৬৯-১৯৩৩

জগদানন্দ রায় শিলাইদহ থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকেই শিক্ষকের কাজে আসেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখা পোকামাকড়, গ্রহনক্ষত্র, গাছপালা ও বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ।

'রোজ নতুন গান রচনা করছি'— গীতিমাল্যের গানের পালা চলছে।[১]

তালগাছ সম্বন্ধে এণ্ডরুজের কবিতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ডায়ারি থেকে ১৯১৩, ২৫ অক্টোবর তারিখে লেখা আর একখানি অপ্রকাশিত চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

…I have greatly enjoyed reading your beautiful verses on the row of palm trees standing on the border of our বাঁধ। I wonder if the visitors who pay casual visits here can feel the ethereal quality of the beauty, which seems to hover over the landscape here.

As for me, I have seen nothing anywhere else which can be compared with it, in its simplicity of details combined with such depth of meaning.[২]

বাঁধের পাড়ে তালগাছের ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন বলে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯ অগস্ট ১৯১৩ তারিখের পত্রে লেখেন—

I must thank you for the water-colour picture you have sent me of বাঁধ। It is like a dream-picture that I have in my heart and those palm-trees seem to be standing a-tip-toe to catch a glimpse of their lover across the sea ![৩]

মায়ের মৃত্যুর পর এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন (পরিশিষ্ট ২, ৫নং চিঠি—২৭ জানুয়ারি ১৯১৪)— তাতে উল্লেখ রয়েছে তালগাছ সম্বন্ধে কবিতার স্তবকগুলো মায়ের কাছেও তিনি পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটির প্রথম দুটি ও শেষ তিনটি স্তবক—

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

২-৩ ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত

The Palms At Santiniketan

When the last glow of day is dying
For in the still and silent west,
The palm-trees cease their plaintive sighing
And slowly lull themselves to rest.

Through the deep gloom their shapes grow dimmer,
Rare as the mist-wraiths of the night,
Only on high the starry shimmer,
Touches their waving tops with light.

Peace in the deep mid-air surrounding,
Peace in the sky from pole to pole,
Peace to the far horizon bounding,
Peace in the universal soul.

And peace at last to the restless longing
Which swept my life with tumult vain,
And stirred each gust of memory thronging
Avenues drear of by-gone pain.

Tossed to and fro I had sorely striven,
Seeking, and finding no release :
Here, by the palm-trees, came God-given
Utter, ineffable, boundless peace.[১]

কাব্যে ও চিত্রকলায় এণ্ডরুজের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তার পরিচয় তাঁর চিঠিতেও পাই। ১৯১২ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। সেখানি বিশ্বভারতীর কলাভবনে রয়েছে। যীশুখ্রীস্টের যে করুণ মুখচ্ছবি তাঁর ধ্যানে ছিল, তারই প্রতিফলন হয়েছে এই ছবিটিতে।

১ *The Modern Review*, Oct. 1914, p. 416.

শান্তিনিকেতন। ফেব্রুয়ারি ১৯১৪

ডায়ারিতে তারিখ রয়েছে ৯ ফেব্রুয়ারি। এণ্ড্রুজ তখন বিলেতে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে মায়ের মৃত্যুর পর প্রথম বাড়ি গেছেন।

'একটি গানের অনুবাদ'—গানটি—

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে ;
তুমি আমার বন্ধু।[১]

গানটির কবি-কৃত অনুবাদ—

You have come to me hidden in the darkness
of night, My Friend !
You draw me to your bosom with your firm
strong hands, My Joy !
You ride upon the chariot, drawn by my sorrow,
My Friend !
Is it a trouble, is it a loss ?
It is You, My Joy !
O the Enemy, defeat me in your fight,
My Friend !
O the Awful, make an end to all the fears,
My Joy !
O Thunder, rend my heart and enter into my being,
My Friend !
O Death, Show me the path to immortal freedom,
My Joy ![২]

রবীন্দ্রনাথের কোনো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে গানটির অনুবাদ নেই।

শান্তিনিকেতন। ৫ মার্চ ১৯১৪

এণ্ড্রুজকে কবি যে সব চিঠি লিখতেন, সেগুলির সম্পাদনায় এণ্ড্রুজ অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গেছেন। এ চিঠিখানি এণ্ড্রুজের মায়ের মৃত্যুর পর বিলেতে গিয়ে পান। তার আরম্ভের অংশ—

১ গীতিমাল্য, ৪৭ ; রচনাকাল : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০

২ ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত

I can well imagine how you must feel when you come home to miss the dear familiar face and the welcome which had been yours from your birth.

But I do hope that your consolation will be as great as your sorrow is. and the supreme sacrifice you had to offer while doing your work. will bring its own compensation.…

পত্রের উপসংহারে লেখেন—

I know your friendship will be a shelter for me under whose protection I shall have my peace and rest [১]

শান্তিনিকেতন। ১০ মে ১৯১৪

'আপনি আমার পাহাড়ে যাবার সঙ্গী হচ্ছেন কবে?'— ১৯১৪র মে মাসে রবীন্দ্রনাথ রামগড় যান। কবির আহ্বানে দিল্লী থেকে এণ্ডরুজ তখনই সেখানে যেতে পারেন নি। কেননা দিল্লীতে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের সব দায়িত্বভার মুক্ত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিনই উভয়ের পত্র-বিনিময় চলে।

রামগড়। ১৪-১৫ মে ১৯১৪

পুস্তকে ১৪ মে ১৯১৪র চিঠির তারিখ ডায়ারিতে আছে ১৩ মে ১৯১৪।

এ দুখানি চিঠিতে যে যে অংশ এণ্ডরুজের সম্পাদনায় বাদ পড়েছিল, সে কথাগুলি মূল্যবান মনে করে উদ্‌ধৃত করা হল।

If I recklessly scatter myself all about me, I cannot grow. And if I donot grow I cannot produce the fruits and flowers that are claimed from me by the whole scheme of things.…

I cannot tell you the great joy of seeing everything through the sight of the soul, and to feel oneself close to the bosom of the infinite 'I am'.

All our works find their finality in this realisation. And

১ ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত

when a man attains it Humanity reaches its goal in him.[১]

রামগড়। ১৭-২২ মে ১৯১৪

এই কদিনের চিঠিতে কবির দুঃসহ মানসিক সংগ্রামের কথা লেখা আছে। সেসব চিঠির উত্তরে এণ্ডরুজ দিল্লী থেকে যে চিঠিগুলি লেখেন, সেগুলি পরিশিষ্ট-২এ দেওয়া হল। ডায়ারিতে ২১ মে ১৯১৪র দুখানি চিঠি আছে। পুস্তকে দ্বিতীয়টি ছাপানোর তারিখ ২২ মে।

রামগড়। ২৩-২৫ মে ১৯১৪

২৪ মের চিঠি ২৫ মে আর ২৫ মের চিঠি ২৪ মে তারিখ দিয়ে ছাপানো হয়েছে। ২৩ ও ২৪ মের চিঠি দেখে বোঝা যায় তিনি পূর্বের বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন। ২৪ মের পত্রের শেষাংশ অপ্রকাশিত—

We strain after ideals thus losing and wasting our vital resources, because there is deviation of truth from the centre of our being. Let us be perfect, even as our Father is, as is the শান্তং শিবং অদ্বৈতং।[২]

৫-১৫ জুন কবি ও এণ্ডরুজ রামগড়ে একসঙ্গে কাটান।[৩]

দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকা

১৯১৪-তে পৃথিবীর মহাযুদ্ধ হঠাৎ আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় ব্যথিত চিত্তে প্রার্থনা করেন, 'স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে··· মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে।··· বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর কর।'[৪]

১-২ ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত

৩ দ্র. *Charles Freer Andrews*. B. Chaturvedi & M. Sykes, p. 105

৪ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪০৪

'যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে ওঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।'[১]

The Boatman…

পাড়ি (কলিকাতা ৫ ভাদ্র ১৩২১)
মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে (বলাকা : ৫)

The Boatman is out crossing the wild sea
at night.[২]

The Trumpet—

শঙ্খ (রামগড় ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)।
তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে
কেমন করে সইব (বলাকা : ৪)

The Trumpet lies in the dust.[৩]

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বলাকার 'শঙ্খ' বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই, উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে।'[৪]

The Oarsman—

ঝড়ের খেয়া (কলিকাতা ২৩ কার্তিক ১৩২২)
দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন
ওরে দীন, ওরে উদাসীন। (বলাকা : ৩৭)

Do you hear the tumult of death afar.[৫]

---

১ পাপের মার্জনা, ৯ ভাদ্র ১৩২১ : শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড

২ *Fruit Gathering*, XLI

৩ *Fruit Gathering*, XXXV

৪ 'কনক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত কয়েকখানি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা'—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, পৃ. ১২৩

৫ *Fruit Gathering*, LXXYIV

'চতুর্থ কবিতাটি'—

বিচার (শান্তিনিকেতন ১২ পৌষ ১৩২১)।

হে মোর সুন্দর

যেতে যেতে

পথের প্রমোদে মেতে (বলাকা : ১২)

When, mad in their mirth, they raised dust to soil thy robe.[১]

'খ্রীষ্ট জন্মোৎসবের ভাষণ'।

খ্রীষ্টান খ্রীষ্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি।

…যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪[২]

দ্বিতীয় পর্বের চিঠি

শান্তিনিকেতন। ৪ অক্টোবর ১৯১৪

'সুরুল'। ১৯১২য় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভাই নরেন্দ্রপ্রসন্নর কাছ থেকে সুরুলের কুঠিবাড়ি কেনেন। ১৯১৪য় সেখানে ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন আর তার চারপাশে জমিসংগ্রহ করে রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় গবেষণাকার্যে ব্রতী করেন।[৩]

'ডঃ মৈত্র'। বিলাত যাবার আগে কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালের ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। ডাক্তার মৈত্রকে কবি লিখেছিলেন, 'আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই তো সভার মতো সভা।' কবিকে ঘিরে সেখানে সাহিত্যিকদের সভা বসত।[৪]

---

১ *Fruit Gathering*, XXXVI

২ খৃষ্ট, পৃ. ২৬-২৭।

৩-৪ রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড

শান্তিনিকেতন। ৭ অক্টোবর ১৯১৪

...'I am not certain of my programme. I may drift on to Hardwar or other more impossible places,' এ সময়ে বুদ্ধগয়া, এলাহাবাদ, দিল্লী এসব জায়গায় ভ্রমণ করেন।

দার্জিলিং। ১১ নবেম্বর ১৯১৪

এই পত্রের তারিখ ভুল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল চিঠিতে তারিখ রয়েছে ১১ জুন ১৯১৫। তা ছাড়া এর উত্তরে এণ্ডরুজ তাঁকে যে পত্র লেখেন, সেটির তারিখ ১৫ জুন ১৯১৫। এণ্ডরুজের পত্রখানির অনুবাদ পরিশিষ্ট ২-এর ১২ নং চিঠি।

'শ্রীযুক্ত রুদ্র'। ১৯০৪ সালে এণ্ডরুজ প্রথম ভারতে এসে যখন দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে যোগ দিলেন তখন সুশীলকুমার রুদ্র সেখানকার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এণ্ডরুজের শৈশব ও যৌবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেসিল ওয়েস্টকটের তিনি সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর মাতৃহীন সন্তান তিনটির প্রতি এণ্ডরুজের স্নেহমমতা স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়— ক্রমে সুশীলের গৃহ তাঁর নিজগৃহের মতোই হয়ে উঠল। ১৯২৩ সালে শ্রীযুক্ত রুদ্রের অবসর গ্রহণের সময় The Stephanian পত্রিকায় এণ্ডরুজ লিখলেন—

'I owe to Sushil Rudra what I owe to no one else in the world, a friendship which has made India from the first, not a strange land but a familiar country'.[১]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তার প্রকৃত রূপ ও অশুভ পরিণাম এণ্ডরুজ দেখতে পেলেন— তাঁর চোখ থেকে একটি পর্দা যেন সরে গেল।... এই সুপ্রাচীন সভ্য দেশের সাধারণ লোকের ধৈর্যও অকৃত্রিম সরলতার পিছনে যে সহজাত ধর্মভাব রয়েছে, তা কত সুন্দর, কত সহজ, তিনি বুঝলেন। যে সম্প্রদায়গত কাঠিন্যের মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন সে যে খ্রীস্টভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী— সে বিষয়েও তাঁকে সজাগ করেছিলেন সুশীলকুমার।[২]

১ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 88

২ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 41

এণ্ডরুজ যখন লাহোরে গিয়ে University fellowship ত্যাগ করলেন— তখন তাঁর স্বদেশীয় সহকর্মীরা প্রায় সকলেই তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন। ভারত-সেবায় তাঁর এই ত্যাগ ব্রিটিশ সরকার এবং এদেশীয় লোকের চোখে বিস্ময়কর ঠেকে। কেউ কেউ তাঁকে সরকারের গুপ্তচর বলেও সন্দেহ করেন। কিন্তু সুশীল রুদ্র তাঁর বন্ধুর সংকল্পের সত্যতায় নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন; দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এণ্ডরুজ ফিরে এলে তাঁর মুখে অন্তর্‌প্রেরণার দীপ্ত প্রতিভাস দেখে তাঁর পিতাকে জানিয়েছিলেন—

'There is a brightness and a joy of an unspeakable sort in his face. It is certain that he has got to things which come from felt spiritual power. He moves people wherever he goes.'[১]

গান্ধীজি এণ্ডরুজকে একবার হেসে বলেছিলেন, 'Susil Rudra, Munshi Ram and Rabindra Nath Tagore compose your real Trinity.'[২]

কলিকাতা। ১৫ নভেম্বর ১৯১৪

(ডায়ারিতে ১৭ নভেম্বর) 'রাজা নাটকের সমালোচনা'। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'রাজা' নাটকের সমালোচনা করেন। সেই প্রসঙ্গে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন (১৩ নবেম্বর ১৯১৪)—

'Brajendra Babu's criticism astounded me. রাজা not human ! Allegorical ! What next ? Why ! The character of the Queen so absorbed me that I could think of nothing else for days. It was a living soul going through an agony of conflict and entering at last into peace, a soul so living that I knew her intimately and could almost speak with her.[৩]

'লেডি ম্যাকবেথ'। উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়র-রচিত ট্রাজেডি ম্যাকবেথের নায়িকা। অশুভবুদ্ধি ও লোভের বশে স্বামী ম্যাকবেথের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অতিথি রাজা ডানকানের হত্যায় প্ররোচিত করেন।

---

১ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 105

২ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 100

৩ মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত

১৯১৪, ১৮ নভেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠি ডায়ারিতে আছে। সেটি ও ৩০-নভেম্বরে লেখা ডায়ারির আর-একটি চিঠি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে কবি এই সময় আবার একবার রামগড়ে গিয়েছিলেন।

'I am starting for Ramgarh to-night and don't know when I shall be back. I shall rely upon my জীবন-দেবতা to fix dates for me. I hope he will allow me to stay in the hills till the snows melt and the streams run towards the plains.…

The enjoyment of my visit to Ramgarh is in the potential mood with me, which, very often, is the happiest mood.

৩০ নবেম্বর ১৯১৪

I hope you will be able to stay on at Allahabad till I come. The Himalayas did not give me a warm enough reception this time and our parting was cold and cheerless.

I have done very little literary work, I suppose, for want of proper warmth. I ought to be able to hibernate in the winter and wake up in summer in full bloom of music and song.

আগ্রা। ৫ ডিসেম্বর ১৯১৪

'রিলিফ ফাণ্ড'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের পাটচাষীদের দুরবস্থা দেখে আসেন দুজন শিক্ষক— পিয়রসন ও কালীমোহন ঘোষ। ছাত্ররা সে কথা শুনে আশ্রমসম্মিলনীতে স্থির করে ঘি ও চিনি না খেয়ে সে টাকা ওরা দুঃস্থের সাহায্যে দান করবে।[১]

এ প্রসঙ্গে Modern Review ডিসেম্বর ১৯১৪ থেকে উদ্ধৃত করি (p. 667.)।

A Noble Example

The boys of Babu Rabindranath Tagore's school at Bolpur have opened a relief fund. They have invited subscriptions to their fund to be sent to Mr. W. W. Pearson, Santiniketan

১ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

P. O. In addition to what the boys can personally contribute, they have in a body resolved to save some Rs 40 a month by not consuming sugar. This amount will go to the relief fund. By not consuming ghee for three months, they will be able to contribute Rs 500 to their relief fund.

রবীন্দ্রনাথ এতে আপত্তি করে যখন পত্রে জানালেন ছেলেদের কর্তব্য কী, তখন সত্যই তারা কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দান করেছিল।

এলাহাবাদ। ১৮ ডিসেম্বর ১৯১৪

'অন্যের সঙ্গে এমন সম্পর্ক আমি গড়তে পারি নে যাতে আমার জীবনের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়।'

প্রিয়নাথ সেনকেও একবার লেখেন, 'আমি বহুল পরিমাণে নির্জন অবকাশ এবং মঙ্গলকর্মের বৃহৎ ক্ষেত্র চাই।... আমি নিজের কাছ থেকে প্রত্যহ দূরে যাচ্ছি— বন্ধুরাও আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না।[১]

১৮ ডিসেম্বরের পত্রের যে অংশটি সম্পাদনায় বাদ পড়েছিল তাও ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত করি—

I earnestly hope that our conversations here have not left a feeling of soreness in your heart. For I do not know how to heal the wounds that painfully surprise my friends, when in the intercourse with me they stumble against fences that can never be removed.

প্রথাগত খ্রীষ্টধর্মের কতগুলি আচার-আচরণে এণ্ডরুজের বিবেক ক্ষুব্ধ হয়। তখন তিনি বিশপকে লেখেন যে তিনি আর ধর্মযাজকের কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। সেই সময়টিতে তাঁর চিত্ত ছিল গভীর নিঃসঙ্গতা ও পরমবেদনায় আর্ত। রবীন্দ্রনাথ তখন অসীম ধৈর্য ও অকৃত্রিম অনুরাগে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, যে-ভালোবাসা নিষ্কাম নয় তা সর্বদা পরিত্যাজ্য। তাঁর ইষ্টদেব যীশুখ্রীস্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে খ্রীস্টপ্রদর্শিত পথেই যেন তিনি চিত্তের সাম্য খোঁজেন।[২]

---

১ চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

২ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 107.

এ বিষয়ে পরে এণ্ড্রুজ লিখেছেন—

He [Gurudev] would urge me again and again to cling fast to my Christian devotional life as a priceless heritage. When he saw me at one time slipping into vagueness, he warned me.[১]

'The world is too much with us.'—ইংরেজি সাহিত্যের রোমাণ্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি William Wordsworth-এর সনেটের (XXXIII) প্রথম অংশ।

কলিকাতা। ২০ জানুয়ারি ১৯১৫

পত্রের অবশিষ্টাংশ

…You depend too much on man. You must live in that pure atmosphere of শান্তি where happiness is simple like morning light and where everything is given to you because you expect nothing. I pray with all my heart that your mind may be emancipated in the peace of truth, in the serene fullness of God's love.

কলিকাতা। ২৯ জানুয়ারি ১৯১৫

ডায়ারিতে ১ ফেব্রুয়ারি আছে।

শিলাইদহ। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

কলিকাতায় কবি দিন সতেরো ছিলেন। সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা ও প্রতিপক্ষীয় দলের উক্তির অতিরঞ্জিত বিবৃতি তাঁর কানে পৌঁছয়। কবির মন কোথাও স্থির হয় না, তাই পদ্মাতীরে শিলাইদহ গেলেন।[২]

কলিকাতা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

'মহাত্মা ও শ্রীমতী গান্ধী'। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের বিষয় আলোচনা করতে গান্ধীজী ইংলণ্ডে যান। সেই সময় তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের কয়েকজন

১ The Visva-Bharati Quarterly, Oct. 1925, p. 294

২ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

শিক্ষক ও ছাত্র এসে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিলাত থেকে ফেরার পথে শ্রীযুক্তা কস্তুরবাকে নিয়ে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন কবি ছিলেন কলিকাতায়। কিন্তু তাঁর নির্দেশ মতো আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা গান্ধীদম্পতির যোগ্য অভ্যর্থনা করেছিলেন।

Recently Mr. & Mrs. Gandhi visited Bolpur. Those who went to receive them at the railway station searched for them in the first and second class carriages of the train. Not finding them there, the party were about to leave the station disappointed, when the guests were seen to get down barefooted from a third class carriage—so say the 'Sanjibani.'[১]

'নিগৃহীত রাজপুত বালক'। ১৯১৫ মার্চ সংখ্যার Modern Review পত্রিকায় (P. 361-62) পাই— 'The case of Pandit Arjunlal Sethi is a particularly hard one... The Pandit has been sentenced to undergo confinement for five years. There has been no trial, because, it can be safely presumed, there is no evidence against him. He is a subject of the Jaipur state in Rajputana'.

এই রাজপুত বালকটি পণ্ডিত অর্জুনলাল শেঠির পুত্র প্রতাপ শেঠি।

তৃতীয় পর্বের ভূমিকা

'এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত'। ১৯১৫ মে মাসের মাঝামাঝি এণ্ডরুজ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হন। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা ও যত্নে তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে কলিকাতায় উডস্ট্রীট নার্সিং হোমে কিছুদিন রইলেন। পরে শিমলা যান।[২]

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন'। অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে (পৃ. ৫৭২) পাই—

---

১ *The Modern Review*, March 1915, p. 361.

২ *What I Owe to Christ*, p. 283

'১৮৭৭ সালে কতক সময় শান্তিনিকেতনে নির্জনে কাটাইয়া, হঠাৎ এই বছরের শেষে দেবেন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণে বাহির হইয়া যান। এই চীনভ্রমণের কোন বৃত্তান্ত জানিবার উপায় নাই— এ সময়কার কোন চিঠিপত্রও নাই। ১৮৭৮ সালের গোড়ায় তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।'

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ··· তৈত্তিরীয় ৩।৬।১

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ··· গায়ত্রীমন্ত্র, ঋগ্বেদ ৩।৬০।১০

তৃতীয় পর্বের চিঠি

শান্তিনিকেতন। ৩০ জুন ১৯১৫

'সর্বাধ্যক্ষ'। সে সময়ে সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন কবির জ্যেষ্ঠ অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ।

কলিকাতা। ৭ জুলাই ১৯১৫

রবীন্দ্রনাথ এ সময় শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়ে এণ্ডরুজকে লেখেন—বৈরাগ্য তাঁর ধর্ম নয়। কবির মন সজীব সমগ্রতায় মুক্তি চায়—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'[১]

'পিয়রসনের কাছে আমার সব প্ল্যানের কথা শুনেছেন'।

১৯ জুন ১৯১৫তে কলিকাতা থেকে কবি পিয়রসনকে যে চিঠি দেন তাতে আছে—

'I am trying to start a model school in our Jorasanko house where rational methods will be followed and board of examiners defied ; if it is successful it will be an object lesson to our Bolpur school. We shall keep you in the advisory board— for you will be able to help it when in course of time it shows any sign of ossification.'[২]

---

১ নৈবেদ্য, ৩০ (১৩০৮ সাল)

২ *The Visva-Bharati Quarterly*, May-July 1948.

কলিকাতা। ১১ জুলাই ১৯১৫

'আপনি পৃথিবীতে অন্যায়ের গ্লানি দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন'। ১৯১৫, ৮ জুলাই-এর পত্রে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

Now that I am strong again— I cannot, any longer, excuse myself for not giving a patient hearing to the stories of intolerable wrong that come to me— and the great proportion of them are so obviously true. And then, just a word here, or an interview there, might put all right and make people happy. And so an attempt *has* to be made— at least I cannot bear not to do so – and then at once the red tape comes in, and the official cold, delaying answer that makes one's blood boil over ; and the great inhuman machine rolls round once more over poor human lives making another crushing grinding revolution ..

It is the indentured coolie trouble, however, that has touched me closest of all and has seemed a nearer and more insistent duty. I *must* do this— at least it appears imperative, for only Mr. Gandhi and Willie and I have seen what it really means.[১]

শিলাইদহ। ১৬ জুলাই ১৯১৫

'রেলের কামরায় বসে লেখা আগের চিঠিতে আমার জাপান যাবার সম্ভাবনার কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম'।

১৯১৫ সালের ১২ জুলাই পতিসর যাবার পথে ট্রেনে বসে কবি এণ্ডরুজকে যে চিঠি লেখেন তাতে পাই—

I gave up Japan but Japan is insistent.··· The steamer is to sail about the 7th of the next month.[২]

'পূর্ণতার প্রতিসৃষ্টি আপনার ধ্যানে রয়েছে'। এই চিঠিও এ সময়কার আরেকখানা চিঠির (পরিশিষ্ট— ৩এর ৪নং চিঠি) উত্তরে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র দেন, তার অনুবাদ এখানে উদ্‌ধৃত হল।

১-২ মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত

ইনভেরার্ম। শিমলা। ২২ অগস্ট ১৯১৫

প্রিয়বরেষু

মর্ত্যমানবের বেদনায় ঈশ্বরের পরম প্রকাশ— এই বিষয়টি নিয়ে আপনি বিশদ আলোচনা করে আমাকে চিঠি দিয়েছেন— তাতে আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। আমার প্রয়োজন আপনি যথার্থ অনুভব করেছেন। এ দুখানি চিঠি আর দুঃখ সম্বন্ধে উইলির সঙ্গে আপনার আলোচনার নোট— এতে সংশয়ের মেঘান্ধকার কেটে গিয়ে আমার মনকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল করে তুলেছে।

শৈশব থেকে অন্তরের যে ভাবনাগুলো ক্রমশ গড়ে তুলে পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রের মতো ধারণ করে রয়েছি, তাদের এখন ছাড়তে হবে দেখছি। প্রাচীন খ্রীস্টীয় প্রথায় বিশ্বাসী আমার মনের চিন্তাধারা এ বিষয়ে ছিল অপরিণত। দুঃখবেদনায়ই তাঁর প্রকাশ— এ ধারণা এত সুদৃঢ় ছিল যে আর্তের মধ্যেই কেবল আমার প্রভুকে মূর্ত দেখতাম। তাই দুঃখভোগের বাসনাই অন্তরে ছিল প্রবল। যেন কেবল সেই একটিমাত্র পথেই মানবাত্মা এগিয়ে চলে লক্ষ্য অভিমুখে। নিষ্পাপ সরল আনন্দ যে সে পথে চলার আরো বড়ো সহায় সে কথা ভুলেই ছিলাম। ক্রমশ তাই প্রতীক-উপাসনার মতোই এতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি— আপনিই আমাকে মুক্তি দিলেন।

বুদ্ধ বা যীশুর উপদেশে এ বাণী মেলে না। এ যে সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গি— সব বিষাদম্লানতা ছাপিয়ে এই আশা-আলোকের জয়ধ্বনি শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি নেই।

খ্রীস্টের জীবনখানি এখন আবার ফিরে পড়ছি অতি আনন্দে। আমার নবচেতনার আলোয় সব নতুন করে দেখছি। শিশুর সাহচর্যে, দাম্পত্যজীবনে, স্বজনবাৎসল্যে ; পাখিতে, ফুলেতে, গাছেতে— প্রকৃতির অনন্ত লীলামধুরিমায় যীশুখ্রীস্টের যে অনাবিল আনন্দ-উপভোগের পরিচয় পাই— সে তো দুঃখ নয়, আনন্দময় প্রেমেরই সাধনা।

সৌন্দর্যবোধের যে নবদৃষ্টি আপনার কাছ হতে লাভ করলাম— তারই সাহায্যে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসৌন্দর্য প্রতিভাত হল। এতে খণ্ডতা নেই, দেহ প্রাণ আত্মা স্বর্গ মর্ত— সর্বত্র একই পরম সত্তার বিচিত্র আনন্দ অনুভূতি।[১]

---

১ মূল চিঠি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

শান্তিনিকেতন। ৭ অগস্ট ১৯১৫

মূল চিঠিতে তারিখ রয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ আর স্থান শিলাইদহ।

'দুটি বিপরীত শক্তির মিলনেই সম্ভূত হয় সকল নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার।… যুদ্ধ ও শান্তি দুয়ের মিলনেই পূর্ণ সত্য'—

চিঠির যে অংশ পুস্তকে প্রকাশিত হয় নি সেটি উদ্ধৃত করলে উপরের ভাবটি বুঝতে সুবিধা হবে।

About the question you have raised in your letter (i.e the use of force), I must be brief for my mind is occupied with other things and the subject is difficult, and I find it hard to work out my problems while trying to think in English.[১]

শান্তিনিকেতন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৫

'রিহার্সেল'।

'শারদোৎসব' নাটকের রিহার্সেল।[২]

চতুর্থ পর্বের ভূমিকা

'The song of the Defeated'[৩]
বাংলা 'হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান'—গানটি যদিও এর পরে লেখা, তবু এই কবিতাটির সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

'রোমাঁ রোলাঁ সেগুলি ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন'।

Liber Amicorum Romain Rolland গ্রন্থের এণ্ড্রুজ লিখিত A Reminiscence প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য—

The lectures that were thus delivered in Tokio very soon reached Europe. Through his sister Romain Rolland translat-

---

১ মূল পত্র ও ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত

২ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

৩ *Fruit Gathering*, LXXXV

ed them into French and published them with an introduction of his own in the very centre of Europe in the midst of the struggle of nations. He declared that a new voice had arisen in the East proclaiming peace and good-will to mankind and called upon Europe to listen to it with humility and awe.[১]

চতুর্থ পর্বের চিঠি

শিলাইদহ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

'মনেরে আজ কহ যে'। ক্ষণিকা। বোঝাপড়া। ১৩০৭।

Gardener বা অন্য কোনো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে 'বোঝাপড়া' কবিতার কোনো অনুবাদ নেই। রবীন্দ্রনাথের মূলপত্রে Gardener পুস্তকটিরও উল্লেখ নেই। Gardener-এর অধিকাংশ কবিতাই ক্ষণিকার অন্তর্ভুক্ত। 'বোঝাপড়া' কবিতাটিও ক্ষণিকাতে আছে। সম্ভবত সেই কারণেই Andrews-এর এই ভুল হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদটি তাই এখানে উদ্ধৃত হল—

Whatever may come, my heart, take truth simply.
Though there be some who can love you, there
must be others who never can, and if you
must know the cause, it is as much in you
as in them, and in all things around.

Some doors are closed against your knocks,
while your doors are not open always and to all comers.
Such has been and shall be for evermore ; and
yet if you must have peace, my heart, take truth simply.

There is no need to be abusive if your boat founders
by the shore, though it sailed through the storm.
Keep yourself afloat by all means ; but if it is impossible
to do so, then be good enough to sink without noise.

১ *Rolland and Tagore*, p. 18.

It is a commonplace fact that things may or may not
fit you and events happen without asking for your leave.
Yet if you must have peace, my heart, take truth simply.

You press and are pressed hard in the crowd, but
space there is enough and to spare in this world.
When you have counted your losses to the last farthing,
Your sky remains as blue as ever.
You find, when suddenly tested, that to live is
sweeter than to die.
You may miss this and that and the other thing, but if
you must have peace, my heart, take truth simply.

Must you stand with your back to the rising sun
and watch your shadow lengthened before you ?
Must you take pleasure in finding fault with your destiny
and thus tease your soul to death ?
Then for mercy's sake be quick and have done with it ;
for if, with the evening stars, you must light
your lamp, my heart, take truth simply.

শিলাইদহ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ তারিখে এণ্ডরুজের জন্মদিনের শুভেচ্ছাবাণী —মূল পত্র থেকে উদ্ধৃত।

My very dear friend,

May your birthday dawn to you in perfect light and freedom and love ! Let it be the birth of your soul from discords to music.

'The pain was great when the strings were being tuned, My master…[১]

'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা'। এই গানটির অনুবাদ।

শিলাইদহ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

'রিপোর্ট'। এণ্ডরুজ ও পিয়রসন ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রম সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করতে যান তার রিপোর্ট। ১৯১৬ সালের (মার্চ-জুন) চারটি সংখ্যায়

১ *Fruit Gathering*, XLIX

ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের সেই রিপোর্ট মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১]

শান্তিনিকেতন। ৯ জুলাই ১৯১৭

'সন্তোষ মিত্র'। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র সন্তোষকুমার মিত্র বিদ্যালয়ের শিশুদের ড্রয়িং শেখাবার কাজে যোগ দেন। পরে তিনি কৃষিবিদ্যা ও গো-পালনে আত্মনিয়োগ করেন।

'নেপালবাবুর রাস্তা'। এলাহাবাদের রাজনৈতিক কাজ ও মতামতের জন্য যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ ও সরকার সেখানকার কায়স্থ কলেজের শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়কে নানাভাবে নির্যাতন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি আসেন। কিন্তু পরে আশ্রমের আদর্শ ও কর্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হয়ে পড়েন।[২]

গান্ধীজী যেবার প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে যে পথ দিয়ে আশ্রমে আনা হয়, সেই পথ তৈরি করেছিলেন নেপালবাবু ছাত্রদের নিয়ে। হিন্দীভবনের সামনে দিয়ে যে পথ খেলার মাঠ পর্যন্ত গেছে, সেটিই শান্তিনিকেতনে 'নেপাল রায় রোড' নামে পরিচিত।

'শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ'। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কর শিল্পশিক্ষকরূপে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন।

'গোরা'। গৌরগোপাল ঘোষ, আশ্রমের ছাত্র। কলিকাতা থেকে বি. এসসি পাস করে এসে আবার শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। কলিকাতায় ছাত্র-জীবনে মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।[৩]

১ এণ্ডরুজকে লেখা এর পরের চিঠি ১৯১৭র জুলাই মাসে

২ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

৩ শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৪৭

পঞ্চম পর্বের ভূমিকা

'তার নাম দিলেন তিনি বিশ্বভারতী'— ১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর Los Angelos থেকে রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

'ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।'[১]

সে বছরেরই ২৮ অক্টোবর শিকাগো থেকে রথীন্দ্রনাথকে এবিষয়ে আবার লেখেন—

আমরা মানববিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।··· মহা-বিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব।[২]

The Religion of the Forest এই ভাষণটি Creative unityতে আছে।

'জালিয়ানওয়ালাবাগে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার প্রস্তাব'।

পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের একবছর পর বোম্বাইতে জাতীয় সপ্তাহের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী পাঠ করেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। তার কিছু অংশ উদ্‌ধৃত হল—

When brother spills the blood of his brother and exults in his own sin, giving it a high-sounding name, when he tries to keep the blood-stains fresh on the soil by a memorial of his anger, then God in shame conceals it under his green grass and the sweet purity of his flower.··· Let those who will, try to burden the minds of the future with stones carrying the black memory of wrongs and their anger, but let us bequeath to the generations to come a memorial of that only

---

১ চিঠিপত্র ২, পৃ. ৫৬

২ চিঠিপত্র ২, পৃ. ৫৯, ৬১

which we can revere. Let us be grateful to our forefathers who have left us the image of our Buddha who conquered self, preached forgiveness and spread his love wide in time and space[১].

এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (১৩২৭ বৈশাখ পৃ. ৬৫-৬৬) লেখা হয়, 'যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনো পক্ষেই বীর্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিব ? আমাদের রাজপুরুষরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব ? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নয় ?'

পঞ্চম পর্বের চিঠি

লণ্ডন। ১৭ জুন ১৯২০

'Ode to west wind'—

ইংরেজ-কবি শেলীর সুবিখ্যাত কবিতা।

'হাফিজ'। শামসুদ্দীন মহম্মদ হাফিজ (১৩২০-১৩৮৯) চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি।

লণ্ডনে যাবার পথে আগাখাঁ রবীন্দ্রনাথকে হাফিজের রচনা পাঠ করে শোনান ও সুফীধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন।

'অক্সফোর্ড'। ১৯ জুন ১৯২০ রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড যান। সেখানে কবির ভাষণের বিষয়—The Message of The Forest.

লণ্ডন। ৮ জুলাই ১৯২০

'পিয়রসন'। তিনবছর পরে লণ্ডনে কবির সঙ্গে পিয়রসনের সাক্ষাৎ হল। ১৯১৭র ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে পিয়রসন জাপানে থেকে যান। কয়েকমাসের মধ্যে ইংরেজ সরকারের আদেশে গ্রেফতার হয়ে পিকিং থেকে ইংলণ্ডে এলেন। যুদ্ধপর্বে স্বগৃহে অন্তরীণ থেকে যুদ্ধশেষে মুক্তিলাভ

---

১. *The Modern Review*, May 1920, p. 601.

করেন। এবার বিদেশ-ভ্রমণে পিয়রসন কবির সেক্রেটারি হয়ে তাঁর সঙ্গে রইলেন।[১]

লণ্ডন। ২২ জুলাই ১৯২০

'পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষে যে ডায়ার বিতর্ক হল'। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেতে পৌঁছন তখন সেখানকার পার্লামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তদন্ত কমিটির আলোচনা চলছিল। এই নৃশংস আচরণের স্পষ্ট প্রতিবাদ না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

লণ্ডন। ১ অগস্ট ১৯২০

'এই বাড়িটির সবচেয়ে উপরের তলায় রয়েছি'। সেই সময়কার চিঠিতে দেখি বাড়িটি হল 60 Kensington Palace Mansions.

লণ্ডন। ৪ অগস্ট ১৯২০

'আমার মনের অস্থিরতাই এর কারণ বলে আপনি ধরে নেবেন জানি'। নরওয়ে যাওয়া স্থগিত হবার কারণ যে কবির মনের অস্থিরতা নয়, তা চিঠির পরবর্তী (অপ্রকাশিত) অংশেই পাই—

But the real reason is not so fundamental, involving a poet's psychology; it is ludicrously external—not worthy to be treated in an exquisite moment of lyrical rapture. The fact is I was preparing innocently to surrender myself into the hands of a woman spy, who was to escort me through my continental tour and take charge of my correspondence. Just imagine the appalling amount of a white woman's burden—a live poet, with his foolish incapacity for self-help, and his correspondence. I know you will be able to realise what that means. However, the day before we were to start, all of us were instantaneously struck with a sudden suspicion through an indiscreet remark which she chanced to let fall in a moment of self-forgetfulness. It is a story to which Pearson will be able to do justice and I leave it to his hand.

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড

Our delay in starting for Europe has enabled us to receive your letters which give me deep joy mixed with a longing to go back to you. I wish we had been living in an ethereal realm of spiritual life and I could be transmitted in a moment like a wireless message into the middle of your Greek class or into the depth of an armchair at the corner of Dinu's tea-party. But I must not grumble, for our corporeal existence has its own joy because of its obstacles and pain and the devious process of the fulfilment of its hope.

কবির পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর— তাই পরিহাসের স্থর জুড়ে দিচ্ছেন—

And I hope you have not forgotten my mantram which is to give strength to the weary heart and bring peace to the mind buffeted and bruised by the tumultuous life of the west—'Five million Dollars.' But you are unbelievers and you are all laughing at me and saying to yourself that I am a good-for-nothing chap, who not only do not know how to earn but also how to beg. But you will see how my mantram takes shape this time and lays low your scepticism with the missiles of its golden discs. In the meanwhile I ask you to bear the immense burden of empty coffers till we come back.[১]

'ডঃ গেডেস'। Sir Patrick Geddes (1854-1932 ; Scottish Biologist and Sociologist)

ইনি ফ্রান্সে Mont Pellier এ Scottish College নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্যার পেট্রিক ১৯১৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে Sociologyর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনীকার ইনি। ভারত-পরিদর্শনের সময় কবির অনুরোধে শান্তিনিকেতনে আসেন।

তাঁর পুত্র Arthur Geddes শ্রীনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। তিনি Pay De Tagore নামে একখানি বই লিখেছিলেন।[২]

---

১ মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত

২ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড

প্যারিস। ১৩ অগস্ট ১৯২০

'সুধীর রুদ্র'। What I Owe to Christ (p. 278) গ্রন্থে সুধীর রুদ্র প্রসঙ্গে এণ্ড্রুজ লিখেছেন,

'Sushil Rudra's son, Sudhir had come to stay with me before going out for ambulance work in France. He said to me, "Sir, I wonder how you can get on here, at Santiniketan, without the Holy Communion."

"These children here", I answered him, "whom I am teaching, are my Holy Communion now," and I referred him to what Christ had said about the service of the least of his brethren.···When he returned from France, he said to me, "Those words of yours that morning helped me very many times in France. When I was nursing the sick soldiers in the hospital, I would say to myself, 'This is my Holy Communion,' and would remember that Christ had said, 'I was sick and ye visited me.' I found it to be true."

প্যারিসের কাছে। ২০ অগস্ট ১৯২০

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল চিঠিতে আছে—'We are in a delightful country in a delightful place, meeting with people who are so human···M. Kahn, the founder of this institution, whose guest I am, is a great personality. He is a banker of European reputation who is one of the presiding deities of the Economic Meteorology of Europe.···Living the abstemious life of a Tapaswi himself, he is devoting his immense resources for the good of humanity. It is an inspiration for me to know this man.

The great philosopher Bergson came to see me and we had a most delightful talk. He has read my book 'Personality' and what he said about my work was beyond my expectation.[১]

১ *Cf. On the Edges of Time* : **Rathindranath Tagore, pp. 141-44**

আর্দেনিস। ২১ অগস্ট ১৯২০

—'ফ্রান্সের একটি সুরম্য জায়গায় রয়েছি'। দক্ষিণ-ফ্রান্সে Cap Martin-এ কাহ্‌নের রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়িতে তাঁরা কয়েকদিন ছিলেন। স্থানটি ফ্রান্সের দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলস্থিত আল্পসের অংশ। Ardennes ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে পার্বত্য মালভূমি।

এণ্ডরুজের এই পত্রে স্থান ও তারিখ দুই-ই ভুল। মূল পত্রের তারিখ ২৮ অগস্ট ১৯২০, ঠিকানা—Villa Dunure, Cap Martin, Alpes Maritimes.

এ চিঠিতে (২৮ অগস্ট ১৯২০) আরো আছে—

I suppose I told you in my last letter that I met Sylvain Levi in Paris. He is a great scholar, as you know, but his philology has not been able to wither his soul··· I realise when I meet these great teachers that only through the medium of loving personality, can truth be communicated to men. This principle of education we must realise in Santiniketan. We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men.[১]

'কাপড়-ভর্তি তোরঙ্গ হারিয়ে'। সে সময়ে মীরাদেবীকে লেখেন— 'আমরা দক্ষিণ-ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারি সুন্দর একটা জায়গায় এসেছি।···কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে'।[২]

ড্রুইড। প্রাচীন কেল্টিক পুরোহিত। এঁরা বৃক্ষাদির পূজা ও নক্ষত্রলোকের গতিপ্রকৃতি অনুশীলন করতেন।

প্যারিস। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০

'অসহযোগ'। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে যে বিরাট গণ-আন্দোলন দেখা দেয়, তাই অসহযোগ-আন্দোলন নামে ইতিহাসে

---

১ *Letters From Abroad*, pp. 13-14

২ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৩৭

পরিচিত। এর মূল উদ্দেশ্য— ভারতশাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করা। শান্তিনিকেতনে এর প্রতিক্রিয়ার খবর কবি বিদেশে থেকেই পাচ্ছেন।[১]

প্যারিস। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০

'Rheims ও ফ্রান্সের আরো কয়েকটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ'। Kahn কবিকে নিয়ে মোটরযোগে ফ্রান্সের উত্তরে কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়ে আনলেন। রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে এ বিষয়ে আরো লিখছেন—

It was a most saddening sight. Some of the terrible damages deliberately done, not for any necessities of war but to cripple France for ever, were so savage that their memory can never be effaced.[২]

এ বিষয়ে মীরাদেবীকে লিখছেন— 'পরশুদিন আমরা এখানকার যুদ্ধে উচ্ছিন্ন জায়গা দেখতে গিয়েছিলুম। কতদূর পর্যন্ত একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। গ্রাম শহরের চিহ্ন নেই— জমিও ক্ষতবিক্ষত। কতদিনে যে এই সমস্ত জায়গা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে তা বলতে পারি নে।'[৩]

প্যারিস। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০

'স্বদেশী আন্দোলন'। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনে বাঙালীর প্রাণে যে প্রবল দেশপ্রেমের সঞ্চার হয় তা গঠনমূলক কর্মে সংহত না হয়ে আবেগ উত্তেজনায় নিষ্ফল হয়। প্রকৃত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' সম্বন্ধে সজাগ করার জন্য কবির লেখনী তখন তৎপর হয়।

"দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশীভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে

---

১ তু. কালান্তর (শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান), রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড

২ *Letters From Abroad*, p. 18.

৩ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৩৬

বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।[১]

২৫ সেপ্টেম্বর Holland থেকে কবি এণ্ডরুজকে যে পত্র লেখেন, তার অংশ উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে সেদেশে তিনি কিরূপ সমাদর পেয়েছিলেন।

We are in Holland and Pearson has joined us. Yesterday I began my course of lectures. The subject was the village mystics of Bengal. The hall was packed full. People waited for three hours at the door to find admission. I cannot say if my English was fully followed by the audience, but I have been told that the impression was deep in their mind. It took me nearly an hour and a half but the audience sat through in perfect silence.···And I felt that I came near to their heart. Tonight the subject of my lecture will be The meeting of the East and the West. This contains my message and this will be my principal lecture in America.[২]

এণ্টওয়ার্প। ৩ অক্টোবর ১৯২০

ডক্টর জে. ভ্যানদের লিউ নামে একজন ওলন্দাজ লেখক সমসাময়িক পত্রে লেখেন, শ্রোতাদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন না যাঁরা কবির সাহিত্য পড়েন নি। ইংরেজি বা ডাচ ভাষায় তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ সহস্র সহস্র লোক পড়েছেন।[৩]

'ব্রাসেলস'। Palace of Justice গৃহে বিরাট জনতার সম্মুখে কবি বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল 'পূর্ব-পশ্চিমের মিলন'। মুগ্ধ এক শ্রোতা বলেন, 'In a touching comparison this Christ of India traced the course of the two civilisations— The East and the West.[৪]

১২ অক্টোবর ১৯২০ প্যারিস থেকে Andrewsকে লেখেন—

I see more clearly everyday what is asked of my Santiniketan. The West and the East are to meet in the

১ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত (১ অগ্রহায়ণ ১৩১২) পত্রের অংশ। শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৫৬, পৃ. ১১

২ মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত

৩ *The Modern Review*, March 1921

৪ *The Modern Review*, January 1921, pp. 22-24.

coming age, and there must be seats made for such meeting. Let Santiniketan send her call through me for this union of spirits.

I feel that the response will come. If all my friends of the Ashram were with me they could have no doubt about this. They would have felt that it would give greater glory to India if she could bring men from all parts of the world to realise that true patriotism is for the spiritual kingdom, rather than for any crumb of favour thrown to her from the table of her political masters.

This was the reason which made me change my mind and decide to go to the Americans. For they must listen to the appeal of the East.[১]

ষষ্ঠ পর্বের ভূমিকা

'পশ্চিমদেশে যাবার আগে ভারতভ্রমণের সময়ে যা বলেছেন'। সেই প্রসঙ্গে Centre of Indian Culture— chapter VI (p. 99) Adyar-এ National University-র Chancellor-রূপে ভাষণ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পর্বের চিঠি

নিউ ইয়র্ক। ৪ নবেম্বর ১৯২০

'রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে শান্তিনিকেতনকে দূরে সরিয়ে রাখুন'।

এ চিঠির উত্তরে ১৯২০ সালের ১৫ নবেম্বর এণ্ডরুজ লিখছেন— As ever happens, you have found out what was wrong in me and have set it right. I have been too carried away by the exciting atmosphere of the times in which we live and it had obscured the spiritual vision…

---

১ *Letters From Abroad*, pp. 27-28.

I know full well the justice of the rebuke from you which I needed, and I have taken it to heart. May God grant that the Ashram itself may never suffer from these impulses of mine.[১]

নিউ ইয়র্ক। ২৫ নবেম্বর ১৯২০

'কোয়েকার সম্প্রদায়'। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডের জর্জ ফক্স খ্রীস্টানদের এক সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়কে Quaker বা Society of Friends বলা হয়। এঁরা 'অন্তরের আলো'র সাধনা করেন এবং যাজকবৃত্তিতে বিশ্বাস করেন না। বাইবেল এঁদের ধর্মগ্রন্থ। এঁদের উপাসনায় বাহ্য ক্রিয়াকর্মের কোনো আড়ম্বর নেই। বেশির ভাগ সময় এঁরা নীরবে উপাসনা করেন।

'আপনি নিজেকে সীমিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন'। উল্লিখিত ৪ নবেম্বর ১৯২০ সালের চিঠি দ্রষ্টব্য।

নিউ ইয়র্ক। ৩০ নবেম্বর ১৯২০

মূল চিঠির আরম্ভের অংশ— Rathi and Bauma have come at last, I am greatly relieved. For the ideas that float in my mind's sky in a vaporous condition are attracted and precipitated into showers by the concrete thought power of Rathi. It is a great responsibility we are taking— the carrying out of this idea of an International University where students from East and West are to meet and work together. There are occasions when it terrifies me— but then the assurance comes to my mind that it is not we, the individuals, who are to bear the responsibility but it belongs to the age itself, and it will come to its fulfilment, not because we are strong and worthy, but because it is true.

'Gitanjali-র সেই কবিতাটির'।

'I thought that I should ask of thee'.[২]

---

১ *Charles Freer Andrews*, p. 160.

২ *Gitanjali*, p. 52.

ভেবেছিলেম চেয়ে নেব
চাইনি সাহস করে।[১]

নিউ ইয়র্ক। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২০

'সুজাতা'। পুণ্যবতী বৌদ্ধ রমণী। কথিত আছে তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেবকে বনদেবতা মনে করে পরমান্নের ভোগ খাইয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন।

'কবি মরিস'। উইলিয়াম মরিস, ভিক্টোরীয় যুগের প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক।

'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌। ৭. ২৩. ১

'বোষ্টমী'। 'বোষ্টমী' গল্পটি প্রথম সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। সর্বক্ষেপি নামে এক বোষ্টমী শিলাইদহে কবিকে দেখতে আসতেন। তাঁর ইতিবৃত্তান্ত গ্রামের কেউ জানত না। এই বোষ্টমীর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা কবি তাঁর কয়েকটি রচনা ও পত্রের মধ্যে বলেছেন। কবিকে তিনি পরম ভক্তিভরে 'গৌর' বলতেন।[২]

'আমি লজ্জায় থেমে যাই'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকবছর আগে একবার আমেরিকা থেকে এ কথাই লিখেছিলেন (ফাল্গুন ১৩১৯)—

"মুশকিল এই যে দশজনের কাছে প্রচার করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এদেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আর একটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম, তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আমি আমার 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো শুধু বোধ করি মালা হাতে করিয়াই ফিরিব যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া আছেন।"[৩]

---

১ দান, খেয়া।

২ কবিতীর্থের পাঁচালী, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

৩ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ. ৫৮-৫৯

১৯২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর এণ্ডরুজকে লেখা আর একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল—

Your letters are like weekly wages to me, which I rightly earn by what I am doing here for your sake. But you must know that the idea which has drawn us round Santiniketan is not a static one. It is growing and we must keep up with it. When I left you to start for Europe, I was labouring under the delusion that my mission was to build an Indian University in which Indian cultures could be represented in all their variety. But when I came to Continental Europe and fully realised that I had been accepted by the western people, as one of themselves, I realised that my mission was the mission of the present age. It was to make the meeting of the East and West fruitful in truth. I felt that the call of Santiniketan was the invitation of India to the rest of the World. A picture needs its background for its meaning. The idea is great I accept it. I fully believe in it, it is leading me on in an unknown path.[১]

নিউ ইয়র্ক। ২০ ডিসেম্বর ১৯২০

'মধ্যযুগীয় সন্ত'। 'মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে।...সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন দাদূ।...সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব।...এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়।...এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে

১ *Letters From Abroad*, pp. 88-89.

রামমোহন রায়'।[১]

নিউ ইয়র্ক। ২২ ডিসেম্বর ১৯২০

'সাতই পৌষ'। মহর্ষির জীবনের একটি সাতই পৌষ সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। তার পর তাঁর দীর্ঘজীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটিত করে দেখি তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে— যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে। সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ।[২]

'ওঁ পিতানোঽসি মন্ত্র'। ওঁ পিতা নোঽসি

পিতা নো বোধি

নমস্তেঽস্তু

মা মা হিংসীঃ॥ শুক্লযজুর্বেদ, ৩৭, ২০

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব॥ শুক্লযজুর্বেদ, ৩০,৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ

নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ শুক্লযজুর্বেদ, ১৬,৪১

'অসতো মা সদ্‌গময়'। অসতো মা সদ্‌গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥ বৃহারণ্যক উপনিষদ ১.৩.২৮

নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা ৪ জানুয়ারি ১৯২১এর চিঠির কিয়দংশ—

When we are in India we dream only of the advantages that money can confer upon us; but when we are in this country we are warned against the danger which there is in money. It has become patent to me that money can more

১ ভারতপথিক রামমোহন রায়, চারিত্রপূজা

২ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড

easily mar than make. It requires a great power of renunciation to keep it living and fluid ; to give our works freedom from its constant gravitational pull downwards. The luminously clear vision of Santiniketan owes its transparency to the holy spirit of poverty which reigns there. Money may remove many of the wants it suffers from, but also may remove its shrine of the Shantam, Sivam, Advaitam, transforming it into an office presided over by an efficient accountant. And then where may the born vagabonds like myself and yourself find their joy ?[১]

নিউ ইয়র্ক। ১৪ জানুয়ারি ১৯২১

'নারকেল গাছ আর গয়লাদের ছোট্ট কুঁড়ে-ঘেরা পুকুর'। 'দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম— চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী, তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর।'[২]

নিউ ইয়র্ক। ২৩ জানুয়ারি ১৯২১

'মেফিসটোফিলিস'—তিনটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এই নামের অর্থ 'অন্ধকারের জীব'। মধ্যযুগের শেষভাগে 'ফাউস্ট' রূপকথার সঙ্গে প্রথম জড়িত হয় এই দুষ্টাত্মার নাম। পরে জগৎবিখ্যাত জার্মান-কবি গ্যয়টে তাঁর 'ফাউস্ট' নাটকে এই চরিত্রটিকে একটি প্রধান ভূমিকা দেন।

২৫ জানুয়ারি ১৯২১ বস্টন থেকে এণ্ড্রুজকে লিখছেন—

···Coming to Boston has been a great relief to me, I felt in New york like living in the planet Saturn, which has its crowd of innumerable satellites, but revolves some billions of

১ *Letters From Abroad,* pp. 51-52.

২ জীবনস্মৃতি

miles away from the central source of light. I am home-sick for my beautiful earth, simple and tender, bathed in light and dressed in green.

···I am suffering from the great discomfort of having my feet on the decks of two different boats— as the Bengali proverb has it. The organiser in me is planning to raise funds. I hate with all my heart this wretched organiser— this disciple of the West. I have my profoundest faith in the Sannyasi in me, which is urging me constantly to leave these shores. Yet the organiser in me is claiming the best sacrifice of my life and getting it.

···Our Santiniketan has never followed any conscious plan of ours, but has followed its own inner life-process. This freedom of vital function is far more valuable than external resources. Truth never condescends to tempt us with allurements, she dwells silent in her majesty of sublime simplicity— it is untruth which tries to decoy us with extravagance of materials. I earnestly wish we had faith and power in us to create a Tapovana, rather than to build up a University. But unfortunately money, though scarce, is available, but where is tapasya ?[১]

নিউ ইয়র্ক। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

মূল চিঠিতে এর তারিখ রয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি। পত্রের অপ্রকাশিত অংশটি উদ্ধৃত হল—

I met some of my countrymen last night who are hatching revolution. There is something in their presence which hurts me and makes me realise more strongly than ever before that I am not for this. I seem to live in a different planet from theirs where the law of attraction is also different in its degree and character. Of one thing I feel sure that they do

১ *Letters From Abroad*, pp. 59-60.

not know what India truly is— they try to find their consolation by deluding themselves into thinking that India is exactly like the western countries.

'ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস তুলে দেবার অনুমতি'। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরা মনে করলেন— এভাবে ছাত্রদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পাঠানো উচিত নয়। কারণ পরীক্ষার পূর্বে এক বৎসর তারা কোনো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে নি— এ মর্মে তাদের স্বাক্ষর করতে হত।

১৯২০ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে এণ্ডরুজ বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

My idea is that we should not aim at taking more than about a hundred students in all. These would be as it were the background, and then there would be our teachers who themselves were research students and learners and we should be one family together. The idea of 'All souls' Oxford, has always deeply interested me.

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার ছাত্ররা ধর্মঘট করল। সে বছর ১৫ জানুয়ারি এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন—

After what has happened in Calcutta all are saying, "We must not for very shame have the Matriculation now !" Sastri mahasay feels it a disgrace that we should be held back by timid fears of consequences. I have had the greatest difficulty in advising patience.[১]

আবার ৩১ জানুয়ারি লিখছেন—

Everything has been settled amicably and unanimously at last, and we have agreed completely to abandon the Matriculation immediately and work out our own curriculum. It is not a day too soon. Now the highest class in the school

১ *Charles Freer Andrews*, p. 161.

will be called the Visva-Bharati class and it will lead on direct to Visva-Bharati.[১]

'নারী'। সাঙ্গ হয়েছে রণ (উৎসর্গ)। এ কবিতার একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ Poems-এর second edition-এ পাই, তার আরম্ভ— The battle is over। আলোচ্য অনুবাদটি মুদ্রিত হয় ১৯৩৫ সালের মে মাসের Modern Review পত্রিকায়। সেই বছরের ২ এপ্রিল ইস্তাম্বুলের International Women's Congress-এর সাহায্যার্থে লণ্ডনে ভারতীয়রা যে অনুষ্ঠান করেন তাতে Miss McCarthy এটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেন।[২]

নিউ ইয়র্ক। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

'ব্রবডিঙন্যাগ'। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক Jonathan Swift-এর ব্যঙ্গাত্মক রূপক-উপন্যাস Gulliver's Travels-এর নায়ক গালিভার তাঁর ভ্রমণের এক পর্যায়ে এমন একটি দেশে পৌঁছে গেলেন— যেখানকার মানুষেরা বিশালাকার অতিমানবের মতো। তাদের কাছে গালিভারকে বামনের মতো দেখাত।

'And I shall have some peace there'। আইরিশ কবি William Butler Yeats রচিত জনপ্রিয় কবিতা Lake Isle of Innisfree থেকে উদ্ধৃত। বস্তুজগতের জনারণ্যের কোলাহল থেকে বহু দূরে রূপকথার দ্বীপে কবিমন শান্ত এক স্বপ্নছায়াময় জগৎ সৃষ্টি করতে চায়।

য়েট্‌স্-এর কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে। ইনি আয়র্ল্যাণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।[৩]

'দিনুর ছোট্ট ঘরখানি'। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে বেণুকুঞ্জে বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ আপন অফুরান সংগীতসৃষ্টি তাঁর 'সকল নাটের কাণ্ডারী, সকল

---

১ *Charles Freer Andrews*, p. 162.

২ *The Modern Review*, 1935, p. 627.

৩ কবি য়েট্‌স, পথের সঞ্চয়।

গানের ভাণ্ডারী' দিনুর কানে তুলে দিয়ে নিজে পরম নিশ্চিন্তে ভুলে যেতেন।

সপ্তম পর্বের চিঠি

নিউ ইয়র্ক। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

মূল চিঠিতে আছে ২৯ জানুয়ারি।[১]

হিউসটন, টেক্সাস। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

মূল চিঠিতে আছে ১৩ ফেব্রুয়ারি। এ পত্রের শেষার্ধে পাই—

…The people here have had the leisure and opportunity of storing this sunshine in the cellar of their hearts— they are human and hospitable and it will be easy for me to establish connection between them and our Santiniketan. However, time for our departure from this country is near. We will be sailing for Spain on the 11th of March and my drooping heart will be revived by the feeling of the nearness of our Ashram.[২]

'উত্তরায়ণ'। কবির শান্তিনিকেতনস্থ গৃহ ; বর্তমানে উদয়ন নামে পরিচিত।

শিকাগো। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

চিঠিখানি ২৩ ফেব্রুয়ারি লেখা হয়— অপ্রকাশিত প্রথমার্ধ মূল থেকে উদ্ধৃত।

…So our career in Europe will begin from the 1st of April— the All Fool's Day. It is appropriate. I hope, all

১ মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বর্জন নীতি প্রসঙ্গে শ্রীসুধাকান্ত রায়-চৌধুরীর 'আমার সম্পত্তি' নামক পত্র প্রবাসী-সম্পাদককে লিখিত। প্রবাসী, পৌষ ১৩২৭

২ মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত

the great fools of the world will acknowledge me as one of their confederates. I can claim my seat among them, for I have played a truant all my life and never have had the prudence to consult my account books, I have squandered all that has been given to me and pursued that which was of no use.

শিকাগো। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

এ পত্রেরও প্রথমাংশ মূল থেকে উদ্‌ধৃত হল—

I feel frightened at the Fiji-tive[১] mood that seems to have come over you. But my mouth is closed, for I have been playing the truant the last few months as I have been doing the best part of my life. But what fatality is this which pursues me, that when I am ready to come back to take my part in the last scene of a happy comedy you ring down the curtain and disappear. It seems that when I land in India, Pearson will remain on this side of Atlantic and you on the other side of the Pacific, and the wind from the East and the wind from the West will both bring to my heart the wail of separation. I think I had some kind of premonition in my mind and was trying to secure you for myself for the full festival of my home-coming, by inviting you to join us in our tour. But we all have been entangled in the big enterprise of doing good to the world which unfortunately has such a large area that in its field of duty, friends need the most powerful telescope to be distantly visible to one another.[২]

'যবে কাজ করি প্রভু দেয় মোরে মান'[৩]

'God honours me when I do good
But God loves me when I sing'[৪]

---

১ তখন এণ্ডরুজের ফিজি যাবার কথা চলছে।

২ *Letters From Abroad*, pp. 69-70.

৩ লেখন।

৪ *Fireflies*।

শিকাগো। ২ মার্চ ১৯২১

'ছাত্রদের সম্বন্ধে অতি সুসংবাদ'। পরিশিষ্ট ২-এ এণ্ডরুজের লেখা ৩১ জানুয়ারি ১৯২১ এর চিঠি দ্রষ্টব্য।

১ মার্চ ১৯২১ পিয়রসন শিকাগো থেকে এ বিষয়ে এণ্ডরুজকে লিখছেন— Your letter to me telling me of the way the students of Calcutta acted in regard to the Law Examination has filled me with an unutterable pride in those Bengali students. Gurudev too is so proud of these happenings and his eyes shone as he spoke of them.[১]

আবার ৪ মার্চ তারিখে লেখা— So many times during the past years when I have thought of India and specially of Bengal I have seen a vision of the streets of Calcutta filled by these students with the light of a new Dawn on their faces, and it has been such an inspiration to me to know that the Dawn has already come, and although I am far away I am really nearer than I perhaps could be if I were in the middle of all the excitement.[২]

'সন্ধি করব নারায়ণের সঙ্গে'।

মূল চিঠিতে রয়েছে—The destiny of India has chosen for its ally নারায়ণ and not the নারায়ণী সেনা, the power of the soul and not that of muscle, and she is to raise the history of men from the muddy level of physical conflict to the higher moral altitude.

শিকাগো। ৫ মার্চ ১৯২১

'জগৎ পারাবারের তীরে'। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার কবিতা।

'ছন্দ তৈরির খেলায় মেতেছি'। এডওয়ার্ড টমসন প্রণীত Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist গ্রন্থের ২৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় ইংরেজি ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পূরণ অংশে ১৯২১ সালে দিনেন্দ্রনাথকে লেখা একটি পোস্টকার্ডের ফোটো রয়েছে। তাতে

১-২ মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত।

একটি কবিতার স্তবক ইংরেজি ছন্দে অনুবাদ করে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করছেন, সেটি কোন্ ছন্দ ?

এ প্রসঙ্গে এণ্ডরুজকে লেখা পিয়রসনের মূল চিঠি থেকে দু' একটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে—

১ মার্চ। ১৯২১

He (Gurudev) has begun to write English poems in metre and is so delighted with the work. He will be sending you some of these poems soon I expect, and I know how delighted you too will be. I am sure that this is the beginning of a new period of production on his part and we shall have a wonderful volume of metrical verse from him.

৪ মার্চ। ১৯২১

I have had such a happy time with Gurudev trying to get him to recall his songs and translate them into a metrical form suitable for singing in English to the same tune as in Bengali. I enclose the translation of the one about the caged bird and the free bird, and I have learnt the music which is charming in the English as it is in the Bengali. I have just been asking him to teach me again the south-breeze song from 'Phalguni' and at once he began to try to make a metrical version of it in English for me to sing.

'যখন আবদার করে বলি,...তাঁর বিচিত্র খেলার নৌকোয় নানাছন্দে গড়া আমারও দু' একটা খেলনা যেন তিনি তুলে নেন— তখন তাঁর মুখে স্মিতহাস্যের আভাস দেখতে পাই।'

তু. জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,

তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।[১]

'বিচিত্রাবাড়ি'। জোড়াসাঁকোয় কবির গৃহ।

'স্বদেশী ভাণ্ডার'। The Swadeshi Bhandar Limited[২]

'বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।' [৩]

'জ্যাক হতে পারি'। Jack the Giant-killer। ইংরেজি শিশুসাহিত্যে রূপকথার একটি বীর।

১৯২১ সালের ৫ মার্চ তারিখের পত্রটির অপ্রকাশিত শেষাংশ :

...While I have been considering the non-co-operation idea, one thought has come to me over and over again which I must tell you. Borodada and myself are Zemindars, which means Collectors of revenue under British Government. Until the time comes when we give up paying revenue and allow our lands to be sold we have not the right to ask students or anybody else to make any sacrifice which may be all that they have. My father was about to give up all his property for the sake of truth and honesty. And likewise we may come to that point when we may have to give up our means of livelihood. If we do not feel that that point has been reached by us then at least we should at once make ample provision out of our own competency for others who are ready to risk their all. When I put to myself this problem the answer which I find is that by temperament and training, all the good I am now capable of doing presupposes certain amount of wealth. If I am to

১ খেলা, পূরবী

২ Organised in September, 1896. Office : Harrison Road

৩ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃ. ১১

begin to earn my living, possibly I shall be able to support myself but nothing better than that, which will mean not merely sacrificing my money but my mind. I know that my God may claim even that, and by the very claiming repay me. Utter privation and death may have to be my ultimate sacrifice for the sake of some ideals which represent immortality. But so long as I do not feel the call or respond to it myself, how can I urge others to follow the path which may prove to them to be the path of utter renunciation ?[১]

ঠিক এভাবেই প্রমথবাবুকে লিখেছেন ১৮ কার্তিক ১৩২৮—...যাঁরা বাংলা দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্য লোককে ত্যাগস্বীকার করতে বলতেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড়দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলেম। বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গবর্মেণ্টের বড়ো কর্মচারী আর কে আছে ?[২]

নিউ ইয়র্ক। ১৩ মার্চ ১৯২১

এ পত্রের পুনশ্চ অংশটি অপ্রকাশিত ছিল। মূল পত্র থেকে উদ্‌ধৃত হল।

P. S. My last letter to you and this present letter I have had copied in type-script, for I feel that in these I have been able to express my attitude of mind towards the present situation in India and therefore they may deserve serious consideration. As the time is drawing near for my return to India, I must let you know definitely that my India is true to me if it is true to all the world. My India is not a relic of a dead age that has to be shut up in a casket and buried in a *stupa*. It is a living idea that must find its freedom of circulation in the life of all countries of the world. No raising of walls and shutting of gates for my

১ মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত

২ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২৭২

India. It may happen that the children of ideal India some day will grow in greater number outside its geographical limits than inside them.

ইউরোপ যাবার পথে S. S. Rhyndam জাহাজে লেখা পত্রগুচ্ছ :

পত্র ১। 'যথাযোগ্য আয়োজন করে বর্ষার প্রথম দিনটির অভিষেক করি'— জগদানন্দ রায়কে কবি লিখেছেন ১০ আশ্বিন ১৩১৯—

'আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড়ো জিনিস লাভ করেছে, সেটা ক্লাসের জিনিস নয়— সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ— প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা হবে না, কিন্তু জীবনকে সার্থক করবে। আমরা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্যি খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই— জগৎকে তত সহজে পাই নে— আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি। এই অসাড়তার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন যাতে মূক জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধ সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ করে এইটে আমি একান্ত কামনা করি। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব।

পত্র ৪—মূল পত্রে তারিখ রয়েছে ২৩ মার্চ ১৯২১।

'প্লেটোর রিপাব্লিক'। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো কথিত Dialogue গুলির মধ্যে Republicই সর্বজনবিদিত। তিনি এমন একটি লোকতন্ত্রের কল্পনা করেছেন যেখান থেকে কবিরা নির্বাসিত হবেন। পুস্তকের দশম অধ্যায়ে এ বিষয়টি বর্ণিত আছে।

পত্র ৫— মূল পত্রের তারিখ ২৮ মার্চ ১৯২১।

'আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব পরিকল্পনা আমার চিন্তাধারার উত্তরাধিকার বহন করবে। সেও আওরঙজেবের মতো আমাকে বন্দী করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার উপর প্রভুত্ব করবে।'

তু. সম্রাট-কবি শাজাহানের স্বপ্ন ছিল, তাঁর অন্তরের বিরহবেদনাকে চিরন্তন করে রাখবেন। তাঁর সে স্বপ্ন রূপ ধরে প্রকাশ পেল তাজমহলের 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।' রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও এক স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল— 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'

কবিসম্রাটের এ স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বভারতীতে।[১]

শাজাহান বৃদ্ধ হলে পুত্র আওরঙজেব সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের লোভে পিতাকে দুর্গে বন্দী রাখেন। বাকী জীবন বন্দী শাজাহানের করুণ নিঃশ্বাস তাজমহলকে এই বার্তাই শুনিয়েছে—

'ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।'

অষ্টম পর্বের চিঠি

লণ্ডন। ১০ এপ্রিল ১৯২১

'H.W. Nevinson' : Henry Wood Nevinson, (1856-1941) English newspaper correspondent and essayist and writer for 'Nation', 'Manchester Guardian' etc. —had been Andrews' guest in Delhi. Nevinson took Andrews to William Rothenstein's place, where the Irish poet William Yeats was to read some English translation of Tagore's work.[২]

'ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতো লোক থাকা সত্ত্বেও এডমণ্ড বার্কেরা চিরকাল গ্রেটব্রিটেনের মহত্ত্ব প্রমাণ করেছেন'। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭৮৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করে ইংলণ্ডে ফিরে যান। ভারতবর্ষে অন্যায়ভাবে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা হরণ, সম্পত্তি বেদখল, জাল-প্রতারণা, বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড প্রভৃতি নানা অপকীর্তির জন্য তাঁকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দীর্ঘ আট বছর তাঁর বিচার চলে।

বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক ছিলেন পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্য ও মানবস্বাধীনতা ও ন্যায্যদাবীর সমর্থক। কোনো অন্যায় তিনি নীরবে সহ্য করেন নি।

Impeachment of Warren Hastings আর American Taxation and Conciliation with America— তাঁর এ ভাষণগুলি ইংরেজি সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।

---

১ দ্র. *Charles Freer Andrews*, p. 81

২ ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ. ১৫০

লণ্ডন। ১২ এপ্রিল ১৯২১

কবি একদিন লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাসে একটি ভাষণ দেন। তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করি—

The West comes to us, not with the imagination and sympathy that creates and unites, but with a shock of passion— passion for power and wealth. This passion is a mere force, which has in it the principle of separation, of conflict.

Western humanity has received its mission to be the teacher of the world ; that her sciences, through the mastery of laws of nature, is to liberate human souls from the dark dungeon of matter. For this very reason I have realised all the more strongly that the dominant collective idea in the western countries is not creative. It is ready to enslave or kill individuals, to drug a great people with soul-killing poison, darkening their whole future with the black mist of stupefaction, and emasculating entire races of men to the utmost degree of helplessness. It is wholly wanting in spiritual power to blend and harmonise.[১]

উপরি-উদ্ধৃত বক্তৃতাটি শুনে জনৈক ইংরেজ মহিলা এক প্রতিবাদ পত্রে বলেন যে কবি অকারণে ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করেছেন। তার উত্তরে কবিও তাঁকে ১২ এপ্রিল পত্র লেখেন।

ইংরেজ মহিলাকে লিখিত পত্র

'অশুচি জীবিকায় রত'—

So they (Jesus and his disciples) came to Jerusalem and he went to the temple and began driving out those who bought and sold in the temple. He upset the tables of the money-changers and the seats of the dealers in pigeons, and he would not allow anyone to use the temple-court as a thoroughfare for carrying goods. Then he began to teach

১ *East and West* : Creative Unity, pp. 98-99

them and said, "Does not scripture say, 'My house shall be called a house of prayer for all the nations? But you have made it a robber's cave.'"[১]

ওতুর দ্যু মঁদ, প্যারিস। ১৮ এপ্রিল ১৯২১

'ওতুর দ্যু মঁদ'। Kahn এর অতিথিশালা। দ্রঃ ২০ অগস্ট ১৯২০ তারিখের চিঠির অপ্রকাশিত অংশ।

'সংক্ষিপ্ত বিমান-যাত্রার শেষে'। লণ্ডন থেকে কবি এরোপ্লেনে প্যারিসে গেলেন। এই তাঁর প্রথম বিমান-বিহার।'[২]

ওতুর দ্যু মঁদ। ২১ এপ্রিল ১৯২১ (মূল চিঠিতে ২৪ এপ্রিল)

'একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন'।

An International University, An Appeal. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৪

'শিক্ষাবিভাগের স্টীমরোলারের চাপ থেকে এতকাল আমি শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করেছি'। I tried my best to develop in the children of my school the freshness of their feeling for nature, a sensitiveness of soul in their relationship with their human surroundings, with the help of literature, festive ceremonials and also the religious teaching which enjoins us to come to the nearer presence of the world through the soul, thus to gain it more than can be measured— like gaining an instrument, not merely by having it, but by producing music upon it.

I prepared for my children a real home-coming into this world. Among other subjects learnt in the open-air under the shade of trees, they had their music and picture-making; they had their dramatic performances, activities, that were the expression of life....

I believe in an education which takes count of the organic

---

১ *The Bible*, New Testament (Mark 15. 16. 17)

২ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড

wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all its faculties, bodily and mental.[১]

'সেই ঘরছাড়া বৈরাগীর দল'। লণ্ডনের টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় Dr. Fort Newton এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বেরোয়। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (পৃ. ২৭০) সেটি প্রকাশিত হয়। কবি সেখানে League of Nationsকে League of Robbers বলে অভিহিত করেন। আরো বলেন— Men who seek the truth are outcasts for the most part— as Jesus was in his day. They are the keepers of the soul of humanity. There is need of a League of Vagabonds, some kind of fellowship between these men of God.

এই পত্রে সেই কথাই বলেছেন - The Great Brotherhood of Tramps who are recruited by God for His own army.

স্ট্রাসবুর্গ। ২৯ এপ্রিল ১৯২১

স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির উৎসাহে ও ব্যবস্থায় কবি সেখানে The Message of The Forest প্রবন্ধটি পাঠ করেন।[২]

'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি'। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়' গানের একটি পংক্তি।

সাহিত্য -অকাদেমি প্রকাশিত A Centenary Volume, Rabindranath Tagore পুস্তকের A Chronicle of Eighty Years (p. 478) প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

On 30th April reaches Geneva and while there speaks on education at the Rousseau Institute. On the occasion of his 61st birthday a committee is formed in Germany consisting of such eminent Germans as Gerhart Hauptmann, Hermann Jacobi, Count Keyserling, Rudolf Eucken and Thomas Mann and others, who present to the Visva-Bharati Library a magnificent collection of the classics of German Literature.

---

১ *A Poet's School*, p 9 : *Visva-Bharati Bulletin* No. 9, July 1946

২ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড

জুরিখের কাছে। ১০ মে ১৯২১

'এতে আমি ভারি অভিভূত হয়েছি'। Writing from Basle (May 10) on behalf of India, Tagore sent the following message of thanks and appreciation to Germany.

'I can assure you that my message of gratitude which goes out to my friends in Germany carries in it India's grateful appreciation of this hospitality of heart offered to her in the person of her poet.'[১]

অয়কেন। Rudolf Eucken (1846-1926) Professor of Philosophy at Jena University, exchanged professor at Harvard (1912-13). He published several books on philosophy and religion and was awarded the Nobel Prize for Literature in 1908. He strove for a spiritual life based on an understanding of one's self and a universal appreciation of reality.[২]

হারন্যাক। Adolf Von Harnack, German Protestant Theologian.

'হাউপট্‌ম্যান'। Gerhart Hauptmann (1860-1946). German writer. Awarded Nobel-Prize, for literature in 1912 in a special recognition of the distinction and wide range of his creative work in the realm of dramatic poetry.

'আকাশচারী মিতা রবির মতো আমারও জীবনের শেষ-পরিক্রমা এই পশ্চিম প্রান্তে'। ২৯৭০ গ্রোভলাণ্ড অ্যাভিনিয়্যু শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথ পিয়রসনকে লিখেছেন—(২৪ চৈত্র ১৩১৯)

আগামী সপ্তাহে আমি য়ুরোপে যাত্রা করব।... যাঁকে আমি গীতাঞ্জলি নিবেদন করেছিলুম, তিনি সেই পূজা তাঁর পূর্বদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, আবার সেই পূজা তিনি তাঁর পশ্চিমদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। তিনি এবার তাঁর কবিকে তাঁর পশ্চিম

১ *The Modern Review*, September, 1921 p. 876

২ Biographical Notes, *Rabindranath Tagore in Germany*, Max Muller Bhavan Publication

বাতায়নের নীচে দাঁড়িয়ে গান গাইবার হুকুম করেছেন। তাঁর সূর্য যেমন আলোকের অঞ্জলি নিয়ে পূর্ব সমুদ্রতীরে বন্দনা আরম্ভ করে এবং পশ্চিম সমুদ্র-তীরে বন্দনা সমাপন করে তাঁর কবিকে দিয়ে তেমনি তিনি পূর্বদিকের গান-গুলিকে আজ পশ্চিমদিকে আহরণ করালেন— আমার সংগীতের উদয়াস্ত আজ সমাধা হল।

'মহাত্মা গান্ধী যে রামমোহন রায়ের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের নিন্দা করবেন তার প্রতিবাদ না করে আমি পারি নে'— ১৩ এপ্রিল ১৯২১এর Young India পত্রিকায় গান্ধীজির উক্তি আছে— "Rammohan and Tilak (leave aside my case) were so many pigmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak."

আবার ২৭ এপ্রিল লিখেছেন,—"The effect of Rammohan and Tilak on the masses is not so permanent and far-reaching as that of the others more fortunately born."[১]

হামবুর্গ। ২০ মে ১৯২১

'I am tired of this roving life and I am seeking my lost universe of an easychair watched over by its guardian-angel Sadhucharan. A poet, like myself, can never be a perfect vehicle for a mission. For he has not the motor engine of ambition in his heart to lend him a steady movement onward —he has his flighty sails fitfully puffed and pushed by erratic winds. But somehow, in a haste, a motor has been joined to my boat— it is Rathi's steadiness of purpose.'[২]

On 21st May proceeds to Denmark and lectures at Copenhagen University on May 23. At the end of the lecture he is given an unprecedented ovation by the student community who staged a torch-light procession in front of

১ *The Modern Review*, July 1921, p. 128

২ *Letters From Abroad*, p. 127

his hotel singing national songs at night.[১]

স্টকহলম ২৭ মে ১৯২১

Visits Sweden (24 May) and is received at Stockholm by members of the Swedish Academy. Addresses the Academy as required under the terms of the Nobel Award.[২]

'শূয়র পোড়াবার জন্য বাড়িতে আগুন লাগানো'। মূল পত্রে আছে It is like the fire that the Chinaman in Lamb's Elia lighted for roasting its pig.

দ্র. Charles Lamb : *A Dissertation uponRoast Pig*, প্রবন্ধ

On the successive days of 2 and 3 June lectures at Berlin University, 'Scenes of frenzied hero-worship' marking the meeting,[৩]

বার্লিন। ৪ জুন ১৯২১

'বিচিত্রায় আমরা যে অভিনয় করেছিলুম'। ১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসে জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবনে ডাকঘরের অভিনয় হয়।

'মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অটো'। Dr. Rudolf Otto (1869-1937) professor of theology, one of the founders of Comparative Religious Studies in Germany. His main work 'The Holy' and his essay on 'Mysticism in East and West' as well as his studies of the philosophical systems of Ramanuja and his disciples established important categories of the study of world religions.[৪]

'যখন নাটকটি লিখছিলুম, তখন কোন্ ভাবের প্রেরণা পেয়েছি, তাই এখন মনে পড়ছে'। ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।... চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে।... থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে। সবাই ডাকতে

১-৩ *A Chronicle of Eighty Years*, p. 478

৪ Biographical Notes, Max Muller Bhavan Publication

ডাকতে যাচ্ছে আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে।[১]

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'আবেদন' কবিতাটির একটি পংক্তি। এর অনুবাদ Gardenerএর প্রথম কবিতা।

'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'। Berlin-এ Prussian Academy-তে রবীন্দ্রনাথের The Message of the Forest-এর শেষাংশ ও এই বাংলা গানটির রেকর্ড রাখা হয়।[২]

গানটির অনুবাদ কোনো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। তাই নিম্নে দেওয়া হল—

My vina breaks out in strange disquiet
measure,
My heart to-day is tremulous with the heart-throbs
of the world.
Who is the restless youth that comes, his mantle
fluttering in the breeze ?
The woodland resounds with the murmur of joy
at the dance-lyric of the light,
The anklet-bells of the dancer quiver in the
sky with an unheard tinkle,
To whose cadence the forest-leaves clap their hands ?
The hope for the touch of a nearing foot-step
spreads a whisper in the grass.
And the wind breaks its fetters, distraught
with the perfume of the unknown.

১৯২১ সালের ৪ জুনের চিঠির অপ্রকাশিত অংশ— 'If Pearson were with me, it would have delighted his heart and you could have got all the details. My memory is defective—it is like a porous vessel, its contents ooze out, and somehow honour done to me by others, when repeated by myself,

১ রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃ. ২০৮

২ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড

seems to me like food, which has been in the mouth, it is ugly to take it out for display. My only regret is that those who love me should not have the opportunity to share it—the most delightful part of praise is the delight which it gives to others than the recepient. And therefore when you who love me are away and honour is bestowed upon me in abundance, it seems to me that the wine is poured but the vessel is not there.[১]

Speaks at Munich University on 7 June, and hands over proceeds from sale of admission-tickets 'for the famished children of Munich'

ডার্মস্টাট। ১০ জুন ১৯২১

At the invitation of the Grand Duke of Hesse makes an extended stay at Darmstadt (9-14 June). While here, gives daily talks at the School of Wisdom of Keyserling.

'কাউণ্ট কেইজারলিঙ' । Count Hermann Keyserling (1880-1946) philosopher and essayist. His 'Indian Travel Diary of a Philosopher,' which appeared in 1921 was widely read at that time.

"Attends an open-air festival where more than four thousand people sing in chorus for over an hour in his honour. On 13th June visits Frankfurt and speaks at the University on the Village Mystics of Bengal. Visits a club of industrial labour at Darmstadt on 14th June where his presence and talk so impress them that they hide their beertankards under the tables and hastily put out their pipes. The poet described this as one of his greatest triumphs. He is invited to Austria and leaves on 15th June for Vienna where he delivers two lectures.[২]

---

১ মূল থেকে উদ্ধৃত

২ *A Chronicle of Eighty years,* pp. 478-479

ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে S.S. Morea জাহাজে লেখা ৫ই জুলাই থেকে ধারাবাহিক পত্র—

৫ জুলাই ১৯২১এর চিঠির প্রথমাংশ—

I know I need not write to you for I am travelling towards your own nest in the Venu-Kunja. But the steamer is an ideal place for letter-writing. If I ever have the chance to visit Baghdad or Samarkand, I am sure to go out for shopping simply because shopping there will have a value for its own sake— it will be so delightfully unnecessary.[১]

৯ জুলাই ১৯২১

'সাধনা বক্তৃতামালা'— During the period 10 November to December, delivers a series of discourses on metaphysical topics at Unity Club (Urbana)— later collected in the book Sadhana, realisation of life.[২]

প্রতি সপ্তাহে শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভাষণে যা বলতেন তারই কয়েকটির অনুবাদ নিয়ে 'সাধনা' রচিত হয়।

'ঘটনাচক্রে একদিন গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলুম'। এ প্রসঙ্গে ১৯১৩ সালের ৬ মে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন—'…গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন— কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগি নি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল।[৩]

'পঞ্চাশ বছর বয়সে অকস্মাৎ ইউরোপে যাবার জন্যে আমার মনে অকারণ বাসনা জাগল।' ১৩১৮ সালের ২২ আশ্বিন শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে

---

১ *Letters From Abroad*, p, 188

২ *A Chronicle of Eighty Years*, p. 469

৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২০–২১

লেখা চিঠিখানির কিয়দংশ এ প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করি—

মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই— কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন এই কথা বলচে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর তো সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে— আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।[১]

'আপনার জীবনের গতিপথ এখন যেদিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন তা আমার পথ থেকে অনেক দূরে বেঁকে যাবে'। এদেশে ও বিদেশে অসহায় অবজ্ঞাত ভারতীয়দের প্রতি নির্যাতনের প্রতিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে এণ্ড্রুজ এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রমে একসঙ্গে অধিকদিন বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের শান্তম্‌-এর সঙ্গে জড়িত তাঁর জীবনের মূলসূত্রটি কখনো ছিন্ন হতে দেন নি। বিশ্বভারতীর ক্লাসে নিয়মিত পড়াবার ইচ্ছাও তাঁর মনে থাকত। হঠাৎ কখনো এসে বলতেন, "এবার আমি স্থির হয়ে বসব। কাল থেকে ইতিহাস ক্লাস শুরু হবে।" কবি তাঁকে খুব ভালো করেই জানতেন। তাই হেসে উত্তর দিতেন, "আচ্ছা স্যার চার্লস, সে দেখা যাবে। একটি রেলওয়ে গাইড বরঞ্চ আমার হাতের কাছে রাখি।" স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তিনি একবার লিখেছিলেন, "এণ্ড্রুজ আমাকে ভালোবাসে বলেই ভুল করে ভাবে যে ওর কাজ এইখানেই। এভাবে ওর নিজের প্রতি অবিচার করে। ওর কাজের ক্ষেত্র যে পৃথিবী জোড়া।"[২]

পরম স্নেহভাজন চার্লির প্রতি শ্রদ্ধায় গুরুদেবের অন্তরও পূর্ণ ছিল। তাঁকে আশ্রমবন্ধু বলে সম্মান জানাতেন। এণ্ড্রুজের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভাষণে তিনি বলেছেন— "তাঁর খ্রীষ্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে, ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ।"

Christ's Faithful Apostle— C. F. Andrews একটি ভাষণে কলকাতার ছাত্রদের বলেন—"Independence, complete and perfect

১ চিঠিপত্র ৭, পৃ. ১৬৩

২ তু. *Charles Freer Andrews*, pp 181-188

independence for India is a religious principle with me, because I am a Christian. India cannot be India to you, the India of your dreams and of my dreams also, if she does not give swaraj to her own depressed classes.[১]

এণ্ডরুজই প্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছিলেন। Independence--The Immediate Need— নামে একটি ছোটো প্রবন্ধে তিনি ভারতাত্মার পরাধীনতা-মুক্তির আকুল কামনা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—

It was wonderful that C. F Andrews, a foreigner and one belonging to the dominant race in India, should echo that cry of our inmost being.

গুরুদেবের সঙ্গে এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে এণ্ডরুজের যোগ ছিল আমৃত্যুকাল। অপারেশনের পর নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হলে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী তাঁর জীবনের শেষ দিনকয়েকের কথা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন— 'হঠাৎ আশ্চর্য শক্তি এসেছিল তাঁর মধ্যে। সেই শক্তির শান্ত ক্ষণে তিনি বারে বারে আপনার নাম করেছেন এবং বলেছেন, এই দান তিনি আপনার কাছ থেকে পেয়েছেন ভারতবর্ষে, যা পেয়ে তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল।'[২]

---

১ Speech to Calcutta Students, 19 June 1912, reported in '*To the Students*', p. 46

২ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ১০৩

পিয়রসনকে লেখা চিঠি

পিয়রসন (১৮৮১-১৯২৩)—প্রথমে ধর্মযাজকরূপে এদেশে এসে কলিকাতা লণ্ডন মিশনরী কলেজে উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় যোগ দেন। খ্রীস্টান কলেজে খ্রীস্টান ও অখ্রীস্টানের বৈষম্য তাঁকে পীড়া দিত। তাই কলেজের কাজ ও ধর্মযাজকের পদ তিনি ত্যাগ করেন। বন্ধু এণ্ডরুজের কাছে দিল্লী গিয়ে সেখানে এক ধনী নাগরিকের পুত্র রঘুবীর সিং-এর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৩-তে প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে এলেন, কবি তখন বিদেশে।

শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে তিনি এখানকার কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন।[১]

তার উত্তরে কবি লণ্ডন থেকে পিয়রসনকে বাংলায় লিখছেন (৬ অগস্ট ১৯১৩)—

"যিনি আপনার হৃদয়ে এই শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সম্মতির উপরে আমি কি কথা কহিতে পারি? আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া আপনাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করিলাম।...তাঁহার পশ্চিমতীরের সেবককে ঈশ্বর পূর্বতীরে পাঠাইয়াছেন, পশ্চিমসাগরের পুণ্য তীর্থ জলে আমাদের অভিষেক করিবার ভার আপনি পাইয়াছেন এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।"[২]

১৯১৩-র শেষভাগে এণ্ডরুজের সঙ্গে পিয়রসনও দক্ষিণ আফ্রিকা যান। সেখান থেকে ফিরে পিয়রসন আশ্রমে শিক্ষকতার কাজে স্থায়ীভাবে যোগ দিতে আসেন। সে সময় (৩১ মার্চ ১৯১৪) কবি বোলপুর স্টেশনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

'শান্তিনিকেতন' নামে ইংরেজিতে একখানি বই লিখে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পিয়রসন এখানকার হাসপাতালে দান করেন। তিনি গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রদের

---

১ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

২ রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত মূল চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত

নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেন। সাঁওতালপাড়ায় শিক্ষা ও সেবার আয়োজনে আশ্রমের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন।[১]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তিনি ভালোই বুঝতেন। 'গোরা' উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটো গল্প ইংরেজিতে তর্জমা করেন। 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থটি পিয়রসনকেই উৎসর্গ করা হয় (৭ মে ১৯১৬)।

১৯২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতে ফেরার পথে আকস্মিক ভাবে ট্রেন দুর্ঘটনায় ইতালিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই স্মৃতিতে শান্তিনিকেতন হাসপাতালের নাম হয় পিয়রসন হাসপাতাল এবং শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সাঁওতালপাড়ার নাম হয় পিয়রসন পল্লী। তাঁর মৃত্যুর পর Manchester Guardian পত্রিকার সম্পাদককে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র দেন তাতে লিখেছেন (Nov. 27, 1923)—

His Patriotism was for the world of man. He had accepted Santiniketan Asram for his home, where he felt he could realise his desire to serve the cause of humanity and express his love for India.[২]

কলিকাতা, । ৬ মার্চ ১৯১৮

এ চিঠির রাজনৈতিক পটভূমিকা···

'ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ'। এণ্ডরুজ অস্ট্রেলিয়া ঘুরে ফিজি থেকে ফিরেছেন। কবিকে জানালেন, ওদেশে লোকে তাঁকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। কবিরও মনে হয়, বিদেশে যাওয়া তাঁর একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময়ে বাংলা গভর্ন-মেণ্টের এই অভিযোগ জানা যায় যে সানফ্রান্সিসকোতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত যুবকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট। কবির বিরুদ্ধে গুজব, তিনি ১৯১৬ সালে জাপান হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন জার্মানদের অর্থানুকুল্যে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ধারণা, কবি যুদ্ধের সময় Nationalism

১ শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৩৪

২ Appendix 1—*Letters to a Friend.* p. 189

তু. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ. ১৬৩-১৬৪

এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে পাশ্চাত্য যুবমনকে বিভ্রান্ত করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনকে এক পত্র দিলেন ও তার প্রতিলিপি দিলেন বড়োলাটকে।[১]

এই সব মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনে কবি তখনকার মতো বিদেশযাত্রার সংকল্প ত্যাগ করেন।

শান্তিনিকেতন। ১০ মার্চ ১৯১৮ (মূল চিঠিতে ২ জুলাই ১৯২২)
শান্তিনিকেতন। ৬ অক্টোবর ১৯১৮

'স্কুলের ক্লাস নিচ্ছি'। প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন—(১৯ এপ্রিল ১৯১৭) বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করছি।[২]

প্রমথবাবুকে পরে আবার লেখেন (১৯ জুলাই ১৯১৮)

মনটা ম্লান হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাস্টারি করে থাকি। তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কারও উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্‌বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময় থাকে না, অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়ই চলতে থাকে। এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার মতো না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে।[৩]

'স্কুলপাঠ্য বই লিখছি'। 'অনুবাদ চর্চা' বইখানি সে সময়ে লেখেন। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের তখন পড়াচ্ছেন Ruskin এর Selected Passages আর Matthew Arnold এর Sohrab and Rustum কাব্য। পড়াতে গিয়ে দেখেন ইংরেজি ও বাংলার বাক্যগঠনরীতি সম্পূর্ণ পৃথক। কি ভাবে নির্ভুল

১ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড
২ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২২০
৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২৪৩

করে ভাষান্তর করা যায় দেখার জন্য নানা স্থান থেকে ইংরেজি অংশ সংগ্রহ করে অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন।[১]

'দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ'। বিদ্যালয়ের পূজাবকাশে (১২ অক্টোবর ১৯১৮) কবি মাদ্রাজ যাওয়া স্থির করেন। মাদ্রাজে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় পথে পিঠাপুরমে কয়েকদিন কাটান।

শান্তিনিকেতন। ১১ ডিসেম্বর ১৯১৮

এ পত্রের প্রথম অংশ পাওয়া যায় নি। শেষ অংশ ১৯১৫ সালের ১ অক্টোবর শ্রীনগর কাশ্মীর থেকে লেখা মূল চিঠিতে রয়েছে।

'সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি'। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন জেনে কানাডা থেকে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে ভ্যানকুভারে যাবার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। কবি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলে পাঠান, যতদিন তাঁর স্বদেশীয়দের কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় অপমান ও নির্যাতন ভোগ করতে হবে ততদিন তিনি সেদেশে যাবেন না।

সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাই মনে করেছিলেন হয়তো কবি সিডনী যেতে স্বীকৃত হবেন না।[২]

---

১ শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৫২-১৫৩

২ রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫

২. গুরুদেবকে লেখা এণ্ডরুজের চিঠির অনুবাদ

দিল্লী। ৮ মার্চ ১৯১৩

পূজনীয় গুরুদেব,

আমার আশ্রম-পরিদর্শনের বৃত্তান্তটি সবিস্তারে আপনাকে জানাতে চাই। তাছাড়া এ সময়ে আমার নিজের চিন্তাধারা নিয়েও কিছু বলব। যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার হল সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে কোথায় যে আরম্ভ করি আর কোথায় শেষ করি তা ভেবে পাই না। আজ আমার সারা সকাল ছুটি— তাই এই সকালটি আপনার সঙ্গে কাটাব মনে করছি।

সন্তোষ[১] বড়ো ছেলেদের সবাইকে নিয়ে স্টেশনে আমায় আনতে গিয়েছিল। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠতে আমাদের মোটেই দেরি হল না। আমি তখন পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত, দেরাদুন থেকে আসছি। সেখানে ভাইস্‌রয়[২] আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পর পর তিনটি রাত কেটেছে ট্রেনে। (ভাইসরয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানেই আপনাকে বলে নিই। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে খানিকটা আশ্বস্ত করতে পেরেছি। তিনি বড়োই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তবু ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। আমি যখন তাঁকে বললাম, 'ভারতের চিত্ত আপনার প্রতি বিরূপ নয়,' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে আমি জানি'—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এল। তাঁকে জানালাম, আমি বোলপুর যাচ্ছি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'একবার ভেবে দেখুন, এমন একটি বিদ্যালয় এঁরা নিষিদ্ধ করতে চাইছেন! আমার কানে আসামাত্রই কিন্তু আমি সেটা বন্ধ করেছি।' আশ্রম সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, লেডি হার্ডিঞ্জও তা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। তাঁরা বেশ সহজ আর ভালো লোক মনে হল।)

আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু আশ্রমে পৌঁছেই আমার ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। তখনই সব ছেলেদের কাছে ঘুরে এলাম। যে-ঘরখানায়

১ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

২ লর্ড হার্ডিঞ্জ

আপনি থাকেন— তার বারান্দা, কাছের স্বপ্নঘেরা গাছগুলি আর তারও দূরের দৃশ্য, সবই দেখে নিলাম। সেদিনের সব কথা এখন আর মনে নেই। কেবল মনে আছে সন্ধ্যায় আমরা এক বনে গিয়ে বসি— সেখানে মাঠের পারে সূর্য অস্ত গেল— ক্রমে চাঁদ দেখা দিল। অজিত গীতাঞ্জলির গান গেয়ে শোনাল। তখনই আশ্রম-সংগীতটি প্রথম শুনলাম— বড়ো চমৎকার। ধূলি-সমাচ্ছন্ন কোলাহলময় দিল্লী নগরীর পরে ক্লান্তিকর রেলভ্রমণের শেষে এমন একটি শান্ত পুণ্যময় পরিবেশ পেলাম।

রাতের খাওয়ার পরে খুব ঘুম পাওয়া সত্ত্বেও ঘুমোতে পারি নি। মনের উত্তেজনা এত বেশি ছিল যে প্রায় সারারাতই বারান্দায় চাঁদের অপরূপ মহিমা দেখে আর আকাশভরা স্তব্ধ স্তিমিত তারার দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছি। তখন ইংলণ্ডে আমার মায়ের কথা আর আপনার কথা মনে পড়ছিল। নীচে ঘুমন্ত বিদ্যানিকেতনের দিকে তাকালাম। কতগুলি তরুণ জীবন এখানে এক মহা-জীবনের আশ্রয় পেয়েছে— সেই বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘুমোতে গেলাম, কিছু পরে কিন্তু আবার একবার রাতের আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াব বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

রাত্রির দৃশ্য পাঞ্জাবেও অতি চমৎকার, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। ভোর চারটে কি তার একটু পরে ছেলেরা আশ্রম-পরিক্রমা করে তাদের ভোরের গান গাইল। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় উপভোগ করলাম। তার একটু পরে আপনার বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাই। সহজ সৌহার্দ্যেই আমাদের পরস্পরের পরিচয় শুরু হল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হবার পর সন্তোষ এসে জানাল যে সকালের খাবার সময় হয়ে গেছে। বিকেলে আবার বড়দাদা আমায় দেখতে এলেন। প্রতিদিন এই নিয়মেই আমাদের দেখাশোনা চলে। তাঁর সঙ্গে রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই। তিনি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় অনেক বলতেন। বিশেষ করে মহর্ষির কথাই বেশি হয়। আমি বারবার বলেছি যেন তিনি তাঁর সব স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন— হয়তো তাই তিনি করবেন। উনবিংশ শতকের ইতিহাসে মহর্ষির যে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বড়দাদার তৈরি একটি বাক্স আমায় দিয়েছেন। কিন্তু আমি যখন বললাম যে অঙ্ক আমি ভালো বুঝি না, তখন তাঁর দয়া হল, বাক্স তৈরির ফরমুলাগুলি আর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা

করলেন না। তাঁর মধ্যে একটি শিশুর অন্তর রয়েছে। হাসিখানি এমন প্রাণখোলা— যেন একটি নিষ্পাপ সরল বালকের হাসি। শুনলে মন ভরে ওঠে। আমার এই কটি দিনের সুখস্মৃতির মধ্যে বিশেষ আনন্দক্ষণ মনে হয় যেটুকু তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসেছি অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

সকালে জলখাবারের পর স্কুলের কয়েকটি ইংরেজী ক্লাস নিতে গেলাম। এখানকার ছাত্রদের বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি অবাক হই, পাঞ্জাবী ছেলেদের পড়াবার অভিজ্ঞতা থাকায় পার্থক্যটা টের পেলাম। আশ্রমের স্বাধীন বন্ধনহীন জীবনই অবশ্য এর মূলে রয়েছে, আশ্রমকে যে ওরা কত ভালোবাসে তা এক নজরেই বোঝা যায়। খুব ছোটো ছেলে যারা মোটেই ইংরেজী জানে না, তাদের সঙ্গেও আমার বেশ ভাব হয়েছে। যাক্ সে পরের কথা। বৃহস্পতি-বার ছিল পূর্ণিমা, সতীশচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেদিন ছুটি। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে ফিরে আমরা মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিলাম। উপাসনার শেষে অনেকক্ষণ আমি মন্দিরে বসেছিলাম। চাঁদের আলোয় চতুর্দিক প্লাবিত। অজিত তার জীবনের কাহিনী এই সময় আমায় বলে গেল। ও যে কী ভালো আর আপনার প্রতি কত যে অনুরক্ত তা প্রকাশ পেল। মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন, সে আমার মনে পড়ল। সেদিন সকালে আলফ্রেড প্লেসে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন তাও তখন মনে হয়েছিল।

রাতে উপাসনার পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই গানটি— যেটি গত সপ্তাহের ডাকে আপনাকে পাঠিয়েছি— আমার মনে এল। এত সহজে গানটি এল, সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলা ছাড়া আর কিছুই প্রায় আমাকে করতে হয় নি। তার কোনো অংশ যদি আপনার মনে হয় কাঁচা হাতের— তবে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভালোবাসার উপহার ভেবে সেটিকে গ্রহণ করুন। দুটি তালগাছের ফাঁক দিয়ে রঙিন কুয়াশা-জড়ানো নতুন চাঁদ উঁকি দিচ্ছে— কী যে চমৎকার শোভা সেদিন আমি দেখেছি তার বর্ণনা চলে না। তাড়াতাড়ি সেটিকে রঙ দিয়ে আঁকার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। স্কুলে যে-ছেলেটি ড্রইং শেখায় তার কাছ থেকে খুব সাধারণ একটি কাগজ জোগাড় করে, একটি ছোটো ছেলের রঙের বাক্স নিয়ে সকালবেলা আঁকতে বসে গেলাম। এসব

সামান্য জিনিস দিয়ে আঁকা সত্ত্বেও যখন সেই দৃশ্যের ঠিক ঠিক ব্যঞ্জনাটি আনা গেল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না। তাই সেই মায়াময় রাত্রির স্মৃতির একটি আলেখ্য আমার কাছে ধরা রয়েছে। সে রাতে বিশেষ ঘুম হয় নি— ঘুম হবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। এমন বিস্ময়কর এক মহিমা ছিল সে রাত্রির— সে অবর্ণনীয়। তখন আপনার পিতৃদেবের এবং আপনার সাধনসত্তার চেতনা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। আপনার জীবন্ত উপস্থিতি আমি প্রতিদিনই আশ্রমে অনুভব করেছি, তবে রাতের নিস্তব্ধতাতেই সান্নিধ্য বেশি পাই।

শিক্ষকদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় হল। তাঁরা সবাই আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলতেন, আমি তাতে বড়ো আনন্দ পেতাম। জুলাই মাসে যখন আমার ছুটি হবে তখন আবার আশ্রমে এসে এদের সঙ্গে কাটাতে আমার ইচ্ছা করে। আপনি যখন দূরে রয়েছেন তখন একজন বয়স্ক লোক তাঁদের সঙ্গে থাকা দরকার, যিনি তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখতে পারবেন, উচ্চ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবেন। তাঁরা যেই শুনলেন যে আমি আপনার বন্ধু, তখনই বিশ্বাসভরে আমাকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিলেন— তাতেই মনে হচ্ছে, আমি এ পারব। এখানকার জন্য উদ্‌বেগ থেকে আমি আপনাকে মুক্ত রাখতে পারব। সব দিক ভেবে দেখুন, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের কারণেই আপনার কি এখন আরো কিছুদিন ইউরোপ আমেরিকায় থেকে আসা উচিত নয়? আর সেই সময়টা শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থেকে আমি কি আপনার চিন্তার ভার কমাতে পারি না? আমি কলেজে ছুটি নিয়ে আশ্রমে এসে থাকব। সেখানে আমি ইংরেজী পড়াব আর নিজে বাংলা শিখব। আমিই ওখানে সবচেয়ে বয়সে বড়ো, তরুণ বিকাশোন্মুখ ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার হয়ে এদের সঙ্গে থাকব। তাতে করে হয়তো আমি বিদ্যালয়টিকে দৃঢ়সম্বদ্ধ রেখে আপনার আদর্শটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এ আমার জীবনের বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে মনে রেখে আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে যেন চলতে পারি, নতুন কিছুরই প্রবর্তন যেন না করি। আপনি বিদ্যাশ্রমটিকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে রাখাই আমারও ইচ্ছা।

গুরুদেব, এবার আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আপনাকে জানাই। সেগুলি আমার চিন্তাধারায় প্রবেশ করে ধীরে ধীরে আমার সম্পূর্ণ

সত্তাটিকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। ন' বছরেরও কিছু বেশি আগে প্রথম যখন ভারতে আসি তখন আমার প্রাণের একমাত্র কামনা ছিল কিভাবে ভারতের যথার্থ সেবা করা যায় তার চেষ্টা করা। সেবার একমাত্র অর্থ হল প্রেম। আমি কখনো কাউকে ধর্মান্তরিত করতে চাই নি। কারণ সেটা খ্রীস্টবিরুদ্ধ কাজ বলে সর্বদা আমার মনে হয়েছে। মনেপ্রাণে ভারতবাসীদের ভালোবাসতে শুধু চেয়েছি। মিশনারিসঙ্ঘে যুক্ত হয়ে এদেশে আসাটা হয়তো আমার পক্ষে ভুল হয়েছে। বারবার এতে আমার জীবন বিষিয়ে গেছে। তবু কোনো কোনো ব্যাপারে এর কিছু সুযোগও ছিল। তরুণ মিশনরিরা পরামর্শ ও পথের নির্দেশ পাবার জন্য আমার কাছে এসেছে। আগেকার মিশনরিদের তুলনায় এখনকার মিশনরিদের আচরণের যে আশ্চর্য তফাৎ— সেটা আজকের দিনে অবশ্যই লক্ষ করবার বিষয়। তবে এখনো এমন গোঁড়ামি তাদের মধ্যে রয়েছে যা করুণকান্ত যীশুখ্রীস্টের নম্র-উদার মহত্ত্বে কলঙ্ক লেপন করে।

আমার নিজের চিত্তেরও প্রসার হয়েছে। ভারতে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম টের পেলাম যে আমার মধ্যে এমন সব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি রয়েছে যা আমি আগে কখনো বুঝি নি। যে উদারতার দৃষ্টি আমি ক্রমে লাভ করেছি তার প্রতি সত্য হতে এখন আমি চেষ্টা করছি— অতি ধীরে, অত্যন্ত কঠিন প্রয়াসে। আরো গভীরভাবে আত্মসত্য উপলব্ধি করতে হবে। আপনার বন্ধুত্বে আমার দাবী আছে, তাই আপনার সাহায্য আমার চাই। শুধু আপনার সঙ্গে, এমন-কি আশ্রমে— যেখানে আপনার প্রাণ ছড়ানো রয়েছে— সেখানেও যদি থাকতে পাই, তবে তাই হবে আমার প্রকৃত শিক্ষার সহায়। বুঝতেই পারছেন আপনাকে আমার যথার্থ গুরু বলে আমি বরণ করেছি, যত অযোগ্যই হই না কেন তবু আমি আপনারই একজন শিষ্য।

এবার আশ্রমের কথায় ফিরে আসি। রবিবার দিন স্কুলের সকলের সামনে কিছু বলার অনুরোধ এল। বললাম, একটিমাত্র বাংলা কথা আমি জানি, যা সব ভারতীয় ভাষাতেই আছে— সেটি হল প্রেম। অজিত তাদের সব কথা বুঝিয়ে দিল। কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রই আমার বলার কথাটি ধরতে পেরেছিল। আমি খুব সহজ করেই বলেছিলাম। তারপর ক্ষিতিমোহন বাংলায় কয়েকটি কথা বললেন। সবশেষে আশ্রমসংগীত হল। তাতে সব

বালকদের সঙ্গে সমান উৎসাহে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় শিক্ষকদেরও কিছু বলতে হল। নিজের জীবনের কথাই তাঁদের শুনিয়েছি, তাঁদের সাগ্রহ অনুরাগে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কোনো বাধা রইল না।

পরের রাতে বড়ো ছেলেদের কাছে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে কথা হয়— তাদের বলেছি কলকাতায় গিয়ে এই আশ্রমের অসামান্য আদর্শটি বজায় রাখার জন্য যেন তারা চেষ্টা করে। বিকেলে সারা স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে আমরা বেড়াতে বেরিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে বসলাম। সেখানে আমাদের দেশের একটি পরীর গল্প ওদের শোনালাম। গান শেষ হলে আবার প্রেম সম্বন্ধে দু'চার কথা আরও ব্যাখ্যা করলাম। তার বিভিন্ন রশ্মিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভারের সঙ্গে তুলনা করি— তার কোনো রশ্মি দীনতার, কোনোটি বা দৃঢ়তার, আবার কোনোটি বা আত্মোৎসর্গের। তারা এমন মুগ্ধ হয়ে শুনল। সেখানেই রোজকার সন্ধ্যা-উপাসনার মন্ত্রটি আবৃত্তি করে সবশেষে আশ্রমের পথে প্রত্যাবর্তন। অন্ধকারে পথ হারিয়ে খানিকটা মজাও হল। প্রায় ন'টায় আশ্রমে এসে পৌছনো গেল। ছেলেদের আত্মনির্ভর সাহস ও উচ্ছল-আনন্দের তরঙ্গে আমি অভিভূত।

বুধবার ভোরে উঠে প্রথমেই মন্দিরে উপাসনায় যাই। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা সমবেত হয়ে গানে আমায় বিদায়-আশীর্বাণী জানালেন। সংস্কৃতে মন্ত্রপাঠ হল, আমার কপালে চন্দন লেপন করে সাদা ফুলের সুন্দর মালা পরিয়ে দিল।

একটি অসুস্থ ছেলেকে আমরা কলকাতায় নিয়ে এলাম। মেয়ো হাসপাতালে গিয়ে আমি তাকে দেখে এসেছি। সেখানে ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল। আপনার সব ঘনিষ্ঠ, প্রিয় আপনজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনার দুই দাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই ভাই গগনেন্দ্র ও সমরেন্দ্র এবং আপনার দুই কন্যাজামাতার সঙ্গে দেখা হওয়াতে বড়ো আনন্দ পেয়েছি। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবারই আলাপ হয়েছে। প্রত্যেকবারই তাঁর গলার স্বর ও হাসিতে আপনাকে আমার মনে পড়েছে। শান্তিনিকেতনে আপনার বড়দাদাকে দেখেও এরকমই লেগেছিল। বারবার আপনার কথা মনে পড়ে আমার গভীর আনন্দ বোধ হত।

আমার সকাল বেলাকার অবসরের সময় এখানেই শেষ হল; এবার কাজের

চাপে চিঠি শেষ করতে হবে। আপনার শরীর কেমন আছে আর আপনি এখন কী কাজে হাত দিয়েছেন জানবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি। আশ্রমে আপনার চিঠি এলে আমাকে পড়ে শোনানো হত, কিন্তু তাতে আপনার শরীর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় থাকত না।

বড়ো করে এ চিঠির উত্তর দেবার কিছু প্রয়োজন নেই, আপনার শরীর কেমন আছে শুধু সেইটুকুই জানাবেন। শ্রীযুক্ত রুদ্র আপনার কুশল জানতে চান। আমি এবার বাংলা নিশ্চয় শিখব। আপনার ছেলে ও বৌমাকে আমার স্নেহ-সম্ভাষণ জানাবেন। তাঁদের আর আপনার ফোটো সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। সেগুলোর দিকে তাকালে এক অব্যক্ত মধুর আনন্দস্মৃতি আমার মনে আসে।

ইংলণ্ডে পৌঁছে রোটেনস্টাইনকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। সেখানে আপনার সঙ্গে থাকার বড়ো আকাঙ্ক্ষা হয়, তবু আশ্রমে উপস্থিত থেকে যদি আপনার কাজে সাহায্য করতে পারি আর কলকাতার প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারি, তবেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব। ইংরেজী অনুবাদের কাজেও যদি আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি, তাও আমাকে জানাবেন। গীতাঞ্জলির নতুন সংস্করণের বিষয়ে আমার দু'একটি কথা বলার আছে।

আপনার ভবিষ্যৎ কাজের জন্য যেন স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করেন, আমার প্রার্থনায় নিয়ত এই কামনা করি। গুরুদেব, আপনি আমার পরমভক্তি গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহার্থী বন্ধু
সি. এফ্. এণ্ড্রুজ

২

সমুদ্রে। ৭ ডিসেম্বর ১৯১৩

আমার গভীরতম ধর্মমতের বিষয়ে কিছু লেখারই প্রয়োজন নেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস অপনাতে আমাতে যেখানে মিল, তাই রয়েছে আমাদের বন্ধুত্বেরও মূলে। আমরা কখনো তা কথায় ব্যক্ত করি নি, সেই কারণেই আরো অন্তরতর লোকে প্রবেশ করেছে। পরস্পরের মধ্যে বেশি কিছু বাঁধাবাঁধি বা বাক্‌সংযমের প্রয়োজনই হবে না বলে আমার ধারণা, কেননা জানি যে উভয়েই আমরা

সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছি, দল গড়তেও চাই নি, সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করি নি। আপনি একবার আমায় লিখেছিলেন, খুব সম্ভবতঃ আমরা দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব— কোনো বিশেষ দলের জয়ঘোষণার পথে নয়, অন্তরতম প্রেমের অনুভূতিতে। আমার প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষাও তাই। তবে কি জানেন? বোধ করি আপনার দিক থেকে আপনি এত অজস্রভাবে দিয়ে যাবেন, আর আমি কেবলই নেব। সত্যি বলতে খুব বড়ো জিনিস যা আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি— সে হল অন্তরের উদার স্বাধীনতার অধিকার।

আমার প্রাণের গভীর গোপন চিন্তা অনুভূতি যে আপনার কাছেই কেবল প্রকাশ করতে পারি, তা আপনি বোঝেন। আবার আপনি যখন আমার কাছে আপনার জীবনের গভীরতম সাধনার কথাগুলি বলেন, (সেই রাত্তিরে যেমন আপনার ঘরে বসে অমর মন্ত্রগুলো আমায় শোনাচ্ছিলেন) তখন আমার মধ্যে মুহূর্তে সাড়া জাগে। হৃদয়বিনিময়ের এই স্বচ্ছন্দতা না পেলে আমি কখনই আপনার বন্ধু হতে পারতাম না।

এখন এই বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আর একটি কথা আমায় বলতে দিন। বন্ধুপ্রীতির ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে আমার মনে একটু গর্ব আছে। আমার সেই একমাত্র সম্পদ্— তা আপনি গ্রহণও করেছেন। অকৃত্রিম প্রেমের জোরে কিছুমাত্র সংকোচ আমার মনে আসে না। নিজের নিষ্ঠায় আমার বিশ্বাস আছে— অতীতে কখনো আমি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সত্যভঙ্গ করি নি। কেননা এ পথই যে আমার করুণাময় প্রভুর কাছে যাবার পথ। তাই যখন আপনি বললেন আমার বন্ধুত্বে আপনার প্রয়োজন— আমার মন তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এ ক্ষেত্রে আমি যা দেব তা সত্য, তা আমার প্রভুর দান। এখানে আপনি হতাশ হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। দেখবেন এই দাবীতে আপনি যত ভার চাপাবেন, ততই খুশির আর আমার সীমা থাকবে না।

৩

ডারবানের কাছে। ১ জানুয়ারি ১৯১৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গত বছর বাংলা নববর্ষে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আপনি আমাকে চিঠি[১] লিখেছিলেন। তাতে লেখেন, আপনার জীবনে একটি নূতন অধ্যায় শুরু হল— তা আপনি অনুভব করেছেন। সে জীবন হল একটি পথিকের, এক তীর্থযাত্রীর জীবন। আজ পশ্চিমের নববর্ষের দিনে এই ঝড়ের সমুদ্র পার হয়ে এসে তার ওপারে আপনার দিকে যখন তাকিয়ে দেখছি, তখন আমারও মনে জেগেছে সেই একই অনুভূতি। মনে হচ্ছে আমার জীবনের পুরোনো নোঙর পিছনে ফেলে এই এতদিনে বিপুল সমুদ্রে পাড়ি জমালাম। এর মধ্যে একটা মুক্তির স্বাদ রয়েছে। তবু, বিশেষ করে শরীর অসুস্থ থাকলে এমন একটা একাকিত্বের বোধ জাগে। জীবনটা অতি নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ মনে হয়। গত তিন সপ্তাহ ধরে ঝড়ের সমুদ্রে ভ্রমণেরই ফল এটি। গত বছর গ্রীষ্মকালে দু' দু'বার ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর একেবারেই দুর্বল হয়েছিল, তার উপর দিনের পর দিন সমুদ্রপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছি।

কিন্তু পিছন ফিরে যখন তাকিয়ে দেখি, কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যায়। ঈশ্বরের অসীম দয়ার কথা ভেবে আজ আমার মন তাঁর প্রতি প্রেমে উদ্‌বেল হচ্ছে। যা অতিক্রম করে আমাকে আসতে হয়েছে, সেই ছিল আমার সত্য প্রয়োজন। অন্য কোনোভাবে আমি তো তাঁর এত কাছে আসতে পারতাম না। আমার সমগ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে যদি বিচার করতে চাই, যদি তার উদ্দেশ্য ও প্রবণতার দিকটি উপলব্ধি করে নিতে হয়— তবে তার জন্য সহজ স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কঠোর বাস্তবের সংস্পর্শে বিক্ষুব্ধ দিনগুলিই বেশি প্রশস্ত। সেভাবে জীবনটা দেখার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। গত

---

১ As I crossed the Atlantic and spent on board ship the first of Vaisakh, the beginning of the Hindu New year, I realised that a new stage in my life had come, the stage of a voyager, a pilgrim. To the open road! To the emancipation of self! To the realisation in love!

—এণ্ড্রুজকে লিখিত গুরুদেবের অপ্রকাশিত চিঠি (২৯ এপ্রিল ১৯১৩)।

বছর আপনার অসুখ ও অস্ত্রোপচারের সময় আপনিও এই রকম বোধ করতেন নিশ্চয়, কারণ আপনি বলেছিলেন সে সময়টা আপনার জন্য কী আশীর্বাদই না বয়ে এনেছিল।

'অসতো মা সদ্‌গময়'— এই মন্ত্রটি দিয়ে আপনি আমার মনে কত আশ্বাস আর কত সান্ত্বনা যে ভরে দিয়েছেন, তা আর কী বলব! অনেক সময় মাথা যখন দুর্বল লাগে তখন চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করলে অন্তরে এমন একটা জোর পাই, যা কখনো পাওয়া সম্ভব বলে আগে ভাবি নি। বারে বারে তাদের পুনরাবৃত্তি খুব একটা আরাম আর মুক্তির ভাব নিয়ে আসে।

এই যে অপূর্ব অভিজ্ঞতার কাল চলেছে, এর মধ্যে এ যাত্রায় আগের দিন রাতে যে আধ্যাত্মিক বাণী আপনি আমাকে দিলেন, তখন ঈশ্বরের যে অপরূপ মহিমা আমি তাতে প্রত্যক্ষ করলাম, সেই স্মৃতিটিই এখন মনে বড়ো হয়ে রয়েছে। মহর্ষির ঘরে নিয়ে আমায় বসালেন, কথা বলতে বলতে আপনি যেন সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন। যে-বাণীর আমার একান্ত প্রয়োজন ছিল, নিজের অগোচরে সেটিই যেন আপনি নিজ জীবনের গোপন শক্তির আধার বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে দান করলেন।

এই সময়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই মনে হয়েছে, দিল্লীতে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, আমার সমগ্র জীবন সেই নোঙরটি বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছে। অনেক বছর থেকে কেবল তার শিকলে জড়িয়ে ছিলাম। তবে আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়াবার আগে এ-সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয় নি। এখন বুঝতে পারছি, সেখান থেকে সরে না এসে আমার আর উপায় ছিল না। আমার চিত্তের একমাত্র ক্রন্দনই হবে 'অসতো মা সদ্‌গময়।' এখন আর পিছন ফেরা চলবে না। আমার প্রিয়তম বন্ধু আপনি— সর্বদা আমার কাছে কাছেই থাকবেন, তাতেই ক্রমে ক্রমে এমন হবে যে, আমি চোখ মেলে সত্যকে দেখতে পাব— আর সত্যই আমাকে মুক্তি দেবে।

অসুখের সময় কদিন আমাকে বাধ্য হয়ে বাংলা পড়া ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে হল। এখন আবার পড়া শুরু করেছি এমন-কি উইলির[১] সাহায্যে দু'তিনটে কবিতা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। মনে করবেন না, আমি পিছিয়ে

১ উইলিয়ম উইনস্ট্যান্‌লি পিয়রসন

পড়ব। ভারতবর্ষে পৌছবার আগে পর্যন্ত এ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাব আর ফিরে গিয়ে আপনাকে অবাক করে দেব। এর মধ্যে আপনি কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলবেন না।

৪

প্রিটোরিয়া। ১৪ জানুয়ারি ১৯১৪

পরম প্রীতিভাজনেষু

অনেকদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয় নি, কিন্তু এত ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য আপনার কথা আমি ভুলি নি। আপনার প্রশান্ত প্রকৃতির স্পর্শ আমার মনে কত যে শক্তি দেয়, স্থিতি দেয়। সেই এখন আমার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। এখানে আসার আগে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে আপনি বলেছিলেন সহস্র বিস্রস্ততায়ও মন শান্ত রাখতে হবে— সে কথা আমি ভুলি নি। দেখছি খুব ভোরেই কেবল স্থির হয়ে বসবার পূর্ণ অবসর আমি পাই। সাড়ে-চারটেয় এখানে সূর্য ওঠে, আমি অনায়াসে তার এক ঘণ্টা আগে জেগে যাই। এখানকার লোকেরা ছ'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। তাই সকাল বেলাটা চতুর্দিক খুব নিরালা থাকে। সন্ধ্যায় সুযোগ পাওয়া একটু মুশকিল, তাই নিভৃতে নিয়মিত বসতে পারি নি। কিন্তু তখনো নিস্তব্ধ ধ্যানের সময় করে নিতে হবে ; কারণ, তার প্রয়োজন আমি অন্তরে অনুভব করছি।

গত চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছিলাম, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু হলে সম্ভবতঃ আমাকে কারাবরণ করতে হবে। কিন্তু মিঃ গান্ধী একেবারেই তার বিরুদ্ধে। অবশ্য যে-সব বিশেষ কারণে আমার জেলে যাওয়ায় তাঁর এতটা অমত, তা আমি বুঝতে পারছি। যাই হোক, মায়ের অসুখের সময় তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তা আমি ভাঙতে পারি না। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে তাঁর কাছে যাতে যেতে পারি সেভাবে আগেই টিকিট করে ফেলব। সব ভালোমত চলছে দেখলে ঠিক দু'মাস পরে ২১শে এপ্রিল আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসব। ছেলেরা ছুটিতে বাড়ি যাবার আগে আশ্রমে পৌছে আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ। আশা করছি, তার আগে স্কুলের ছুটি শুরু হবে না।

স্কুলের কাজের বিশেষ ব্যাঘাত না হলে যদি আপনি সেরকম একটা ব্যবস্থা করেন তো বড়ো ভালো হয়। আমার ধারণা এর কাছাকাছি সময়েই ছুটি আরম্ভ হয়। তিনটি কি চারটি দিন পিছিয়ে দিলে, আমি সেভাবে ফেরার দিন স্থির করব। ভাবছি P & O-তে এলে ১৭ই এপ্রিল বোম্বাই পৌছব, ১৯শে আপনার কাছে পৌছে যেতে পারব।

আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে ২৬শে যদি পৌছই তবে কি খুব বেশি দেরি হবে? এত আগে সব প্ল্যান করা দেখে আপনার কৌতুক বোধ হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ফেরার জন্য আমার মন যে কত কাতর কেউ তা জানে না। এখানকার প্রতিটি দিন আমার সেই ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়ে তুলছে। মনে পড়ে, ইংলণ্ড থেকে আপনি আমাকে লিখেছিলেন, আপনি যেন একটি অবরুদ্ধ দুর্গে বাস করছেন, আর আমার চিঠিগুলো ক্ষুধার অন্নের মতো আপনার কাছে পৌছেছে। এখানকার এই ষড়যন্ত্র এবং বিদ্বেষের জগতে ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই আমারও হচ্ছে। তাই আশ্রমের শান্ত পরিবেশের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকে যদি আমার জীবনের স্বপ্ন বলে, প্রাণের আশ্রয়স্থল বলে মনে করি, আপনি কি তাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবেন? সেই ছবি দিনের পর দিন আমার মনে ভাসে, আমার চিত্তে সান্ত্বনা এনে দেয়।

বেশির ভাগ সময় এখন মিঃ গান্ধীর সঙ্গেই কাটাই। তাঁকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতেও পেরেছি। ভারতবর্ষে আমরা তাঁকে যেমন মহাপ্রাণ ভেবেছি, তিনি ঠিক তাই, বরং তার চেয়েও বেশি। বীর সন্ন্যাসী তিনি, শুধু চিন্তা নয়, কর্মেরই সাধক তিনি। তাঁর অন্তরপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অথচ পশ্চিমের কর্মযোগে তাঁর দীক্ষা। প্রতিদিন তাঁর সুমহান বীরত্ব, চিত্তের স্বকীয়তা ও স্বভাবের কোমলতা আমার কাছে কত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ ইংলণ্ডে আপনাকে দেখামাত্র যেভাবে সহজ প্রাণের আবেগে তৎক্ষণাৎ ভালোবেসেছি— অতি স্বচ্ছ এঁর চরিত্র তবু আমার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তেমন প্রীতির ভাব জাগে নি। অবশ্য প্রেমের সেই ঐকান্তিকতা আমি অন্য কোথাও বোধ করব এমন আশা করি না। তবু ভারতবর্ষের প্রতি আমার অন্তরে যে প্রবল আকর্ষণ, তারই জোরে আমার আশা আছে, আমাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের আদানপ্রদান সহজ ও নিঃসংকোচ হবে।

আপনারা বাংলা দেশের লোকেরা— আমাকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়ে

ফেলেছেন। এত সহজে খোলামনে আমায় গ্রহণ করেছেন যে, আমার প্রকৃতিও তাতে অনায়াসে সাড়া দিয়েছে। এখানকার গুজরাটি ভারতীয়দের কাছ থেকে সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রচুর লাভ করেছি— কিন্তু আন্তরিক ভালোবাসার প্রত্যাশা করা চলে আপন প্রাণের গভীর টানেই।

সূর্যাস্তের সময় আপনার সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে, নয়তো চাঁদের আলোয় কাছে বসে আপনার শান্তির অংশটুকু নিঃশব্দে উপভোগ করে আমার মনে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হত। তখন আমার অন্তরের প্রেম শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

আপনার সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা আমার হল, এক নূতন দৃষ্টি লাভ করেছি। আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন, জাতিভেদ ও বর্ণভেদের অসাম্যই হল আমাদের যুগের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। এই সমস্যার প্রতিকারে আপনার চিন্তা ও কর্মের যোগ-সম্বন্ধটি আমি অনুধাবন করে দেখলাম, আপনি অন্তরের প্রেম জ্বেলে বাইরের দিকে এগিয়েছেন। আমি এতকাল ধরে এর বিপরীতটিই করেছি। সোজাসুজি এই প্রশ্ন নিয়ে যদিও আলোচনা করেন নি, তবু আপনার লেখা বইগুলিতে আপনার অন্তরের অকৃত্রিম মৈত্রীভাবনা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, পাশ্চাত্য জনচিত্তে তার এমন প্রভাব পড়েছে যে দেখেছি তাতেই শত বাধা অপসারিত হয়ে গেছে। অবাক লেগেছে দেখে যে, আপনার সম্বন্ধে যত সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছি— সবই প্রায় অস্ট্রেলিয়া আর কানাডার এমন সব অঞ্চল থেকে যেখানে আপনার সশরীরে প্রবেশে বিরোধিতাই পেয়েছেন।

মনে পড়ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার সময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন— যদি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। কিন্তু এই তো আমি আসার বহু পূর্বেই আপনি এখানে পৌঁছে গেছেন। দেখে আমার কত যে আনন্দ হল। আপনাকে আগেও জানিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের টেবিলে প্রথম যে বইটি দেখলাম— সেটি 'গীতাঞ্জলি'। সে হল ডারবানে। এখানে প্রিটোরিয়ায়ও তাই দেখছি। এখানকার দুটি গির্জাতেই আমার উপর প্রার্থনান্তিক উপদেশ দেবার ভার ছিল। তখন আপনার কবিতা উদ্‌ধৃত করেই বুঝলাম আপনার লেখার সঙ্গে এঁরা পূর্ব থেকেই পরিচিত। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন— আপনার বইখানা পড়ে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের

সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা একেবারেই বদলে গেছে। অবশ্য আমি বুঝি, এটা সম্ভব হয়েছে কেবল আপনার প্রতিভার জোরে। কিন্তু তবু একটা কথা বলার আছে— সেই প্রতিভা তো আপনি অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। বিতর্কমূলক লেখায় বা সক্রিয় আক্রমণে তা প্রকাশ পেতে পারত। কিন্তু তা তো আপনি করেন নি। প্রেমের মধ্যেই আপনি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিরোধ-সংগ্রামের মধ্যেও আপনি চিত্তের শান্তি ও সমতা রক্ষা করেছেন।

অতীতে আমি তর্কবিতর্কের আস্ফালনে অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট করেছি। তাতে আমার জীবনে বিক্ষোভ এসেছে, আমি শান্তি হারিয়েছি। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে মানবজাতির আধ্যাত্মিক জাগরণ হলে তবেই দীর্ঘদিনের এই বিদ্বেষ সরে যেতে পারে। সেই শ্রেয়োবুদ্ধির উন্মোচন অবশ্যম্ভাবী। তবে কোনো এক জাতি বা দল বা বিশেষ মতবাদের সাহায্যে তা আসবে না। যে প্রাচীন রীতিগত খ্রীস্টধর্ম আমি আগে মেনে এসেছি, তাতেও আসতে পারে না। এ ভগবৎ প্রেমে পূর্ণতর এবং গভীরতর কিছু, যা বহু ব্যাপক ও প্রশস্ত কর্মপথে এই শুভসম্ভাবনা আনবে।

আমরা সম্প্রতি সামরিক আইনের অধীনে আছি। বুয়র সেনানায়কগণ সব এখন শশব্যস্ত। এখানে শুধু অর্থ ও জাতি-অভিমান— এই দুটি অপদেবতার রাজত্ব চলেছে। তাই যে-ক্ষেত্রে এঁদের আরাধনা চলে, সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে দরিদ্র নিপীড়িত ভারতীয় সমাজের ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে একতা ও প্রেমের আবহাওয়ায় অনেক আরাম পাই।

৫

ডারবান। ২৭ জানুয়ারি ১৯১৪

পূজনীয় গুরুদেব

জীবনে হঠাৎ দুঃখ আসুক কি আনন্দ আসুক আমি সর্বপ্রথমেই আজকাল আপনার কাছে ছুটে যাই। এই সময় আকস্মিকভাবে আমার জীবনে যে দুঃখ এল, তা আনন্দেরই রূপান্তর। এতক্ষণে আপনি আমার তার পেয়ে জেনেছেন যে, আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী মহাশান্তিতে পূর্ণতর জীবনে প্রবেশলাভ

করেছেন। ইংলণ্ডে ফিরে গেলে তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানি আর আমাকে আদরে কাছে টানবে না। তাঁকে একবার দেখতে যাব বলে যে কথা দিয়ে এসেছিলাম তাও আর রাখা হল না।

আগে যে-কথাটি আপনাকে জানাই নি তা এখন জানাব। গত বছর গ্রীষ্মকালে মাকে প্রায় কথা দিয়েছিলাম যে অল্পদিনের জন্য হলেও একবার তাঁর কাছে ফিরে যাব। যাবার সুযোগও এসেছিল। কিন্তু যখন তাঁকে জানালাম যে বোলপুরে আমাকে আপনার প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে তিনি সম্মতি দিলেন। দুজনের একজনও তখন ভাবি নি যে আর আমাদের দেখা হবে না। কিন্তু তা যদি মা জানতেনও তবু তিনি বাধা দিতেন না, বরং আমাকে বোলপুর যেতেই বলতেন। কারণ, অত্যন্ত নিঃস্বার্থ ছিল তাঁর মন। গত গ্রীষ্মে আশ্রম থেকে নিয়মিত তাঁকে চিঠি দিয়েছি। তাতে সে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়েছিল। আগস্ট মাসে আবার যখন আমার দেশে যাবার কথা উঠল, তখন মা লিখলেন, আপনার কাজে যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি তবে যেন আমি সেখানেই থেকে যাই। কারণ আপনার কাজের প্রতি তখন মা আর আমি দুজনে সমান অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আপনি তো জানেন তার পরে আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম। নবেম্বরের গোড়ার দিকে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম— মার্চ মাসের কোন্ দিন গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছব। এ চিঠি পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা ছিল না। বাবার চিঠিতে জেনেছি, সে আনন্দের সংবাদ তাঁকে বড়ো বিচলিত করে তুলেছিল।

মা আমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন বলে আমি নাটালের কাজ বন্ধ করে ইংলণ্ডে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। এখন আর তার প্রয়োজন রইল না। কিন্তু আমি জানি, তিনি এই ভেবে শান্তিতে গেছেন যে, ভারতীয়রা বিশ্বাস করে আমায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন আর ঠিক সেই সময়ে আমি ভারতবর্ষের কাজই করছিলাম।

শেষের দিকে আমি আশ্রমের কথা তাঁদের কাছে লিখতাম। মা আর বাবাও তার উত্তর দিতেন। আপনার কবিতা মাকে পড়ে শোনানো হলে তিনি রোগে সান্ত্বনা পেতেন। গীতাঞ্জলির 'শিশু' কবিতা দুটি তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। তাই আমি ভেবেছিলাম, তাঁকে একখণ্ড Crescent Moon পাঠাবার কথা আপনাকে জানাব। সেও তো আর হল না।

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমি যা যা লিখেছি সব মাকে পাঠাতাম। সেখানকার তালগাছ দেখে যে কবিতা রচনা করেছিলাম, সেটি পড়তে তিনি কত যে ভালোবাসতেন— ভাবতে মন খুশিতে ভরে যায়। সে কবিতার শেষ-দিকই তাঁর সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছিল।[১] কারণ, তিনি বলতেন, সেখানে আশ্রমের শান্ত পরিবেশ তিনি অনুভব করতে পেরেছেন। তাঁর মনে হত আমার সঙ্গে তিনিও সেখানে রয়েছেন। মাকে জানিয়েছিলাম— এবার আশ্রমে ফিরে গিয়ে সেখানে থাকব, অন্য কোথাও যাব না। আমার ধারণা, তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন যে আমার মন সর্বদা আশ্রমেই পড়ে থাকে।

আমাদের একটা বড়ো দুঃখের কারণ হল, আপনি যখন ইংলণ্ডে, মা তখন এত দুর্বল যে ডাক্তার তাঁকে আপনার কাছে গিয়ে দেখা করার অনুমতি দেন নি। তখনো আপনি যে আমার কতখানি প্রিয় তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বাড়িতে নিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করার তাঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল।

আশ্রমের সঙ্গে আমার মায়ের স্মৃতি যে যে সূত্রে জড়িত সে সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আপনাকে জানাচ্ছি— কেননা, এই দুঃখের মধ্যে কি ভাবে আমি সান্ত্বনা পাচ্ছি, তা আপনি বুঝবেন। আমার অতীত জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে যে একটি যোগসূত্র ও সংগতি রয়েছে তা এর আগে আমার কাছে এতখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অনেক সময় আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, ভারতের প্রতি এই গভীর প্রেম আমার মনে কোথা থেকে এল? আপনাকে আগেও বলেছি, উইলির মধ্যে তা যত সহজে এসেছে, আমার মধ্যে তেমন নয়। আমার মনে ছিল গর্ব ও সংস্কারের প্রবল বাধা। সেই বাঁধ প্রথম ভাঙল সুশীলের[২] বন্ধুত্বের সংস্পর্শে। কিন্তু তখনো তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে নি। আজ এই শান্ত মধুর ক্ষণে আমার আরাধ্যতমা মায়ের সুন্দর জীবনটির স্মৃতি সম্মুখে রেখে বুঝতে পারছি ভারতের প্রতি আমার প্রেমের মূলে রয়েছে তাঁর ভক্তিপ্লুত চিত্তের গভীর অনুরাগ।

---

১ **The Palms at Santiniketan**, পরিশিষ্ট ১

২ সুশীলকুমার রুদ্র

ভারতীয় নারীর মাতৃত্বের কথা যত পড়েছি, যত শুনেছি ও যত দেখেছি, ততই নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়েছে। কারণ, তাঁকে তো আমি ভালোভাবেই জানতাম। এইদিকে সাধারণ ইংরেজ মায়ের চেয়ে তাঁর বিশেষত্ব ছিল। তাঁর মনে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্জনের ভাব ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন তাদের মধ্যেই নিবিষ্ট ছিল এবং প্রতিদিনের সেবায় প্রেমে তা এমন নিঃস্বার্থরূপে প্রকাশ পেত যা সত্যিই বিস্ময়কর। উপাসনায় যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে তিনি কখনো বাড়ি ছেড়ে যান নি। খ্রীস্ট-জন্মোৎসবের প্রার্থনায় যোগ দেবার ইচ্ছায় এবার যে বাড়ি থেকে বেরোলেন— তাঁর শেষ অসুখের কারণই হল তাই। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এই মজার অথচ স্নেহকরুণ গল্পটি চলে: মাসি থাকতেন আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। একবারই মাত্র বাবা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে দেখতে যেতে মাকে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির জন্য আর ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর এত মন খারাপ হতে লাগল যে মা কিছুতেই তিন চার দিনের বেশি সেখানে টিকতে পারলেন না।

আমার মায়ের স্নেহের কথা আমার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে আঁকা রয়েছে, কারণ, সন্তানদের মধ্যে আমি তাঁর সবচেয়ে আদরের ছিলাম। শিশুকাল থেকে আমি অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল ছিলাম, মাঝে মাঝে মরণাপন্ন হয়ে পড়তাম। তাতেই আমার প্রতি তাঁর স্নেহের আকর্ষণ অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া সব সময় আমি নানারকম গোলমালে জড়িয়ে পড়তাম। তখন সবাই আমাকে ভুল বুঝত। কেবল মা আমায় ঠিক বুঝতে পারতেন আর বোধ হয় খানিকটা প্রশ্রয়ও দিতেন। তাতেই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছিল। নিজ জীবনের সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতির মধ্যে একটি হল— ছোটো ফ্রক পরে একটি ছেলে (চার বছর বয়সের আমি) মায়ের শোবার ঘরের বাইরে সিঁড়িতে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে, কারণ মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তখন ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন। আজও আমি সেই দিনটির ব্যাকুল বেদনার স্মৃতি মনে আনতে পারি।

আমি আপনাকে যা বলতে চেয়েছি তা হল এই— আমার মন থেকে গর্বের বাধা সরে যাবার পর আমি ভারতীয় চিত্তের অনুরাগের প্রতি অনায়াসেই সচেতন হলাম কেবল এই কারণে যে তা ঠিক আমার মায়ের প্রাণের স্নেহেরই

অনুরূপ। একথা অবশ্য ঠিক যে পৃথিবীর সর্বত্রই মায়েরা সন্তানদের স্নেহ করেন এবং গৃহের প্রতি তাঁদের টানও স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মায়ের ক্ষেত্রে এর একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আর একটি নিজস্ব দীপ্তি ছিল। সেই দীপ্তি, সেই শ্রী আমি বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে ক্রমশঃ খুঁজে পেয়েছি। আমার মায়ের মৃত্যুতে এখন ভারতবর্ষই আমার নিজের বাসভূমি হয়ে উঠবে, ভারতের ঘরে ঘরেই এখন আমি তাঁকে পাব।

আমার মনের এই গভীর শান্তির মধ্যে আমি উপলব্ধি করছি, এবার যখন ভারতে ফিরে আসব তখন ভারতবাসীর দৃষ্টিতে আমার মায়ের চোখের দৃষ্টি আর ভারতের মাতৃমুখে আমার মায়ের মুখখানি দেখতে পাব। এখানে ডারবানে প্রথম আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলেন ভারতীয় মায়েরা। তাঁদের সস্নেহ দৃষ্টি আর অস্ফুট সান্ত্বনাবাক্য অতি সুন্দর সহানুভূতিতে গভীর। তাঁদের নম্রমধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলাম। তাতে আমার মন আশ্বাসে শক্তিতে ভরে উঠল।

শিশুকাল থেকে মায়ের প্রভাবে বেড়ে উঠেছি বলে আমার মনেও মাতৃভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। মায়ের স্নেহ যেভাবে আমার উপর বর্ষিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে যখন আমি আমার ভালোবাসাও অন্যদের দেবার সুযোগ পাই, তখনই কেবল আমার মন একটি সুন্দর ফুলের মতো ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, লোকে হয়তো আমায় ভুল বুঝবে। ভয় হয়, যাদের ভালোবাসি তাদের হয়তো আমি বিব্রতই করি। কিন্তু ভারতে এসে সে ভয় আমার কমে গেছে। এখানে ভালোবাসা দিয়ে তার প্রতিদানে আমি এত পেয়েছি যে সে কথা মনে করলে আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

শান্তিনিকেতন আশ্রমও এখন আমার কাছে স্মৃতিতীর্থ হয়ে উঠেছে। গত বছর গরমের সময় মা আর আমি মিলে যখন ঠিক করলাম যে আমাদের শিগগির দেখাসাক্ষাৎ হবে না, তখন থেকে আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ শুরু হয়। আশ্রম থেকে তাঁকে আমি খুব বড়ো বড়ো চিঠি দিতাম। এতে আমরা দুজনে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে উঠলাম। মা আশ্রমের আদর্শ ঠিক বুঝতে পারতেন আর সেখানকার শান্তিও তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। আপনার প্রীতি ও আরো নানা সুখের স্মৃতি নিয়ে এবার যখন আশ্রমে ফিরব, তখন সেখানে আমি আমার মাকেও দেখতে পাব। তিনি আমার সঙ্গে

থাকবেন, তাঁর মুখের হাসি দেখে আমি তৃপ্ত হব। এখন থেকে আশ্রমই আমার নিজের গৃহ হবে এবং আমার মাকে আমি সেখানেই খুঁজে পাব।

৬

দিল্লী। ২৩ মে ১৯১৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পিতৃদেবের জন্মদিনে লেখা চিঠিখানির উত্তর দেব বলে ভোরের নিঃসঙ্গ নির্জনতার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন লিখতে বসে হৃদয় আমার পূর্ণ কিন্তু যে কথা জানাতে চাই তা বলার ভাষা খুঁজে পাই না। তাই আমাকে পথ হাৎড়ে এগোতে হবে এই ভরসায় যে, আপনি অন্তরের ভাবটি ধরে নেবেন।

আমার অযোগ্যতার কারণেই আপনার প্রত্যাশা পূর্ণ হবে না, এ সংশয় আবার আমার মনে জেগেছিল। একথা আমার স্বীকার করা চাইই, কেননা, আপনি আমার দোষত্রুটি নিয়েই সম্পূর্ণভাবে আমাকে জানবেন, তাই আমার কাম্য। বোলপুরে যখন আপনার কাছে ছিলাম— তখন এ ভয় আমার ঘুচে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম আর কখনো তা ফিরবে না। কিন্তু আবার তা আমায় পীড়ন করছে। যেদিন আমার প্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করবে, সেদিনই সব ভয় দূর হবে। এই আত্মকেন্দ্রিক আত্ম-অবিশ্বাসের উপর আমাকে জয়ী হতেই হবে। সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও আমার প্রতি আপনার প্রেমে যেন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি।

এ সময়ে আরো বড়ো ভয় যেটি আমার মনে জাগে— তা হল এই। আপনার জীবনে সেই পরম দিন যখন আসবে, যখন চিত্তের দুঃসহ মন্থনব্যথা সইতে হবে; তখন আমি হয়তো আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাতেই চেষ্টা করব সেই বেদনাকে আড়াল করতে। তা যেন কখনো না করি, সে সম্বন্ধে আমায় বিশেষ সাবধান হতে হবে।

একটি বিষয় আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই— যাদের ভালোবাসি তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক সময় অদ্ভুত আশঙ্কা আমার মনে আসে। এ থেকে আমি কোনোদিন রেহাই পাব বলে আশা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে

অনেক সময় আপনাকেও খুব ধৈর্য ধরে আমার সেই উদ্‌বিগ্নতাকে হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমার সে উদ্‌বেগ নেই। আমি জানি সেখানে দুঃখই হল জীবনরস। তাই যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি তাকেও সেই দহনতাপ থেকে বাঁচাবার প্রয়াস পাই না।

এ কথাটাকেও কিন্তু আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, আনন্দহীন দুঃখ-সম্ভোগ নিষ্ফল। আধ্যাত্মিক আলোড়নের পরিণতি হওয়া চাই আনন্দে। যথার্থ বন্ধুর কর্তব্য হল চিত্তের এই বোধনায় আনন্দ-জ্ঞাপন, আনন্দ-উদ্দীপন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি উদ্‌বিগ্ন হই সত্য, কিন্তু ভুল করবেন না এ ভেবে যে আপনার অধ্যাত্মচেতনার নাড়ীছেদকারী যন্ত্রণার লাঘব আমি করতে চাই। সানন্দে সে দুঃখের অংশ আমিও গ্রহণ করব, কিন্তু তা থেকে আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না। সে সময় বরং আমি আমার পক্ষে অতি কঠিন যে কাজ তাই করব। আপনার নির্জনতায় একটুও বাধা না দিয়ে তখন আমি সরে দাঁড়াব। সুহৃদের সহৃদয়তায় কখনোই আমি আপনার চিত্তে অসাড়তা আনার পথে যাব না, এ কথা স্থির জানবেন।

তাছাড়া আরেকটি দিকেও আমার সংশয় দূর হয়েছে। আপনাকে বন্ধু বলে যখন হৃদয়ে নিয়েছি, আর তবে তো আমার হৃদয়ভারের অংশ দিতে দ্বিধা বা সংকোচ চলে না। আপনার বোঝা বাড়াচ্ছি ভেবে সংকুচিত হওয়া আমার অন্যায়। এখানে আমায় সহজ স্বচ্ছন্দ হতে হবে। আপনাকে কত গুরুভার বহন করতে হয় ভেবে নিজের চিন্তার ভার গোপন করে আপনার সঙ্গে যেন অসরল ব্যবহার না করি। দুঃখে হতাশায় বিপর্যস্ত আমার যথার্থ স্বরূপটি যদি আপনার কাছে অসংকোচে মেলে ধরতে পারি— তবে মৌখিক সহমর্মিতার চেয়ে সেই সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশেই আপনি পাবেন বেশি শক্তি ও সহায়তা।

আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধু আপনি, যেদিন দুঃখরাত্রির অবসানে সত্য উদ্ভাসিত হবে আপনার জীবনে, সেদিন আমি যেন সাহসভরে আপনার পাশে থেকে সব দেখে জেনে বুঝে আপনার পরম বেদনার সমভাগী হবার সৌভাগ্য লাভ করি। কখনো যেন আপনাকে পিছিয়ে না দিই, দুর্বল না করি, ব্যর্থ না করি। আমার আজ সকালের প্রার্থনা ছিল এই।

এবার নিজের কথা লিখি। জীবনের যে অধ্যায় রচনা এবার থামিয়ে

দিলাম— তা যে কত অকারণ কর্মব্যস্ততা ও ভাবোচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়েছে, তা আজ ধরা পড়ছে। এখন প্রায় শেষ করে এনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি।

১লা জুন আপনার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করব। ততদিনে আমার হাঁটুও সেরে যাবে আর এখানকার সব পাটও গুটিয়ে নিতে পারব। সে পর্যন্ত রোজ আমি দিন গুনব। ওখানে গিয়ে অলসতার প্রতিমূর্তি হয়ে দিন কাটাব —এই সংকল্প মনে আছে।

আপনার অতি প্রিয় বন্ধু
চার্লি

৭

দিল্লী। ২৩ মে ১৯১৪

প্রিয় বন্ধু,

আজ সকালের চিঠিতে আপনার দুঃখের বেদনাভরা রূপটি দেখে মনে হল, আমার চিঠি আপনার কাছে কী শুষ্ক, কী নীরস ঠেকেছে। আমাকে ক্ষমা করবেন। এই চিঠিখানি পাবার পর থেকে আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য মন বড়ো ব্যাকুল হয়েছে। অবশ্য জানি তার কিছুই প্রয়োজন নেই, কারণ মা সর্বদা আপনাকে ঘিরে আছেন। তবু আপনার চিঠি পেয়ে অবধি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে মনে করছি। কী কঠিন পথ অতিক্রম করে আপনি চলেছেন, তা বিশেষ করে আমাকে জানানোতে আমার মন আনন্দ ও আশ্বাসে ভরে গেছে। এ যে আপনার মহানুভবতা। বন্ধুত্বের মর্যাদা আপনিই বজায় রেখেছেন।

যতক্ষণ আপনার কাছে পৌঁছতে না পারছি, ততক্ষণ সময়ের ভার যেন আমার কাছে সীসার ভার ঠেকছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এখানেও বুঝতে পারছি, বিচ্ছেদের অভিঘাত আমার প্রেমকে বিশুদ্ধতর করবে।

বন্ধু, আমার অন্তর আপনারই। কেবলমাত্র প্রেম ও সহানুভূতির যোগে আমার মন শিক্ষা গ্রহণ করে— তাই আমি পাই আপনার কাছে। প্রতিদিন সকালে আপনার চিঠি দূতীর মতো যে সংবাদ বহন করে আনে তার সুর আনন্দ থেকে ক্রমেই দুঃখের তারে বাজছে। তবু তারা পূর্ণতর প্রশস্ততর জীবনের

আশ্বাস বয়ে নিয়ে আসে। সেই জ্যোতির্ময় প্রভাত আমার জীবনেও উদিত হচ্ছে, স্তিমিত আঁখি মেলে তা দেখতে পেয়েছি। আপনি যে জগতে প্রবেশ করেছেন, সেখানে যেন কেবল আমি প্রেমের জোরেই প্রবেশের অধিকার পাই — আমার দেবতার কাছে এই আমার সকাতর প্রার্থনা। জিজ্ঞাস্য বিষয় অনেক আছে, কিন্তু সেজন্য তাড়া নেই। আমার অন্তরের প্রেম যদি তার শুচিতা রক্ষা করে তবেই আপনার মধ্যে শক্তিসঞ্চারও সম্ভব হবে।

আমার জীবনের দ্বন্দ্বভাবনার অবসান হয়েছে। আপনি যে নিজের বেদনার ভার দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করেছেন, সেই সৌভাগ্যচিন্তাতেই আমার বল বেড়ে গেছে।

আমার অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি গ্রহণ করুন।

চার্লি

৮

দিল্লী। ২৪ মে ১৯১৪

শ্রদ্ধেয় বন্ধু,

আজ ভোরবেলাকার প্রশান্ত মুহূর্তে আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম। স্থির জানি সেই ক্ষণে যে-প্রার্থনা করেছি তা সফল হবেই। এখানে শহরের মধ্যেও শান্তি আছে। সিমলার সঙ্গে এই মস্ত তফাৎ। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়েও সিমলায় বিক্ষিপ্ততা ছিল বেশি।

দিল্লীতে আমার পুরোনো দিনের সমস্তটাই পুরোনো পড়া বইয়ের পাতার মতো বন্ধ করে দেওয়া হল। এ যে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অন্ধকার থেকে আলোতে, সত্যানুসন্ধান থেকে নিবিড়তর অনুভূতিতে আপনিই যে আমাকে টেনে নিচ্ছেন, সে আমি বোধ করতে পারি। এখন আমার যা প্রয়োজন তা হল নীরবতা। শিল্পীর জন্য তার প্রয়োজনীয়তা নেই। গান্ধীজি শিল্পী নন। শিল্পে অভিব্যঞ্জনা যে পূর্ণতারই অভিমুখী তা তাঁর অজ্ঞাত। কিন্তু আমার জীবনসাধন সম্বন্ধে তিনি ভুল করেন নি। নীরব সাধনাই আমার চাই। অঙ্কুর হয়ে বেরোবার আগে মাটির নীচে বীজের যে সময় দরকার আমাকে তাই দিতে হবে, সে আপনিও জানেন। আমি যদি পথ ভুলি নিশ্চিতই আপনি

শক্ত মুঠোয় ধরবেন। তবে এ-পথে চলায় আমার যে আনন্দ— তাতে সতর্কতার প্রয়োজন হবে মনে হয় না।

এখন আমার সব বাসনা, সব কামনা যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে আপনার দিকে। দিনে রাতে কেবল এই আশাতেই প্রহর গুণি যে কবে আপনার সঙ্গে থাকতে পাব। সে রকম দিন আমার জীবনে খুব কমই এসেছে, অথচ তারাই আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। এখনো আমি খুব ক্লান্ত, তবু আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার শরীর ভালো, মন আনন্দে ভরা, বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণগুলিও এখন মন থেকে সরে গেছে।

ম্যাকমিলানকে লিখেছি, Sadhanaর দ্বিতীয় সংস্করণ যেন শীঘ্রই শুরু করেন। আরো কিছু সংশোধন করেছি, মনে হচ্ছে এবার বইটি সব রকমে সম্পূর্ণ হবে। ছোটোখাটো কয়েকটি পরিবর্তনই কেবল দরকার। আউটরাম এই বইটি সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে আবার লিখেছেন। ছোটো গল্পগুলি ছাপার জন্য খ্রীস্টমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে।

নিজের কথাই লিখলাম, কারণ, জানি যে আপনি তাই জানতে চান। কিন্তু আমার অন্তরের গভীরতম চিন্তাধারা ও ভগবৎ-উপাসনা আপনার বেদনার মুহূর্তগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

আপনারই চার্লি

৯

দিল্লী। ২৫ মে ১৯১৪

পরমপ্রীতিভাজন বন্ধু,

আপনার চিঠি পাবার পূর্ব পর্যন্ত বুঝতে পারি নি সিমলার হিমশীতল আবহাওয়ায় আমার হৃদয় কত নিষ্প্রাণ হয়েছিল। সেই চিঠিগুলো এখন আমার পক্ষে সঞ্জীবনী-রসে পরিণত হয়েছে। আপনাকে কেমন করে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আজ আমার মায়ের জন্মদিন। শিশুকাল থেকেই এই দিনটি আমার মনে উজ্জ্বল সূর্যালোক ও বসন্তকালের স্মৃতি বয়ে এনেছে। মে মাসে তাঁর জন্মদিনের ভোরে আমরা সব ছেলেমেয়েরা বসন্তের ফুল তুলে এনে গানে গানে তাঁর ঘুম

ভাঙাতাম। তিনিই ছিলেন আমাদের রানী। আর কাউকে আমরা মানি নি, জানি নি। বছরের দুটি দিন আমরা তাঁর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গান গাইতাম —খ্রীস্টোৎসবের দিনে আর তাঁর জন্মদিনটিতে। গানের শেষে কী আনন্দে, কী উত্তেজনায় আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উপহার এনে তাঁর হাতে দিতাম। উপহারগুলো আগে থেকেই অতি সঙ্গোপনে রাখা হত, যাতে তাঁকে সেদিন একেবারে অবাক করে দেওয়া যায়। আমার বড়দিদি এ বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। আমি কখনো মায়ের কাছে গোপন রাখতে পারতাম না বলে তাঁর কাছে কত তিরস্কার পেয়েছি, সেকথা আজো মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রায়ই তা চাপা থাকে নি।

প্রায় প্রতিবারেই এই দিনটি থাকত আলোকোজ্জ্বল। রানী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন এর কয়েকদিন আগেই। আমরা বলতাম, আমাদের রানীও জন্মেছেন একই রাজকীয় আবহাওয়ায়। মায়ের জন্মদিনের কথা মনে করতে আলো-সমুজ্জ্বল দিনের ছবিই আমার চোখে ভাসে।

আজকের সকালবেলাটিতেও সেই আলোক-রশ্মিপাতে আমার অন্তর-বাহির আপ্লুত। কারণ সকালের ডাকে আপনার চিঠি পেয়ে জেনেছি আপনার মনের মেঘ কেটে গেছে। গত কয়েকদিন আপনার তীব্র অনুভূতির স্বরূপটি জেনে আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি। কী দিন আপনার গেছে তার কতটুকুই বা আমি অনুমান করতে পেরেছি। তাতেই আপনার প্রতি আমার প্রেম আরো বেড়ে গেছে, আর সেই প্রেমের আলোকে আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি।

আপনার লেখা প্রতিটি ছত্র আমাকে জাগিয়ে তুলেছে, আমি নিজের জীবনের পথ স্পষ্ট দেখতে পয়েছি। আমাকে আরো গভীরে প্রবেশ করে মূলে দৃঢ় হতে হবে। এভাবে ভিড়ের মধ্যে অধীর কর্মব্যস্ততায় বেশিদিন আমার থাকা চলবে না, কেন না এটা প্রকৃত জীবনই নয়। জানি কেবল শান্তিনিকেতনেই আমার জীবনের এই প্রশান্ত পরিবর্তন সম্ভব। আপনার প্রেমে আপনি আমাকে নীরবে আকর্ষণ করেছেন, এখন আমি তার তাৎপর্য বুঝতে পারছি। সেখানকার মাটিতে যেন আমি শিকড় ছড়াতে পারি, কোথাও বাইরে দূরে ঘুরে না ফিরি।

পূর্ণ বিশ্বাসে আমায় আপনি গ্রহণ করেছেন— সেও যে কী আশ্চর্য! সে কথা মুহূর্তও ভুলি না। প্রথম পরিচয়ের দিনে কী চঞ্চল, অধীর, আবেগ-

প্রবণ আমাকে দেখেছেন— তাতে না ভুলে কোন্ আশ্বাসে আপনার অন্তর্দৃষ্টি আমার আত্মার গভীরে কী সম্ভাবনা আবিষ্কার করল। আমার অশান্ত প্রকৃতি আশ্রমের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাতে বিঘ্নসৃষ্টির ভয় ছিল। কিন্তু আপনার সরল বিশ্বাস তাতে বাধা পায় নি— দ্বার খুলে আমাকে আপন অন্তরে টেনে নিলেন। না না, আমি কিছুতেই আপনাকে নিরাশ করতে পারব না, কোনো মতেই না।

আজ আমার মায়ের জন্মদিনে একথা আমি সমস্ত মনে প্রাণেই বলছি। আজকের সূর্যালোকে আমার আনন্দস্নান। ভয়ের কথা আজ আর মনেই আনব না। পাছে আপনাকে হতাশ্বাস করি সেই আশঙ্কা মনে জাগে। না, আপনি বড়ো ভাইয়ের মতো, প্রিয়তম বন্ধুর মতো আমার পাশে থাকবেন, তবে আবার কেন আমি ভরসা হারাব ?

স্নেহাবনত

আপনার চার্লি

১০

দিল্লী। ২৬ মে ১৯১৪

পরমপ্রিয় বন্ধু,

গতকাল আমার মায়ের জন্মদিনে যেমন বাইরের আকাশ তেমন আমার অন্তরাকাশ মেঘনির্মুক্ত ছিল। মায়ের অজস্র স্মৃতি ভিড় ক'রে মনে পড়ে একবার আমার চোখে জল ভরে গিয়েছিল— আবার পূর্ণতর সত্যের জ্যোতিতে তা মুছে গেল।

কালকের দিনটিতে আপনার সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষা মনে এসেছিল। ক্ষিতিমোহনের মায়ের মৃত্যুর পর সেই সন্ধ্যায় আপনি তাকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, বিয়োগব্যথার মাঝে অপূর্ব সেই আনন্দ সন্ধ্যা—তার স্মৃতি কোনো দিন আমার মন থেকে মুছে যায় নি। গত জানুয়ারিতে আমার অন্তরের সেই সংগ্রামের ক্ষণে তার শক্তিতেই আমি যুঝেছিলাম। গতকাল আবার সেদিনের কথা নতুন করে আমার স্মরণে এল। ক্ষিতিমোহনের যে চিঠিখানি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, সেখানি বার বার করে কাল পড়েছি।

তিনি লিখেছিলেন, "আপনার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনে হল আবার আমি সেই অন্ধকার বারান্দায় গুরুদেবের পাশে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসেছি। আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রেমে বাতাস ভরপুর—আমার চিত্তও যেন জগজ্জননীর প্রসাদে শান্তিতে ভরে গিয়েছিল। বাগানের ফুল নিয়ে আমরা আরাধ্য দেবতার চরণে উৎসর্গ করি। তাঁর পায়ের স্পর্শ পেলে সে ফুল আর সামান্য ফুল থাকে না, তা হয় নির্মাল্য। সে ফুল তখন শুচিশুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করতে হয়। ইহজগতে যিনি আমার মা ছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিয়ে নিজের চরণে স্থান দিয়েছেন। তাই মা আমার আজ দেবতার নির্মাল্য।"

আপনার কাছে যাবার আমার এত ইচ্ছা হয়েছিল; তা সম্ভব না হলেও সেদিন আপনার একখানি চিঠি পাবার একান্ত আগ্রহ মনে ছিল। হয়তো নিরাশ হতে হবে ভেবে মনকে সংযত করছিলাম। তবু এই বিশেষ দিনে আপনার চিঠির জন্য মন অধীর ছিল।

সত্যিই তাই পেয়ে গেলাম। চিঠিখানির প্রত্যেকটি পাতা জুড়ে শান্তম্ অবস্থিত। আগে পরে আপনি শান্তস্বরূপকেই স্মরণ করেছেন। স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দে আমার হৃদয়পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠল।

একটি বিশেষ ইচ্ছা ক'মাস ধরেই মনে রয়েছে। সেটি হ'ল, মাকে যেন আমি শান্তিনিকেতনে খুঁজে পাই। ক্ষিতিমোহন আরো লিখেছেন, "তাঁকে আমি হারাতে পারি না। যদি আমার হৃদয় তেমন সুনির্মল না থাকে, তবে এবার ঈশ্বরের করুণাধারায় স্বচ্ছ হোক, সব বাধা ধুয়ে যাক। আমি আমার আত্মায় তাঁকে ফিরে পেতে চাই।" চিঠির শেষে লিখেছেন, "এখানে আশ্রমপরিবেশে সুগম্ভীর প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত। ভগবান আপনাকে সুনিবিড় শান্তিতে আবৃত রাখুন।"

আপনারই চার্লি

১১

দিল্লী। ২৭ মে ১৯১৪

পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধু,

আপনার চিঠিগুলিতে এক অপরূপ সংগীতের মূর্ছনা বারে বারে ধুয়োয় ফিরে ঝংকার তোলে। এক একখানি বার বার করে পড়ে দেখেছি। আদিতে

আছে আনন্দ মহিমায় সমুজ্জ্বল জীবনের পরিচয়, ক্রমশঃ মর্ত মানবাত্মার দুরন্ত সংগ্রামের অন্তে শান্তির অমৃতলোকে পুনঃসঞ্চরণ। যে ধ্রুবপদে বার বার গিয়ে পৌঁছই— তা এই সত্যম্ এবং শান্তম্।

প্রতি নতুন দিনের সূচনায় আমি প্রয়াস পাই আপনাকে অনুসরণ করে একই পথে চলতে। তাতে আপনার শক্তিতে আমিও শক্তিমান হই।

সিমলায় আমার চিত্ত নিদারুণ তিক্ততায়, অভিযোগে, অনুযোগে ভরে গিয়েছিল। যারা আমার প্রতি অবিচার করছে তাদের প্রতি চিত্তের বদান্যতা ভুলেছিলাম। তাই আমিও অবিচার করেছি। ক্রমশঃ এ প্রবৃত্তি আমার গোপনমনে বেড়েই যাচ্ছিল। আপনার চিঠি আসার পর থেকে আমি এ বিষয়ে সজাগ হয়েছি। আজ সকালে বিশাল মাতৃহৃদয়ের কল্যাণকামী প্রেম অন্তরে নিয়ে প্রার্থনা করেছি, এ অপরাধ যেন আমি আর কখনো না করি। আমার মায়ের প্রেমের অমলদ্যুতি যেন আজ আমাকে স্পর্শ করেছে— সেই আমার সহায় হবে। শান্তিনিকেতনে আপনার কাছে দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেছি যা ফিরে উল্লেখ করা আমার পক্ষে উচিত হয় নি। তখনই তার জন্য লজ্জিত হয়েছি— কিন্তু সাবধান হই নি। এখন আমি এ বিষয়ে সতর্ক হব।

আপনার সঙ্গে নতুন জীবনে প্রবেশের দ্বার ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। আমি দুয়ারে দাঁড়িয়েছি— আপনি আমার হাত ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পুরোনো জীবনের সব বন্ধন শিথিল হয়ে এল। যদি বা কোনো বন্ধন ছিঁড়তে গেলে লাগে, কোনো কোনোটি আপনা থেকে খসে পড়ছে। সুশীল খুশিমনে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর পক্ষে সেটি বড়ো কঠিন ছিল। এখন আমার একমাত্র ভয় আমার চঞ্চল অস্থির প্রকৃতিকে। জানি শান্তি-নিকেতন ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। সেই সংগ্রামে 'শান্তম্' আমার সঙ্গে থাকবেন।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আনত

আপনার চার্লি

১২

ইন্‌ভেরার্ম, সিমলা। ১৫ জুন ১৯১৫

পরমপ্রিয় বন্ধু,

এইমাত্র দার্জিলিঙ থেকে লেখা আপনার চিঠিখানি পেয়েছি। আবার এত শীঘ্রই আপনাকে আর একটি চিঠির ভারগ্রস্ত না করার যে সাধু সংকল্প মনে ছিল, তা মুহূর্তে ভেসে গেল। কারণ এ চিঠিতে আমি কী যে আনন্দ পেয়েছি তা আপনার কাছে কিছুতেই চেপে রাখতে পারব না।

আপনার বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার বেদনা সম্প্রতি তীব্রতর হয়েছে আমার প্রাণে (অবশ্য এটি স্বাস্থ্যলাভেরই লক্ষণ)। আমি তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে কতকটা কৃতকার্যও হয়েছি। প্রতিদিনকার দরকারী চিঠিপত্রের বোঝাই যে আপনার কী প্রচণ্ড ভারী সে আমার অজানা নয়, তাই আজ চিঠি পাবার কোনো প্রত্যাশাই আমার মনে ছিল না। অবশ্য আপনার ভালোবাসার পরিচয় সর্বদা এমন অযাচিত ভাবেই পাই। আঃ এ যে কী আনন্দ! আপনার নিজের মুখে যখন শুনি যে আমার পূর্ণপ্রাণের প্রেম আপনাকে আনন্দ দেয় তখন আমি যেন সুখের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে আবার লজ্জায় ধুলোর সঙ্গে মিশে যাই। শুদ্ধপ্রেম বস্তুটি যে কত আশ্চর্য সহজ ও সত্য সে বিষয়ে আপনি ঠিকই লিখেছেন। ভালোবাসার পাত্রকে যে বড়ো করে দেখি, সে সত্য, সে মায়া নয়। এ কথা অতি যথার্থ। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ব্যাকুলতা, যা আমার জীবনকে মধুরতর করেছে, আপনাকেও দিয়েছে আনন্দ, তা যদি মায়ামোহ হত, তবে জগৎ সংসারের সব মহৎ বস্তুই হত মিথ্যা। কিন্তু এ অসম্ভব, এরকম চিন্তাই হাস্যকর। আজ সকালে আপনার চিঠিখানি হাতে নিয়ে এই বারান্দায় এসে বসেছি। বৃষ্টির পরে সূর্যের আলোয় এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অনুভব করছি আমার হৃদয়াকাশও কত উজ্জ্বল, কত পবিত্র সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমার অন্তর্দেবতার গভীর কণ্ঠস্বর আমায় ডেকে বলছে— আজ যে সুখের স্পর্শ আপনার হাতে পেলাম— তা তাঁরই খুশির দান, তাঁর আপন আনন্দ এতে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উডস্ট্রীটের খালি ঘরখানিতে যে আপনি আমায় দেখতে আসতেন— আমার

সেই আলো-সমুজ্জ্বল দিনগুলি কি আপনার মনে পড়ে? তারই স্মৃতি সারা দিন ধরে সেই ঘরের ফাঁকা দেয়ালগুলিকে পর্যন্ত আলোয় আলোময় করে রাখত।

মৃত্যুর পরেও মৃতব্যক্তির ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এবং পূর্বপরিচিতির নিদর্শনের জন্য ইংরেজ কবি টেনিসনের মনে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসুস্থমনের পরিচায়ক— সে আপনি ঠিকই বলেছেন। এতে করে যে-প্রেম বস্তুতঃ অসীম, তার উপরে সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়। অসুখে পড়ে থেকে এ-বিষয়ে আমি বার বার ভাবছি। সত্য ও সহজ প্রেমের যিনি দেবতা, তিনি একে বন্ধনমুক্ত করতে চান। অবশেষে অহং-এর বন্ধন থেকেও তা মুক্ত হবে। যে আনন্দ সীমাহীন তারই মধ্যে সে তার সার্থক স্বর্গ খুঁজে পাবে। সেই অসীমে পৌছবার প্রয়াসে তার মধ্যে যেটুকু মানবীয়— যা স্থানকালের সীমায় আবদ্ধ তাও অমরতা লাভ করবে। সেণ্ট পলের একটি উক্তির ইঙ্গিত বার বার আমার মনে লেগেছে। তিনি একবার বলেছিলেন 'যীশুর অন্তরেই তোমাদের পাবার যে একান্ত কামনা আমার— তার সাক্ষী স্বয়ং ভগবান।' তাঁর নিজের অন্তরে নয়, মহত্তম প্রেমের অন্তরে।

খ্রীস্টজননী যখন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পুত্রকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন তখন ভগবান যীশুখ্রীস্ট মায়ের প্রতি যে কর্কশ ব্যবহার করেছিলেন—ভাবতে আমার আশ্চর্য বোধ হত। তিনি বলেছিলেন, কেই বা আমার মা? আমার যে-পিতা অমরলোকে অবস্থান করছেন, তাঁর ইচ্ছা যাঁরাই পালন করেন, তাঁরাই আমার মা, আমার ভাই, আমার বোন। আজকাল এই উক্তির অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। এই প্রেম মহত্তর, নিকৃষ্টতর নয়। কেননা পথে যখন বাধা আসে তখন তা ছিন্ন করে চলে যায় এই মহান্ প্রেম। ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায়ও আবার আমরা তার প্রমাণ পাই, যখন তিনি নিজের জননীকে নির্দেশ করে বলেন, দেখ বৎস, ওই তোমার মাতা।

অনুরূপভাবে বুদ্ধের জীবনেও যখন দেখি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন— তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর সুমহান্ অন্বেষণের পথে এঁদের কি সঙ্গে নেওয়া চলত না? অপরিমাণ প্রেমের অধিকারী হয়েও তিনি তাঁদের মধ্যে ফিরে এলেন, তখন আমার প্রশ্নের সমাধান আমি পেয়ে গেলাম। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর শেষ বাক্যটিতে মায়ের প্রতি যে প্রেম অভিব্যক্ত হয়েছে এবং

বুদ্ধের জীবনেরও শেষের দিকে যে পত্নীপ্রীতির প্রকাশ দেখি, তা অন্য যে-কোনো মানবিক প্রেম যা বিচ্ছেদ বা নিঃসঙ্গতার বেদনা বোধ করে নি, তার চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক মহান ও সুকুমার।

গতবার সিমলায় আর গত শরৎকালে দিল্লী ও এলাহাবাদে আমার যে অসুখ করেছিল— তখন আপনার উপস্থিতির জন্য আমার মনে এক অসুস্থ কামনার উদ্ভব হত। শান্তি ও বিরামের পরিবর্তে মন তখন কেমন উতলা হয়ে উঠেছিল। তার চেয়ে আমি এবার অনেক নিষ্কাম হতে চাই। বাস্তবিকই কিন্তু এবার সে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। তাতে মনে অনেক শান্তি পেয়েছি।

বোলপুরে যখন হঠাৎ আমার অসুখ করল, আমি ভেবেছিলাম আপনি দক্ষিণ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন— সেদিন আপনার আকস্মিক আগমন আমাকে অভিভূত করেছিল। তারপরে নার্সিং হোমে আপনি যে আমাকে দেখতে আসতেন— সে সব দিনের স্মৃতিও অমূল্য সম্পদের মতো আমার মনের গভীরে সঞ্চিত আছে। আবার আজকের এই চিঠি— এ সবেতেই আমি এত যে আনন্দ পেয়েছি তার কারণ এ সবই ছিল আমার কাছে অপ্রত্যাশিত এবং এ পাবার যোগ্যতাও আমার নেই। তবু জানি যথার্থ প্রেমের এই তো স্বরূপ।

শরীরে শক্তি ফিরে আসছে অতি ধীরে, কিন্তু অন্তরে যে একটি নব আনন্দের প্রেরণা অনুভব করি, তা নিশ্চয় আপনি টের পেয়েছেন। এ বাড়িটির আবহাওয়াও ভারি শান্তির।

কখনো যদি সিমলা আসেন, এ বাড়িতে এসেই নিশ্চয় থাকবেন। বড়ো শান্ত নিরালা এর পরিবেশ।

একান্ত শ্রদ্ধানুরক্ত
আপনার চার্লি

১৩

পুনা। ২৮ ডিসেম্বর ১৯২০

আপনার জন্য আমাদের সকলেরই মন কত ব্যাকুল। তবু গত চিঠিতে আপনার বিরাট কাজের যে পরিকল্পনাটি জানিয়েছেন, তাতে আমাদের মনেও

উদ্দীপনা জেগেছে। আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি : এই ধরণের বৃহৎ কাজের কল্পনাও এ জীবনে করতে পারি নি, আপনার সে কাজে সাহায্য করতে পারলে যে-আনন্দ আমি পাব, তা প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। আপনি যে-পথ পরিক্রমণ করে চলেছেন, তার প্রতিটি পদক্ষেপে আমার হৃদয় চলেছে আপনার সঙ্গে। এখানে ভারতবর্ষে চারি দিকে যে বিরাট আন্দোলন চলেছে, তার থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখা খুবই কঠিন। তবু এতে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মন তৃপ্ত হয় নি।

আমি উপনিষদের একটি বাক্যের অনুকরণে কেবলই বলে চলেছি 'নেতি, নেতি'। কারণ মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তো এ নয়। তাই যতবার বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে শান্তিনিকেতনের বাইরে যেতে হয়েছে, ততবারই একই ধরণের অতৃপ্তি এসে আমার মনকে অধিকার করেছে। আমি বুঝেছি যে বাহিরের এই পরিবর্তনে বিশেষ আনন্দের কিছু নেই। জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বমানবিকতা বোধে না পৌছনো পর্যন্ত জগতে শান্তি নেই। আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং মুক্ত করবই। কেননা এই পরাধীনতা তার অন্তরাত্মাকে শীর্ণবিশীর্ণ করছে। ক্ষমতার গর্ব করার জন্য নয়, স্বার্থপর কলহে মত্ত হবার জন্যও নয়, আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব কেবল মানবকল্যাণের জন্য। মনের দিক থেকে এখন আমি এতটা ক্লান্ত যে, যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারছি না। তবু এই উৎসবের সময় আমার সমস্ত ভাবনা আপনাকে ঘিরেই ছিল। আপনার কাজে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে আমার মনে যে অপার আনন্দ এল সেই কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় অনুরাগে আমি নতশির হই।

১৪

দিল্লী। ৫ জানুয়ারি ১৯২১

এই চিঠিতে আপনাকে যা জানাতে চাই তা হল অসহযোগ আন্দোলনটি ক্রমশঃ সত্যশুদ্ধ আত্মিক শক্তিতে সুদৃঢ় হয়ে উঠছে। অস্পৃশ্যতার গ্লানি দূর করে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে হিন্দু মুসলমানে ভেদবুদ্ধির অপসারণের জন্য দেশের অন্তর্লোকে উদ্দীপনের আহ্বান এনেছে।

সামাজিক উন্নয়ন এই আন্দোলনের অঙ্গ। একনায়কত্বের ভয়ও দূর হয়ে

গেছে। শ্রীযুক্ত গান্ধী বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবেন, শুধু তাঁর নিজের মতেই একে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান না।

সবচেয়ে আনন্দের কথা ভারতবর্ষের যুবচিত্ত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। মডারেটদের দলে যাঁরা আজও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন নি, তাঁরাও শিগগিরই দ্বিধা কাটিয়ে উঠবেন। সম্মিলিত ভারতের স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলেছে আশা হয়।

গুরুদেব, আমার সমস্ত মনপ্রাণ ইউরোপে আপনার কাছে ছুটে যেতে চায়। উইলি লিখেছে আপনিও তাই চান। কিন্তু এ সময়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই আমার পক্ষে ঠিক হবে না মনে হচ্ছে। কর্মসমিতি একযোগে আমাকে অনুরোধ করছেন যেন এখন চলে না যাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের এই উদ্‌বেল অবস্থায় আমার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ১৯১৯ সালে আপনি আমাকে যখন পাঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন, দেশের অবস্থা এখন প্রায় সে রকমই সঙ্গীন।

১৫

বোলপুর। ৭ জানুয়ারি ১৯২১

আজ ভোরে উঠে সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে দেখতে আমি আপনার উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করেছি, মনে হচ্ছিল যেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক এই অনুভূতির যোগেই বিশ্বপিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমি মিলিত হই। আমার ব্যক্তিসত্তা তাঁর চিরন্তন সত্তার কাছে পৌঁছয়। যখনই মানুষের প্রেম আমাকে এভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে যে মনে হয় আমার সমস্ত প্রকৃতি আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হয়ে গেছে, তখনই বুঝতে পারি আমার অন্তরে বাহিরে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এসেছে—

A sunset touch,
A chorus-ending from Euripides,
And there's an end of all our hopes and fears.

তাঁর যে স্পর্শ, যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত, সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় তারই ক্ষণিকের প্রকাশ। সংগীতেও তার রেশ দুঃখসুখের সীমার পারে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেই রসসৃষ্টির ক্ষমতা আমার কম। তবু তা আস্বাদনের অন্য উপায় জানি। বর্ণে ও রেখার ভঙ্গিতে তা ধরা দেয়, সে বিষয়ে আমার কিছু দক্ষতাও আছে। কবির বাণীর ছন্দেও সেই অপূর্ব রহস্যের ইশারা। সেই আবেদনেই আমার মন সহজে দোলে। সেই একটুকু কথা, একটুকু ছোঁয়াই চকিতে মন মধুর রসে ভরে দেয়। তিনি আসেন, আমাদের কাছে আসেন, আমরাও তাঁকে চাই। তাতেই আমাদের আনন্দ। এ-যে অন্তরের আকূতি, বুদ্ধিতে এর বিচার চলে না।

১৬

২৫ জানুয়ারি ১৯২১

আপনার চিঠিগুলো পেয়ে কী যে আনন্দ পাই, তা আমি বলতে পারি না। এই সপ্তাহে চিঠি পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর যে-চিঠি আমি পেলাম সে আমার কাছে বহু মূল্যবান। আপনি লিখেছেন সুজাতা বুদ্ধকে যে পরমান্নের পাত্র নিবেদন করেছিলেন, সে ঘটনাটি স্মরণ করলে আমাকে আপনার মনে পড়ে। অতি দুর্বল শরীরে যখন শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন এই চিঠি আমাকে কত গভীর আনন্দ দিল, আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারবেন।

১৭

৩১ জানুয়ারি ১৯২১

পূজনীয় গুরুদেব,

শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত হয়েছি। এখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিজেদের পাঠ্যসূচী অনুসারে কাজ শুরু করব। আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই পরীক্ষা-পদ্ধতিটা আমাদের উপর এতকাল ভার হয়ে চেপেছিল।...

অসহযোগ আন্দোলনের দোলা লেগে সারা দেশের জীবনের স্পন্দন আজ দ্রুত অনুভূত হচ্ছে। ছাত্রদের জীবনও যেন উদ্‌বেল প্রাণরসে ভরপুর। তারা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। সকলকে ওরা আশ্চর্য করে দিয়েছে— এমন-কি মনে

হয় ওদের নিজেদের বিস্ময়ও কম নয়। এখন নেতাদের বলছে— আমরা ফিরে যেতে চাই না। আমাদের কাজ দিন, আমরা গ্রামে গিয়ে দেশের লোকের সেবা করতে চাই। এর আগে আর কখনো গ্রামসেবার জন্য এতখানি উৎসুক এমন একটি যুবদল গঠিত হয়ে ওঠে নি। এ খবরে আপনার যে কত আনন্দ হবে জানি। আর এতে সাধ্যমত আমরাও এগিয়ে যাই, এটাই আপনি চাইবেন, তাও জানি। আমরা সকলে একমত হয়ে সমিতিতে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি যে, স্কুলকে গ্রামোন্নয়ন শিক্ষার কেন্দ্র করা হবে।...

আজ সকালে বোলপুর স্কুলের কয়েকটি বড়ো ছেলে আবার আমাকে এসে বলল, তারা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে আর চলতে চায় না, নিজেদের স্কুল নিজেরা গড়তে চায়। তারা জানতে চাইল, এ ব্যাপারে কি তাদের কিছু সাহায্য করতে পারি? যদি তাদের চেষ্টা সার্থক হয়, তবে কি তারা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত হতে পারে? এতে বিশ্বভারতীর ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবার সম্ভাবনা দেখে গৌর[১] আর অন্য শিক্ষকরা অনেকে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমিও এ বিষয়ে খুব উৎসুক। 'গুরুদেব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর'— এই মন্ত্র জপ করার দলে আমি নেই। তবু আমি বুঝি যে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার নিজস্ব নতুন আদর্শটিকে আপনা থেকে গড়ে উঠতে দিতে হবে। যদিও এ ধরণের কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব, কিন্তু আপনি ফিরে আসার আগে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে রকম নিশ্চিত পরিণত যোগাযোগ গড়ে তোলাও ঠিক হবে না। তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে আপনার কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। শুধু শিক্ষার দিকে নয়, গ্রামোন্নয়নের কাজেও শান্তিনিকেতন সমগ্র দেশের সত্যকারের কেন্দ্র হবে।

আজ একটি ছোটো ঘটনায় খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনি জানেন বোধ হয় বাঙালী ছাত্ররা আগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসে খায়। কিন্তু গুজরাটি ছেলেদের খাবার ঘরে এখনো আমি ঢুকি নি, কারণ কারো মনে আঘাত দিতে আমি চাই না। আজ সন্ধ্যায় এই প্রথমবার গুজরাটি ছাত্ররা এসে তাদের সঙ্গে খাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করল। এটি বড়ো কম সংস্কার নয়। মনে হচ্ছে আমাদের সব চেষ্টা এতদিনে সার্থক হল।...

---

১ গৌরগোপাল ঘোষ

এ বছরে আমার আর আপনার কাছে যাওয়া হল না। না যেতে পারার সবচেয়ে বড়ো কারণ হল, আপনি ফিরে আসার আগে প্রতিদিনের যত্ন দিয়ে আশ্রমকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাছাড়া আমার যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সময় তা এখন কলকাতার ছাত্রদের জন্য দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের কথাও ভাবতে হবে —কেউ জানে না কোন্ মুহূর্তে এখানে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে। এপ্রিল আর মে— এ দুটি মাসই বিশেষ সংকটের সময়।

১৮

বোলপুর। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আপনার চিঠি পড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ যে পাই, সে আমি কথায় বলে বোঝাতে পারব না! আপনার নিগূঢ়তম হৃদয় আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। তাতে আপনাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারছি। আমার প্রতি যে কত আন্তরিক আপনার ভালোবাসা, তাও অনুভব করি। প্রতিদিনের জীবনে যত সংঘর্ষ আসে তা উত্তীর্ণ হবার জন্য এই আশ্রয় আমার বড়ো দরকার।...

আমার চিঠিতে আমি কেবল আশ্রম সম্বন্ধেই আপনাকে লিখি, আর তাই আমি লিখে যাব, কারণ তার সঙ্গেই এখন আমার জীবনের যোগ। তাছাড়া জানি যে আপনিও আশ্রমের খবর জানবার জন্য কতখানি উৎসুক হয়ে থাকেন। কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্র পার হয়ে দ্রুত চলে যায়— আপনি কেমন আছেন, কি করছেন, কিভাবে আপনার বাণী প্রচারিত হচ্ছে এমন সব চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন থাকে।...

স্কুলের নতুন কর্মসূচী তৈরি হয়েছে। দেখছি এত বছর যা মনে ভাবা হয়েছে, অথচ হয়ে ওঠে নি, এখন তা করতে পারব। যেসব বিষয়ে মাথার পরিশ্রম দরকার সেগুলি সকালে কার্যসময়ের ছয় পর্বের মধ্যে শেষ করা যাবে। বিকেলের পর্বগুলিতে কেবল শিল্পকলা সংগীত বিজ্ঞান এবং হাতের কাজ শেখানো যেতে পারে। এরই মধ্যে সুতো-কাটা আর তাঁত বোনার কাজে যতটা উন্নতি হয়েছে— তা আশাতীত।...

পুরোনো সংস্কার সহজে মরতে চায় না। আমি যা ভয় পাচ্ছি তা হল নতুন স্কুলগুলো পাছে পুরোনো স্কুলেরই নবতর অথচ অপকৃষ্ট খেলো সংস্করণ

হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই আমি যে শুধু ছাত্রদের প্রেমোন্নয়নের শিক্ষা দিতে চাই তা নয়, বরং শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের আপনার অন্তরের এ কথাটি বুঝতে সাহায্য করতে চাই যে, বিদ্যালয়ের শুকনো পুঁথির বিদ্যায় ছাত্রদের ক্ষুধা মেটে না— সৃষ্টিকর্তার যে অমৃতময় বাণী স্থলে জলে আকাশে সঞ্চারিত— পাত্র ভরে তা গ্রহণ করাতেই তাদের অন্তরের পুষ্টি নির্ভর করে।

১৯

বোলপুর। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আশ্রমের দারিদ্র্যই যে আমাদের গর্বের সম্পদ ও বিধাতার মহত্তম আশীর্বাদ— সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি এক মত। এই বছরে আমাদের সকলকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এই অর্থাভাব। এমন কঠিন সময়ও গেছে যখন খুব দুশ্চিন্তায় কাল কাটাতে হয়েছে। কিন্তু আমরা একযোগে মিলে মিশে সে কষ্ট বহন করেছি, তা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপই হয়েছে। আমিও আপনার মতো দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সংগতি, তাকে ভয় পেতে শুরু করেছি। শুধু আশ্রমের অর্থসংস্থানের জন্যই যদি হত, তবে আপনার পশ্চিমে যাওয়াটাই বৃথা এবং নিরর্থক মনে হত। কিন্তু আপনার পাশ্চাত্য ভ্রমণের আরো বড়ো কারণ তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই জার্মান ভদ্রলোকটির চিঠিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, পশ্চিম আপনাকে চায়, এবং প্রীতিশ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছে। আপনি তাদের গুরুর মতো ধর্মপথে নির্দেশ দিতে পারেন, বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারেন। 'Poet's Religion' প্রবন্ধে আপনি যা বলেছেন, তা যদি আরো নানাভাবে বার বার ওদের শোনাতে পারেন, তার ফল ভালো হবে। পশ্চিমের আজকের দিনের সব সমস্যার সমাধান ওতে রয়েছে। কী অসামান্য বিশ্ব-উদ্‌বোধন ভাষণটি। যতবার পড়ছি, ততই গভীরভাবে তার সত্য উপলব্ধি করছি, আমার প্রাণলোকে তা প্রবেশ করছে। জানি এখন থেকে সেই ভাবটি আমার অন্তরে গাঁথা থাকবে।

২০

বোলপুর। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আরাধ্যতম গুরুদেব,

আমাদের পাশ্চাত্য হিসাবে আজ আমার বয়স পঞ্চাশ বছর হল, আরো সঠিক প্রাচ্য গণনাতে হল একান্ন। আজ সারা সকাল বারেবারেই আপনাকে স্মরণ করেছি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর এই-যে কটা বছর কেটে গেল, এর মধ্যে আমার জীবনটা এতই বদলে গেছে যে তাকে আর চেনাই যায় না। সেজন্য আপনার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী ও অশেষ কৃতজ্ঞ। বছরগুলো কেমন যেন উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে বটে, কিন্তু সে বাইরের; তাতে বরং আমি আপনার আরো ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি। সর্বদা কাছাকাছি থাকলে ততটা হওয়া সম্ভব হত না। এই সময়টুকুর মধ্যে অনেক ঘটনা, অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু জীবনের কেন্দ্রে সর্বক্ষণ গভীর শান্তি বিরাজ করেছে। তাই আপনাকে প্রথম দেখার সময় আমার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংশয়ের ও প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা এখন স্তব্ধ হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেণ্টে যে একটি মুক্তির গান (Psalm of Deliverance) আছে, তাতে একটি কথার ধুয়ো বারে বারে গাওয়া হয়— 'প্রভুর দয়ার জন্য মানুষ যেন চিরকাল তাঁর মহিমা কীর্তন করে।' সেই গানখানি আজ সকাল বেলাটিতে আমার মনে অনবরত বাজছে। তার মধ্যে এক জায়গায় আছে—

তাঁর আদেশে ঝড়ের হাওয়া বয়ে যায়।
শক্তির দম্ভে যারা ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে যায়,
সমুদ্রের গভীর তলে প্রবেশ করে,
বিপর্যয়ে তাদের চিত্ত দ্রব হয়।
তখন তারা কাতর হয়ে প্রভুর শরণ নেয়,
প্রভু তাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করেন।
তিনি ঝড়কে শান্ত করেন।
তারাও তখন বিশ্রাম লাভ করে আনন্দ পায়,
এমনি করে তিনি তাদের নিজ আশ্রয়স্থলে ফিরিয়ে আনেন।
তাই, মানুষ যেন চিরকাল করুণাঘন প্রভুর যশোগান করে।

শান্তিনিকেতনে আমি আমার আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছি, আর পেয়েছি, ঝড়ের পরের শান্তি। তাই আজ সকালে আমার প্রভুর দয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আপনার কথাও আমার মনে পড়ছিল। আপনিই আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, গত কয়েক বছর ধরে কত আশ্চর্য আশীর্বাদই না আমাকে করেছেন। তাছাড়া যে ভারতবর্ষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, পাশ্চাত্যের মতো উপকরণ বাহুল্যের ঔদ্ধত্যে এখনো কলুষিত হয় নি, সেই ভারতের মতো দেশে এই যে আমার নূতন জন্ম, সেও কি কম সৌভাগ্যের কথা ? সে কথা আজ আমি আবার একান্তভাবে অনুভব করলাম। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ এর আরাধনায় মাথা নত করে আজ সারা সকাল এসব কথাই ভেবেছি।

আর এই শিশুরা যারা যখন খুশি আমার ঘরে আসে, আমার বারান্দায় খেলা করে, তাদের বন্ধুত্বও আমাকে ভুলিয়ে রাখে যে বছরে বছরে আমার বয়স বাড়ছে। ফাল্গুনী নাটকের বসন্তের 'ফিরে ফিরে নতুন' হওয়ার মতো আমাদের এই আশ্রমটিও কখনো জীর্ণ হয় না, কোনোদিন ম্লান হয় না। এমন-কি আমার ঘরের বাইরেকার বেণুকুঞ্জের গাছগুলি পর্যন্ত নূতন সাজে সেজেছে। এদিকে শালগাছগুলিও তাড়াতাড়ি খসিয়ে ফেলছে তাদের লাল সোনালি পাতার চকমকে আভরণ— নবীন কিশলয় যে ফুটে বেরোল বলে। আবার এই একই সপ্তাহে জাদুকর, সাপুড়ে আর সার্কাসের দল— ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে কেউ লাফাচ্ছে, কেউ নাচছে, কেউ গাইছে— সারা রাস্তা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাইতে গাইতে আশ্রমে ফিরে এসেই একছুটে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে বলছে, সাদা ঘোড়াটা কেমন করে আগুনের গোলার ভিতর দিয়ে ছুটছে আর লাফাচ্ছে, তবু তারই পিঠের উপর ঘোড়-সওয়ার সোজা দাঁড়িয়ে রইল! তারপরে আবার ঘোড়াটা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দু'খানি দিয়ে কি ভাবে সার্কাস ম্যানেজারের গলা জড়িয়ে ধরল— এ রকম আরো হাজারো ঘটনা। একান্ন বছরের জন্মদিনে যার জীবনে এতগুলো ঘটনা ঘটে তার দেহ থেকে শীত-বুড়োর সাদা আলখাল্লাটার মতোই জরা কখন আপনি খসে পড়ে যায়— আর দেখা যায় ঋতুরাজ বসন্তেরই মতো চিরনবীনের দূত সে।

২১

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

ছেলেদের পক্ষে কী দিনই সব যাচ্ছে! প্রথম তো এল জাদুকর। আমরা সবাই গিয়ে দিনুর বারান্দায় বসলাম। দিনু ছেলেদের সকলকে ডেকে এনেছে, ও নিজেই দেখাবার খরচ দেবে। কুমড়োর গড়নের বাঁশিটির বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সাপের খেলা যখন শেষ হল, তখন সে নানারকম হাতের কৌশল দেখাতে শুরু করল। কখনো মুখ দিয়ে আগুন বের করছে, কানের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া। ভয় ও বিস্ময়ের পুলকে-ভরা কী উদ্‌গ্রীব শিশুদের মুখগুলি! হঠাৎ সকলের চমক লাগিয়ে দিনুর ও আরো কয়েকজনের পিঠের দিক থেকে টাকা বের করে আনল। তারপরে আবার জাদুকরের জামার আস্তিনের ভিতর থেকে একটা খরগোসও বেরোল। কৌতূহলী ছেলেরা কেউ কেউ ঘুরে গিয়ে ওর পিছনে দাঁড়াতেই লোকটি বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল। তারপর বল নিয়ে পিরিচ নিয়ে আরো নানা রকম জাদুর খেলা— ছেলেরা প্রাণ ভরে এসব দেখে নিল।

এর মধ্যে আবার একটা কথা আপনাকে লিখতে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি। আমাদের এখানে একটি বিবাহের অনুষ্ঠান হল। পুরুত হলেন নেপালবাবু আর আশ্রমের সকলেরই রাতে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। একই দিনে জাদুর খেলা আর বিয়ে— ভেবে দেখুন একবার, সে কত মজা! সুধাকান্তর ভাগ্নী পারুল হল কনে, আর কলকাতার একটি তরুণ (ভারি লাজুক ছেলে) হ'ল বর। খুব খাওয়াদাওয়া হল। হঠাৎ রাত একটায়, আমি তখন সবেমাত্র শুয়েছি, অনিল এসে ডাকল। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত মিশ্রজীর পেটে ভয়ানক ব্যথা। ব্যাপার হল খাওয়াটা তাঁর পক্ষে একটু অতিমাত্রায় হয়ে পড়েছিল। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম গুরুদয়াল মল্লিকই হবে হয়তো। তা কিন্তু নয়, সে খুব ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। এভাবে সুখ দুঃখের নানারঙে মেশানো আমাদের এখানকার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কী অবাধ সহজ আনন্দের আবহাওয়ায় আমরা বাস করি, পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি পাওয়া যায় কি?

সন্তোষ আর আমি এখন স্কুলের নতুন দৈনিক কার্যসূচী প্রস্তুত করা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। আশা করছি শিগগিরই আমরা বর্গগুলি ঠিকমত ভাগ

করে নেবার ব্যবস্থা করতে পারব। তাতে কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে। প্রতি বিষয়ের জন্য ছাত্রদের বিভিন্ন বর্গের ব্যবস্থা হচ্ছে। তাতে উপরের বর্গে গিয়ে পিছিয়ে-পড়া ছাত্ররা মুখ হাঁ করে, মগজের কাজ বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারবে না। যেমন ধরুন, আভাসের মতো ছেলে, অঙ্কে নীচের বর্গে থাকবে আর ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোলে উপরের বর্গে থাকবে। সংস্কৃতে হয়তো উপরের বর্গে থাকবে, আবার বাংলায় হয়তো নীচের বর্গে থাকবে। আপনি ফিরে এসে এই ব্যবস্থা সমর্থন করবেন জেনে আমরা এটা করে যাচ্ছি। আগেও এ ধরণের একটা ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেটা কাজে লাগানো হয় নি। ইংরেজীর উপর জোর দিয়েই ক্লাস ভাগ করা হয়েছিল, যেন ওটা একমাত্র পাঠ্য বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার একটি কুফল হল এটি।

আগেকার যেসব স্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হতে চায় তাদের অনেকে এখন সাহায্যের জন্য অথবা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য চিঠিপত্র লিখছে। তাদের পরামর্শ দেওয়া ও অন্যান্য সব বাপারে সাহায্য করায় আমাদের খুব পরিশ্রম করতে হবে। অধ্যাপনায় ও অভিজ্ঞতায় বিশ্বভারতী সমৃদ্ধতর হবার আগে এবং আপনার প্ল্যান আরো স্পষ্ট হবার আগে affiliation এর কাজ আমি শুরু করব না। আমরা যাই করি, নিখুঁতভাবে করব, কাঁচা কাজ কিছুতে নয়। আমার ধারণা জাতীয় শিক্ষার নামে অনেকগুলো সস্তা, খেলো, বিবেচনা বর্জিত প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষকের বেতন দেবার ব্যাপারে বোধ হয় বিবেচনা বোধের সবচেয়ে বেশি অভাব দেখা যায়। সে সবের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ যেন না থাকে।...

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উঠিয়ে দেবার সব বাধা দূর হয়ে আশ্রমে আমরা সবাই বেশ স্বস্তি পেয়েছি। এ ব্যাপার আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে বরং আরো মিলিয়েছে দেখছি। অন্যান্য স্কুল কলেজ এখন কত সংকটে পড়েছে। ছাত্র শিক্ষক সব চলে যাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে কেউ তো যায়ই নি, বরং অভিভাবকরা ছেলেদের এখানে পাঠাবার জন্য আরো বেশি উৎসুক হয়েছেন।

২২

কলিকাতা। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

ইউরোপে আপনার কাছে যাবার জন্য মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। কিন্তু এখন আশ্রমে থাকার প্রয়োজন আমার পক্ষে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। কি করে যে এই অবস্থায় আশ্রম ছেড়ে যাব বুঝতে পারছি না। ছাত্র-আন্দোলনের এই সংকট-মুহূর্তে যখন প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য যথারীতি পালন করার উপর সমস্ত নির্ভর করছে, তখন যদি ইউরোপে চলে যাই, তবে আমার মনে হবে যেন কর্তব্য ছেড়ে আমি পালিয়ে রইলাম।...

তাছাড়া যে নতুন কাজে হাত দিয়েছি তাতেও এখন খুব আশা ও উৎসাহ পাচ্ছি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব ব্যাপার ঘটছে। এবার আমার বিশ্বাস হচ্ছে, আপনি একলা যে-কাজ এতদিন করে এসেছেন তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। এবার তার বীজ কঠিন মাটির আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসবে আর তাতে আশানুরূপ ফলও ফলবে।

মাত্র দু'দিন আগে যা ঘটে গেছে তার একটি বর্ণনা আপনাকে দিই। খুব ভোরে নেপালবাবু এসে বললেন, সেদিন সন্ধ্যায় যেন একবার সুরুলে যাই। সেখানে তাঁর ছাত্র ও কর্মীর দল উপস্থিত থাকবেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলাম, পাঁচটার সময় সুরুলে পৌঁছে দেখি, একটি বড়ো খোলা মাঠে গ্রামের সবাই জড়ো হয়েছেন। মাঝখানটায় দিনু, তেজেশ, পণ্ডিতজীকে নিয়ে আমাদের গানের দল বসেছে, সকলে মন দিয়ে গান শুনছে। সেখানে গ্রামের ভদ্রলোকরাও গেছেন, সব মিলে মিশে বসে গেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে চমৎকার একটি একপ্রাণতার ভাব দেখা গেল। নেপালবাবু আমাকেই প্রথম কিছু বলতে বললেন। পরম উৎসাহে আমি তাঁদের বোঝালাম, কী করলে স্বরাজ এখনই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বললাম, তা পেতে হলে ভিতর থেকে কাজ শুরু করতে হবে। সবচেয়ে আগে বর্জন করতে হবে সুরাপান, যার জন্য সুরুল গ্রাম আজকাল কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান, উঁচু জাত নিচু জাত— সকলকে এক সঙ্গে মিলতে হবে। আমরা শিক্ষিত লোকেরা এখন এ বিষয়ে যতটা পারি সাহায্য করতে উৎসুক। আরো আগে যে তা করি নি, তার জন্য আমরা লজ্জিত।

কিন্তু এখন থেকে স্বরাজ যে আমাদেরই হাতে তা প্রমাণ করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।...

২৩

হাওড়া স্টেশন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

...আমেরিকায় আপনার কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছি তাতেও লিখেছি, আবারও লিখছি; আমার খুব আশা হচ্ছে, এতকাল আপনার যেসব কথা শোনার লোক পান নি, এখন সেই সব আদর্শ নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহী কর্মী অনেক পেয়ে যাবেন। আমাদের আশ্রম এবার তার সত্যকারের কর্তব্যবোধে জাগ্রত হয়েছে, আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররাও কাজে যোগ দিয়েছে। ক্ষিতিমোহন-বাবু নেপালবাবু আর শাস্ত্রীমশায়ের নেতৃত্বে আমরা সবাই এই জেলার গ্রাম সংগঠনের কাজে মিলিত হয়েছি। সুরুলের ওই সভাতে সব জাতের লোক গিয়েছিলেন। গানের দল নিয়ে দিনুও ছিল। এই ভাবে আনন্দে আমাদের গ্রামের কাজ শুরু হল।...

২৪

বোলপুর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

গত দুই ডাকে দু'খানা বড়ো বড়ো চিঠি বিলেতে পাঠিয়েছি, কারণ জানি না এখন আপনি কোথায় আছেন। যাই হোক, আপনি সেখানে ফিরে গিয়ে সেগুলো পাবেন আশা করছি। গত রাতে আমাদের পূর্ণিমা উৎসব শেষ হয়ে গেল। আমার ধারণা আগে যত উৎসব হয়ে গেছে, তাদের সবার চেয়ে এটি সুন্দর হয়েছে। আমাদের সকলের মনে কেবল একটি বেদনা ছিল—সেটি হ'ল— আপনি সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। আমার মনে তা এত গভীরভাবে বেজেছিল যে আমি যেন সেখানে বসে গাছপালার মধ্যে আপনার মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছিলাম, এক একবার মনে হচ্ছিল আপনাকেই যেন দেখতে পাচ্ছি। ছেলেরা শেষপর্যন্ত তাদের মঞ্চের জায়গা পরিবর্তন করেছিল। গৌরদার ঘরের বাইরে শালগাছের নীচে স্টেজ করে সেখানে

ফাল্গুনী নাটকের গান আর অভিনয় করল। আমাদের শিল্পীরা আর আশ্রমের মহিলারা সামনের প্রাঙ্গণে বেশ বড়ো গোল করে একটা সুন্দর আলপনা দিয়েছিলেন। সেটা ঘিরে আমরা বসেছিলাম। এবার গানের দলে অনেক মেয়ের গলা ছিল। চন্দ্রালোকিত রাত্রে সে সুর কী যে অপূর্ব মধুর শুনিয়েছিল কী বলব! দিনুর এবারকার গানের তুলনা ছিল না। অনাদি[১] আর সন্তোষের বোন বাসু[২]ও চমৎকার গাইল। সমস্ত দৃশ্যটাই হয়েছিল অপরূপ। মরিস[৩] আমাকে বললেন, শান্তিনিকেতনে না এলে জীবনের একটি নিষ্কলুষ আনন্দ সম্ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম। সেটি হল— গুরুদেবের গান শোনা ও সেই গানে যোগ দেওয়া।

উৎসবের পরে আশ্রমের মহিলারা খাবার আয়োজনও করেছিলেন। চাঁদের আলোয় বাইরে মাটিতে বসে মহানন্দে আমাদের রাতের খাওয়া হল। মীরা তো খুব খুশি। এ দিনটি ওর জীবনেও বিশেষ একটি আনন্দের দিন।

শিল্পকলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী— এ সব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্যও অজস্র দরখাস্ত রোজ আসছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেককে কাজে নিতে পারছি না। যাই হোক, সব দিক থেকেই মনে হচ্ছে, এতকাল যে বীজ আপনি ছড়িয়ে গেছেন, এবার তার ফসল ফলবে।…

২৫

১১ মার্চ ১৯২১

…এটা ঠিক যে পুরোনো অভ্যাস ও সংস্কারের বেড়া ভাঙছে। ভারতবর্ষে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে। এই সংকটকাল আসার আগে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেখানে আর ফিরে যেতে পারে না। একদিক থেকে ধরতে গেলে এ ভালোই। আপনিও স্বীকার করবেন— কারণ, আপনার

১ অনাদিকুমার দস্তিদার

২ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী

৩ হিরজিভাই পেস্তোনজি মরিসওয়ালা নামে এক পার্সি যুবক বোম্বাই হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি মরিস নামে চলিত ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষা পড়াইতেন। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৭১

'অচলায়তনে' এই পরিবর্তনেরই আপনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আজকের দিনে ভারতের দুর্ভাগ্যের কারণ হল, বহু শতাব্দীর জীর্ণতার ফলে জীবনধারা এখানে অতি মন্দগতি, ক্ষীণ ও সংকীর্ণ। তাই মুক্তিসাধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্যাগস্বীকারের ভয় ভাঙিয়ে রুদ্র যখন আজ তাঁর ধ্বংসের কাজ সাঙ্গ করছেন, তখনো দেশে নতুন যুগকে বরণ করে নেবার শক্তি কোথায়? তাই এই আকস্মিক প্রয়াসের প্রচণ্ড ঢেউ উঠেই পাছে মিলিয়ে যায় সেই ভয় হয়।…

২৬

বোলপুর। ১৯ মার্চ ১৯২১

…উইলি পিয়রসনের চিঠিগুলো সব পেয়েছি। তার সঙ্গে আপনার A Cry For Peace নামে চমৎকার প্রবন্ধটিও পেয়েছি। সেটি গভীরভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করেছে আর তার কথাগুলি যে যথাযথ তা এখানে থেকেই প্রতিদিন অনুভব করছি। শক্তিমানের যে-ভার তাই তাকে নীচে টেনে নামায়— এ কথা বোঝাবার জন্য চোরাবালিতে পড়া হাতির সুন্দর উপমাটি আপনার ছাড়া আর কার কল্পনায় আসত? বড়দাদাকে লেখাটি আমি পড়ে শুনিয়েছি, শুনে তিনি অভিভূত হয়েছেন। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, আপনার যে-কাজ তা বৃহৎ বিশ্বের ক্ষেত্রে অবারিত হবে, তা কেবল জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না। আর বর্তমান ভারতের অস্থির চাঞ্চল্যেও তার অবসান হতে পারে না, ভবিষ্যতের দিকে তার গতি।…

৩. এণ্ডরুজ এবং তাঁর মাতাকে লেখা গুরুদেবের অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি

১

To Andrews' mother.

I am sure you know me though I never met you.

Your son is more than a brother to me and his love for me is one of the most precious gifts that fell to my share in this world.

I am asking my publishers to send you a copy of the Crescent Moon containing the English translation of my Bengali poems about children.

I shall be glad to know that you have received them and to get your blessings in return.

Yours reverently.[১]

২

August 8, 1918

Our people are in danger of forgetting that God's love —like His rivers, flows from the West as well as from the East.

We are apt to think that it is only a kind of historical Nor'wester that has burst upon us from the West— the terrible rush of the powerful into the vacuum created by the weak. It has been given to you, my friend, to bring to us the glad assurance that God's love has its living source in the West also.

Witnesses of this love are needed much more than dispensers of social benefit, political rights and administrative efficiency.

People lay more stress on preaching doctrines than on

giving love, and its effect is like having very strong winds without getting a drop of rain.

Very often winds carry seeds, but of what use are they when there is this drought?

'Love is enough'— it contains everything that is needed. This precious gift you have brought to our boys unasked and they will never forget it in their lives. It will open their hearts and make them ready to receive the best that the West can give them.[২]

৩

Ramgarh
May 27, 1914.

Your letter of this morning has given me a deep joy.

We, every one of us, have birthdays of our Great Mother in our hearts, days when we become fully conscious of Her birth in our lives— and for aught I know I am celebrating that event in the quiet of these hills.

I hope I am ready with my presents, which have been kept secret to me, not to my mother. With the morning light they will be discovered at her door, and I for the first time in my life shall know what I have for my offerings to my Mother.

You will find me in this place when you come— for I have not the heart to move from here.

It has grown into my life with its wonderful profusion of roses, its procession of sunny hours and the intimate dark of its nights.[৩]

১-২ ডায়ারি থেকে উদ্‌ধৃত

৩ দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ২, ৯নং চিঠি

৪

Santiniketan, 1915

My dear friend,

Your ideas about my religious attitude as expressed in your letter to the lady in Lucknow are in the main right. There is just one point which should be explained more clearly— and that is about suffering God,

The infinite must have its wants and sufferings but at the same time we have a strong invincible feeling that they should not be there at all. Our love has its true meaning in this, that it is ready to suffer in order to alleviate and to eradicate sufferings. That is to say, underlying our love there is the faith that suffering is not final. We cross it, in order to leave it behind us in reaching our goal.

Where, then, do we reach our goal where suffering is not real ? It is in the Infinite, that is in God. If we say, and absolutely mean it, that God is suffering, then we must accept suffering itself as Ultimate. Then love loses its true meaning where it is stern in its determination to fight pain ; and your proposal to go to visit the Fiji Islands becomes not only absurd, but immoral. For if suffering in itself is good and God-like then it should be cherished at all costs and Fiji Islanders should be left to suffer.

But our goal is from the finite to the infinite, from ignorance to knowledge, from suffering to joy. If imperfection, ignorance and pain have their place in the infinite, then all our hopes and strivings are a lie and a delusion.

This creation seems to me to be a game of hide-and-seek. God loses Himself in the finite and finds Himself back in the Infinite. In this eternal rhythm of existence God represents the crest of the wave in the light and we the bottom in the dark. He comes down to us, and we rise up in Him. There is the opposition in us of darkness and light,

yet there is the harmony of continuity. We belong to the negative pole, but in the positive pole is our ultimate significance. Therefore we know that our ignorance is not eternal. It is always rising up to the highest knowledge which is God.

The same is true about our suffering. It is the negative side of existence, therefore its eternal direction is towards Joy, which is God.

Therefore, as finite beings, our Sadhana should be to fight pain and imperfections with all our might. Yet keeping our serenity of mind, knowing that in the Infinite they are, as it were, naught. Our activities are in this finite world, but our fulfilments are in the Infinite— like the lotus whose roots are active in the dark depths of the Earth but whose flower is in the open sky.

All through our career of pain our faith must blossom up in perfect joy and beauty defying suffering and death, because our faith is of the Infinite as our striving is of the finite— our negative side is the Maya : our positive side is the reality.

The problem is a difficult one and we do not come to any solution of it by sticking to any creed of any sectarian theology. Let us live truly. Let us feel God in our life— gradually know Him and express Him as much as lies in our power.

Let us act where there are sufferings ; let us have faith where there is the God of all sufferings— then we shall be perfect, having both human and divine in us.

Yours ever,
Rabindranath Tagore

৫

Santiniketan
December 18, 1918

Dear friend,

You are doing great work in a wide field of activity— and your being associated with our Ashram makes it possible for us to appropriate some part of your merit to ourselves with pride and gladness. I feel ashamed even silently to fidget in my mind about our small daily needs awaiting your help Please never try to hasten back as long as your service is required elsewhere. Only let me know the fate of those unfinished text-books for which three of our classes are waiting. So long I have kept them on holiday ration, but the full measure will soon have to be restored and I am anxious to know if you have in stock some few pages of lessons— enough to begin our work with. But where are they, if they *are* in existence, among what hopeless huddle of disarray— in which of your pockets or bags or drawers or any other mysterious shelters for disappearance— the special creation of a sublime absent-mindedness ? I am afraid of making a search only to add to the confusion, only to discover my own limitations among the unlimitedness of the undiscoverable. But *do* give us some clue to their whereabouts— if the clue is in your possession. However, we can wait in peace till after the Christmas if we are assured that the supply will not fail us when the demand becomes imperative And in the meanwhile go on with your mission and earn the blessings of the helpless and the poor through whom God's own blessings may reach you.

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore

The Calcutta Macmillans have been making enquiries after you— they have lost your track.

Sept 25, 1920

Dear friend,

We are in Holland and Pearson has joined us. Since I came to this country I have been hearing a great deal about Java and especially Bali Island. The relics of the true history of India are outside India. For our history is the history of ideas, of how these, like ripe pods burst themselves and were carried across the seas and developed into magnificent fruitfulness. Therefore our history runs through the history of the civilization of Eastern Asia. To study a banyan tree you not only must know its main stem in its own soil, but also must trace the growth of its greatness in the further soil, for then you can know the true nature of its vitality. The civilization of India, like the banyan tree, has spread its beneficent shade away from its own birthplace. Let us acknowledge it, let us feel that India is not confined in the Geography of India— and then we shall find our message from our past. India can live and grow by spreading abroad— not the political India but the ideal India. Our Santiniketan is for that mission. We must fully know this Ideal India and then will come the time when we shall be able to carry her abroad and once again her history will find its fulfilment in the present age. Our modern politics has come to tempt us with its prospect of power— but let the spirit of our Maitreyi find its voice in our Ashram, and say again and again 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ।' With love,

Ever yours,
Rabindranath Tagore

৭

Hotel Algonquin
New York
Jan 7, 1921

My friend, it has given me great consolation to read in your letter what Mahatmaji is doing in the way of constructive work— such a positive programme of duties requires no special stress of necessity to justify itself. The stars light up their flames not because of the despair at the sun's absence, but because it is their nature to shine.…

The word non-co-operation still chokes me. I cannot get over the shame that it carries. It will always proclaim the fact that our co-operation came to us by a road of ignominy ;— that it missed its true route and did not enter into the heart of our country through the great triumphal arch of love. I have ever cried myself hoarse in trying to convince our people that self-government for us is simple, like the eyesight to the eyes— it is already there, only the lids have to be opened. The most vitally valuable part of self-government is the 'self'. Borrowed self-government is fettered self-government— it has the open road, but not the free legs. And yet what was it that hindered us to take upon ourselves the full responsibility of our own education, sanitation, prevention of crimes, and such other duties that God Himself, and not Montagues or British Parliaments, had given us to perform entirely according to our own way? The sacred responsibility had been lying before our door wearily waiting, not for any passing of a bill, but for real sacrifice from ourselves. The power is there where there is right and where there is dedication of love. It is a *maya* to imagine that the gift of self-government is somewhere outside us. It is like a fruit that the tree must produce itself through its own normal function, by the help of its

inner resources. It is not a Chinese lantern, flimsily gaudy, that can be bought from a foreign second-hand shop to be hung on the tree to illuminate its fruitlessness. All this I had tried to explain in my 'Swadeshi Samaj'— and when I found that nobody took me at all seriously and pedants discovered, to their utter disgust, discrepancies between my proposal and some doctrine of John Stuart Mill, I took up unaided my village organisation work which at the present moment is throbbing out its last heart throbs in a remote corner of Bengal. Certainly I was more successful in writing the song on that occasion—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

Of course, turning out songs is my proper work. But those who are unfortunate cannot afford to limit their choice to the works they can do, they must also bear the burden of tasks they cannot do.

And therefore I must think of the Shanti for my Shantiniketan and also for the expenditure of the Niketan, its iron, timber and bricks. With love,

Ever yours,
Rabindranath Tagore

৮

Feb. 7, 1923

Dear friend,

Lately you looked so distracted and seemed unhappy that it has made me anxious for your sake since you left this place. I always earnestly wish that you can have inner peace amidst your multifarious burden of works. But I find you are very cruel to yourself and you never allow any time of the day to remain unoccupied when you can come to your deeper self. Thus weariness grows and your mind's atmosphere is filled with self-torturing thoughts and

imaginings. A great part of your mind's burden consists of useless refuse and fragments of daily cares which have to be swept away at least twice a day in order to enable you to maintain the clearness of life's perspective. I am by nature impatient, anxious and often fretful and therefore I never wish to miss the daily opportunity of coming into touch with the Truth which is Peace. It has saved me so long from utter breakdown, from the tyranny of the insignificant, from the fetters of the fragmentary. The load of the immediate needs and the distractions of miscellaneous at once lose their weight when you can bring them to the Eternal. I am perfectly aware that you know all this and therefore in spite of my intense desire to help you I fail to do so. Some cyclonic hurricane of activity drives you from one point to another through a maze of duties. It is your nature, and your mind, because of its amazing amount of vitality, wants all at once to apply its energy to all different directions. But everyday you are wearing yourself out, not because you work too hard, but because you do not concentrate some part of your energy inwardly for the purpose of maintaining a centre of utter calm in the whirlwind of your work. I believe in *yoga*, not only for attaining spiritual truth but for keeping up the equilibrium of life that helps our energy to sustain its rhythm which is the harmony of work and rest. Yoga is the transmutation of our dynamic self into the static peace for some time, in order to create that lucid serenity which is the mirror of the Eternal.

I have been ill for some time. A touch of influenza. I am well now and am preparing for the Spring Festival in Calcutta. I am leaving for that place next Tuesday. I have been waiting every day for hearing from you. Possibly no news is good news. With love,

Ever yours
Rabindranath Tagore,

৪. আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

The Appeal[১]

In the midst of a great deal that is discouraging in the present state of the world there is one significant symptom of hopeful and vital promise, namely the awakening of Asia. This great awakening, if directed along the right lines, is full of hope, not only for Asia, but also for the whole world.

On the other hand, it has to be admitted that the relationship of the West with the East, growing more and more complex and widespread for over two centuries, has, far from attaining its true fulfilment, given rise almost to a universal spirit of conflict. The consequent strain and unrest have profoundly disturbed Asia, and explosive forces of antipathy are accumulating for years in the depths of the Eastern mind.

The meeting of the East and the West has remained incomplete because the occasions of it have not been disinterested. The political and commercial adventures carried on by the Western races, very often by force and against the interest and wishes of the countries they deal with, have created moral alienation deeply injurious to both parties. The chance of the peril growing out of this unnatural relationship has so long contemptuously been ignored by the West. But such blind confidence in their apparent invincibility has ever been the cause of fatal awakening of the strong from their dream of security, into terrible surprises of history.

But it is not the possibility of some danger or loss to some people or other which is most important in this case. The constant demoralizing influence of the estrangement between the two hemispheres of human world, letting loose

---

১ **International University, An Appeal by Rabindranath Tagore.**

the baser passions of man,— his pride, greed and hypocrisy, his fear, suspiciousness and loss of self-confidence— is everyday growing into a world-wide spiritual disaster.

Therefore the time has come when we must exercise all our wisdom to understand the situation, and try to control it with a stronger trust in moral guidance than in any organization of physical forces.

In the beginning of Man's history our own true object was to form a community, to grow into a Nation. For at that early period individuals gathered together within geographical enclosures ; and only those bodies of men, who developed their consciousness of unity and spirit of co-operation, survived, and became a people ; while those who distrusted their fellow-beings, continually fought and robbed one another, perished. But in the present age, with the facility of communication, geographical barriers have almost lost their reality, and the great meeting, which is waiting either to find its truth or to explode into a final catastrophe, is not a meeting of individuals but of various human races. Now the problem before us is of one single country which is this earth, where the races as individuals must find their freedom of self-expression and yet bond of federation. It must realize a unity wider in scope, deeper in sentiment, stronger in power than ever before. Now that the problem is large we have to solve it on a bigger scale, realize the God in man in a larger faith, and build the temple for Him on a world-wide basis and plan.

The first step towards the realization of this object is to create opportunities for revealing the different peoples to one another. This can never be done in the fields where the utilitarian spirit of exploitation is supreme. We must find some meeting-ground where there can be no question of conflicting interests. One of such places is the university where we can work together in a common pursuit of truth, share together our common heritage and realize that artists

in all parts of the world have created forms of beauty, scientists discovered secrets of the universe, philosophers solved problems of existence, saints made the truth of spiritual world organic in their own life, not merely for some particular race to which they belonged but for all mankind. When the science of Meteorology knows the earth's atmosphere as continuously one, affecting the different parts of the world differently but in a harmony of adjustments, it knows truth. Likewise we must know that the great mind of man is one, working through its differences which are necessary for the fruitfulness of the fundamental unity. When we understand this truth in a disinterested spirit, it helps us to be able to respect all differences in man that are real and yet be conscious of our oneness, to know that perfection of unity is not in uniformity but in harmony.

This is the problem of the present age The East for its own sake and for the sake of the world, must never remain unrevealed. The deeper source of all the historical calamities is misunderstanding. For there we can never be just, where we do not understand.

Being strongly impressed with the responsibility, which every individual at the present age must, according to his power, realize, I have started the nucleus of an International University in India, which I consider as one of the best means of promoting mutual understanding between the Eastern and Western humanity. This Institution, according to the plan I have in mind. will invite students from the West to study the different systems of Indian philosophy, arts and music in their proper environment of Indian life, encouraging them to carry on research work in collaboration with scholars who are engaged in this task.

India has her renaissance and is preparing to make her contribution to the world of the future. In the past she produced her great culture and in the present age she has

an equally important contribution to make to the culture of a New World which is emerging from the wreckage of the Old. This is a momentous period of her history, pregnant with precious possibilities when any disinterested offer of co operation from any part of the West will have an immense moral value, the memory of which will increase in radiance as the regeneration of the East grows in vigour and creativeness.

The Western Universities give opportunity to students to learn what all the different Western countries have contributed to their common culture. Thus the intellectual mind of the West has luminously been revealed to the world. What is needed to complete this illumination is to help the East in collecting its scattered lamps to offer them to the enlightenment of world culture.

There was a time when the great countries of Asia had, each of them, to nurture its civilization in comparative seclusion. Now has come the age of co-ordination and co-operation. The seedlings that were reared within their narrow plots, must now be transplanted into the open fields. They must pass the test of the world market, if their maximum value is to be obtained.

But before Asia is in a position to co-operate with the cultures of Europe, she must base her own structure on a synthesis of all different cultures she has. When taking her stand on such a centre she turns towards the West, she will take, with a confident consciousness of mental freedom, her own view of truth from the standpoint of her own vantage ground, thus opening a new vista of thought before the grateful world. Otherwise, she will allow her priceless inheritance to crumble into dust, and clumsily trying to replace it with a feeble imitation of the West, make herself superfluous, cheap and ludicrous. If she thus loses her justification to exist, and wanes away into a ghastly semblance of reality, will it in the least help the rest of the

world? Will not that terrible bankruptcy involve also the Western mind? If the whole world grows at last into an exaggerated West, then such illimitable parody of the modern age will die crushed flat under its own absurdity.

Therefore, it is my desire, with the enlargement of its funds, to extend the scope of the University I have started, till it comprehends the whole range of Eastern culture—the Semitic, the Aryan, the Mongolian and others. Its object will be to reveal the Oriental mind to the world.

For carrying out this purpose I hope to be able, when I have done my work here, to travel in Asia and present my appeal to all the great races of that continent wherever my voice is likely to reach.

Of one thing I felt certain during my travels in the continental countries of Europe, that a genuine interest has been aroused in the Western mind in the philosophy and the arts of the East from which it seeks fresh inspiration of truth and beauty. Once Orient had its reputation of fabulous wealth and the seekers were attracted to it from across the sea. Since then the shrine of wealth has changed its site. But the East has also the reputation of her storage of wisdom harvested by her patriarchs from long succeeding ages of spiritual endeavour. And when, as now, in the midst of the pursuit of power and wealth, there rises the cry of privation from the famished Spirit of Man, let the East have once more the proud opportunity to offer her store to those who need it.

It is for the furthering of this cause that in my travels in Europe during recent months, I have been pressing the claims of this International University in India for recognition in the West. These claims have been readily acknowledged by scholars in the European Universities where I have been, and while meeting them I have not only asked for financial support but also for the support of interchange of ideas and ideals.

Urged by the same purpose I have come to these shores, and I cherish the hope in my mind of being able to arouse for this great mission generous interest of the people of this country who have always shown their readiness to respond to the call of humanity with unstinted gift of their sympathy and help.

এই প্রসঙ্গে ২১ এপ্রিল ১৯২১ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০৯ ।

IN AS MUCH

written at Simla, September 1937

In the cool church
A stillness reigned, the beautiful light was streaming
Through the stained glass window, where our Lord in judgment,
With a sad sorrowful face, crowned with awful justice,
Seemed to say, "Is it nothing to you, all ye that pass by ?
Behold and see, if there be any sorrow
Like unto My sorrow."

The sacrament was ended.
The glory of His love had been remembered.
The comfortable words—"Come unto Me,
All ye that labour and are heavy laden,
And I will give you rest"—
Had brought us peace and joy. For a brief moment,
We had been with Him in Paradise.
"Lift up your hearts"—"Sursum corda"—
"We lift them up unto the Lord," we had replied.
Then again I saw them,
As I walked back from Church—
That long line, with their bodies straining, toiling,
Weary and heavy-laden.
For them, no Paradise, no heart-uplifting,
No thrill of joy in God's own beautiful creation,
No peace, no rest.
But comfortless toil, day after day— hungry, thirsty,
Ill-clad, ill-housed, ill-fed,

While His sad, sorrowful face, crowned with
awful justice,
Looked down on us in solemn judgment, and He said,
"Inasmuch as ye have done this to one of these—
To one of the very least of these My brethren,
Ye did it unto Me."

এগুরুজ-রচিত কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য পৃ. ১১২।

—